আদাবে জিন্দেগী

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

আদাবে জিন্দেগী

আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ
মাওলানা আবুল বাশার

আরজু পাবলিকেশন্‌স
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

আদাবে জিন্দেগী

আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার

পরিবেশক

খন্দকার প্রকাশনী	ঢাকা বুক কর্ণার
৩৮/৩, বাংলাবাজার	৬০/ডি পুরানা পল্টন
ঢাকা-১১০০	ঢাকা-১০০০
মোবাঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯	মোবাঃ ০১৭১১০৩০৭১৬

আদাবে জিন্দেগী

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

প্রকাশক ঃ
মাওলানা আমীনুল ইসলাম
ঢাকা বুক কর্ণার
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭১১-০৩০৭১৬

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং
৬ষ্ঠ প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ইং

প্রচ্ছদ ঃ
মুবাশ্বির মজুমদার

মুদ্রণে ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশদাস লেন,
ঢাকা-১১০০

বিনিময় ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের কথা

আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক। তার রচিত 'আদাবে জিন্দেগী' নামক গ্রন্থখানায় তিনি একজন মুমিনের জীবন গঠনের যাবতীয় উপকরণ কুরআন ও হাদীস থেকে চয়ন করে মুমিনের সম্মুখে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। একজন মুমিনের জীবন যাপনের প্রতিটি দিক এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল গ্রন্থখানা উর্দু ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনেরা এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন। শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনদের কথা বিবেচনা ও আমার অনেক শুভাকাঙ্খী বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

এ মহান সাহিত্য সাধকের সাহিত্য কর্মের অনুবাদ করাটাও এক দুরূহ ব্যাপার। তাই আমি আমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে একান্ত চেষ্টা সাধনায় এর অনুবাদে সহজ সরল ভাষায় পুস্তক ভাষান্তরে প্রবৃত্ত হই। আমার সাধ্যানুযায়ী পুস্তকটি সরল সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

অনুবাদ কতটুকু স্বার্থক হয়েছে তার বিচার পাঠকদের উপর ন্যাস্ত রইল। পুস্তকটি যদি কোন মুমিন ভাই-বোনকে ইসলামী জীবন গঠনে বা ইসলামী জীবন যাপনে সামান্যতম সহায়ক হবার ভূমিকায় প্রবৃত্ত করে তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করব।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের এ অনুবাদ গ্রন্থকে কবুল করে নেন এবং এ গ্রন্থের সাহায্যে আমাদের বাংলা ভাষাভাষী মুমিন ভাই বোনদেরকে ইসলামী জীবন গঠনের তওফীক দেন। এ পুস্তকটি ভাষান্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বিনিময় আমরা মহান আল্লাহ পাকের দরবারে চাইবো। এর সওয়াব লেখক সহ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই সমভাবে দান করুন-মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই-আমাদের প্রার্থনা। মহান আল্লাহ পাক আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ। আমিন!

বিনয়াবনত

মোঃ আবুল বাশার

পরিচিতি

জীবন থেকে সত্যিকার অর্থে উপকার লাভ করা, ইচ্ছামত স্বাদ আস্বাদন করা আর সফল জীবন যাপন নিঃসন্দেহে আপনার মৌলিক অধিকার কিন্তু সে অধিকার তখনি আপনি লাভ করতে পারবেন যখন জীবন চলার পথ সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন। সফল জীবন যাপনের আদব কায়দা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং সে সকল আদব কায়দা দ্বারা জীবনকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

শিষ্টাচার অনুপম আচরণ, মাহাত্ম্য ও ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা, সদ্বিবেচনা ও উত্তম নির্বাচন, সুবিন্যস্ত শৃংখলা, রুচির সৌন্দর্য প্রিয়তা, উচ্চাকাংখা, সহানুভূতি ও মঙ্গল কামনা, নম্র স্বভাব, বিনয়, নিস্বার্থপরতা, ধৈর্য্য ও সাহসিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আল্লাহ্ ভীতি, আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা, নির্ভিক পদক্ষেপ এগুলো ইসলামী জীবনের সে চিত্তাকর্ষক চিত্র যার বদৌলতে মুমিনের জীবনে অসাধারণ আর্কষণ সৃষ্টি হয়। শুধু মুসলিম জাতি কেন বরং ইসলামের সাথে অপরিচিত সৃষ্টিও মনের অজান্তে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করে আর বোধ শক্তিও চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, যে মানবতা লালনকারী সংস্কৃতি জীবনকে ঔজ্জ্বল্য দান করতে এবং অসাধারণ আকর্ষণে সজ্জিত করার ও অমূল্য নিয়ম কায়দার নির্দেশনা দেয়, উহা নিঃসন্দেহে আলো বাতাস এর ন্যায় সকল জীবের মৌলিক অধিকার। নিঃসন্দেহে উহা এ যোগ্যতা রাখে যে, সমগ্র মানব জাতি উহাকে গ্রহণ করে এ থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সফল ভিত্তি স্থাপন করে। যেনো তার পার্থিব জীবন সুখ শান্তিময় নিরাপত্তার নীড় গড়ে তুলে এবং পরকালেও যেন তা অর্জিত হয় যা সফল জীবনের জন্য ভিত্তি।

"আদাবে জিন্দেগী" গ্রন্থ-এ ইসলামী সংস্কৃতির ঐ সকল মূলনীতি ও নিয়মনীতিকে সাহিত্যিক রচনা বিন্যাসের মাধ্যমে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের জীবন্ত কর্মপদ্ধতি আলোকবর্তীকা রূপে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সম্বোধন সূচক পদ্ধতিতে পেশ করা হয়েছে।

আশা করি যে, "আদাবে জিন্দেগী" এরএ সংকলন প্রত্যেক বয়সের পাঠকদের জন্য আশানুরূপ উপাদেয় প্রমাণিত হবে। ইসলাম প্রেমী ভাই বোনেরা এ মহামূল্যবান আদব ও দোআসমূহ দ্বারা সুশোভিত ও সুসজ্জিত করবেন আর নিষ্পাপ সন্তান সন্ততিদের আচার আচরণকেও সুসজ্জিত করে গঠন করতে সচেষ্ট হবেন। আর যথা সম্ভব ছোটদেরকে এ আদব ও দোআগুলো শিক্ষা দেবেন। এ আদবসমূহ দ্বারা সুশোভিত জীবন দুনিয়াতে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং পরকালেও পুরস্কার লাভে সমর্থ হবেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নিকট আকুল আবেদন তিনি যেন এ খেদমতটুকু কবুল করেন এবং মুসলমানদের এ তওফিক দান করেন। যেনো তারা এ গ্রন্থে বর্ণিত নিয়ম কানুন ও আদব কায়দা অনুযায়ী তাদেরকে সুসজ্জিত করে ইসলামের জন্য অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করে দেন। আর এ রচনা আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাঁর সত্য দীনের দিকে আকৃষ্ট করার এক কার্যকর উপকরণ এবং সংকলকের জন্য মাগফিরাতের অসীলা হয়। আমীন!

মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী
রামপুর, ভারত

৩০ আগষ্ট, ১৯৬৭ ঈসায়ী

সূচী নির্দেশনা

বিষয়		পৃষ্ঠা

ইসলামী সংস্কৃতি

ইবাদতের সৌন্দর্য

বিষয়		পৃষ্ঠা

আল্লাহ্‌র দাসত্বের অনুভূতি

কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত দোআসমূহের কয়েকটি

ইসলামী সংস্কৃতি

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম

যারা পাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার চেষ্টা করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, "পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো ঈমানের অর্দ্ধেক।" অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্দ্ধেক, আর শারীরিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো ঈমানের অর্দ্ধেক (উভয়টি মিলে হলো পরিপূর্ণ ঈমান)। আত্মার পবিত্রতা এই যে, আত্মাকে কুফরী, শির্ক, নাফরমানী, গোমরাহী ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে শুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস এবং পূত-পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করবে। শরীরকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে রাখবে।

১. ঘুম থেকে উঠে হাত ধোয়া ব্যতীত পানির পাত্রে হাত দেয়া ঠিক নয়। কারণ, ঘুমের মধ্যে (পবিত্র বা অপবিত্র স্থানের) কোথায় হাত পড়ে তা জানা বা স্মরণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

২. গোসল খানায় প্রস্রাব করবেনা, বিশেষতঃ গোসলখানা পাকা না হলে সেখানে কখনও প্রস্রাব করবেনা। গোসলখানার ভিতরে পৃথক প্রসাব বা পায়খানার স্থান থাকলে প্রথোমক্ত কথা প্রযোজ্য হবেনা।

৩. পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় কেবলামুখি হয়ে বা কেবলা পেছনে দিয়ে বসবে না। পায়খানা বা প্রস্রাব ত্যাগ করার পর ঢিলা-কুলুখ বা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে, তবে শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়। গোবর, হাড়, কয়লা ইত্যাদি দিয়ে এস্তেঞ্জা করবে না। এস্তেঞ্জা করার পর সাবান অথবা মাটি দ্বারা ভাল করে হাত ধুয়ে নেবে।

৪. পায়খানা প্রস্রাবের বেগ হলে খেতে বসবে না। পায়খানা-প্রস্রাব থেকে অবসর হওয়ার পর খেতে বসবে।

৫. খাবার জন্য ডান হাত ব্যবহার করবে। অজুতেও ডান হাত ব্যবহার করবে। এস্তেঞ্জা ও নাক ইত্যাদি বাম হাত দ্বারা পরিষ্কার করবে।

৬. নরম জায়গায় এমনভাবে প্রস্রাব করবে যেন গায়ে প্রস্রাবের ছিটা না লাগে। সব সময় বসে প্রস্রাব করবে। তবে যদি প্রস্রাবের স্থান বসার মতো না হয় বা বসতে অক্ষম হয় তখন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এটা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। বিনা ওজরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অবশ্যই পরিহার করা উচিত।

৭. পুকুর, নদী, খাল ইত্যাদির ঘাটে, চলাচলের রাস্তায় ও ছায়াযুক্ত স্থানে (যে ছায়াযুক্ত স্থানে মানুষ বিশ্রাম নেয়) মলমূত্র ত্যাগ করবে না। এতে জনসাধারণের অসুবিধা হয় এবং এটা সভ্যতা ও শিষ্টাচারেরও পরিপন্থী।

৮. পায়খানায় খালি পায়ে বা খালি মাথায় যাবে না এবং পায়খানায় যাবার সময় এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

"হে আল্লাহ! দুষ্ট পুরুষ স্ত্রী জাতীয় শয়তানদের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *(বুখারী - মুসলিম)*

পায়খানা থেকে (অবসর হয়ে) বাইরে এসে এ দোয়া পাঠ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার কষ্ট দূর ও আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।" *(নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)*

৯। নাক পরিষ্কার করা ও থুথু ফেলার জন্য সতর্কতা হিসাবে পিকদানী ব্যবহার করবে অথবা এমন জায়গায় গিয়ে নিজের কাজ সেরে নিবে যেন কারো সমস্যার কারণ না হয়।

১০. বার বার নাকের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ময়লা বের করবে না। নাক পরিষ্কার করার দরকার হলে আড়ালে গিয়ে ধীরস্থিরভাবে পরিষ্কার করে নেবে।

১১. রুমালে কফ-শ্লেষ্মা ইত্যাদি কচলানো জাতীয় অভ্যাস পরিত্যাগ করবে। এটা মারাত্মক ঘৃণ্য অভ্যাস, কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে করলে দোষ নেই।

১২. মুখে পান বা খাদ্য নিয়ে এভাবে কথা বলবে না যে, পাশের ব্যক্তির গায়ে খাবারের ছিটা পড়ে এবং তার কষ্ট হয়। অনুরূপ অত্যধিক পান তামাকে অভ্যস্ত ব্যক্তি মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। কথা বলার সময় নিজের মুখ সংযত রাখার চেষ্টা করবে।

১৩. অযু যথেষ্ট মনোযোগসহ করবে আর সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা সম্ভব না হলে অধিকাংশ সময় থাকার চেষ্টা করবে। পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করবে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে অযু আরম্ভ করবে এবং অযু করার সময় এ দোয়া পাঠ করবে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ (ترمذى)

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে অধিক তওবাকারী ও পবিত্রতা রক্ষাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দাও।"

অযু থেকে অবসর হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ (نسائى)

"হে আল্লাহ! তুমি মহান ও পবিত্র। তোমার প্রশংসা সহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং (সব ত্যাগ করে) তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ " কাল কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের চিহ্ন হবে এই যে, তাদের কপাল ও অযুর স্থানগুলো নূরের আলোয় ঝিকমিক করতে থাকবে। সুতরাং যারা তাদের আলো বাড়াতে চায় তারা যেন তা ইচ্ছামত বাড়িয়ে নেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

১৪. নিয়মিত মেসওয়াক করবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি যদি উম্মাতের কষ্টের কথা চিন্তা না করতাম, তাহলে তাদের প্রত্যেক অযুর সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

একবার তাঁর নিকট কিছু লোক এসেছিল, যাদের দাঁত ছিল হলুদ, সুতরাং তিনি তাদেরকে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিলেন।

১৫. কমপক্ষে সপ্তাহে একবার গোসল করবে। বিশেষ করে জুমআর দিন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরিধান করে জুমআর নামাযে যাবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমানতদারি মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (সাঃ)! আমানত দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চান? তিনি বললেন ঃ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হবার জন্য গোসল করা, আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে আর কোন বড় আমানত নির্ধারণ করেননি। সুতরাং যখনই মানুষের গোসল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে তখনই গোসল করবে।

১৬. অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবেনা এবং মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াতও করবে না। একান্ত প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে মসজিদে যাবে অথবা মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করবে।

১৭. মাথার চুল তেল দিয়ে ও চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে রাখবে। দাড়ির সৌন্দর্য্য নষ্টকারী বর্দ্ধিত চুলগুলোকে কাঁচি দ্বারা ঠিক করে ছেঁটে নেবে। চোখে সুরমা লাগাবে। নখ কাটা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবে এবং সাদাসিদে ভাবে যতদূর সম্ভব সৌন্দর্য্য বর্ধনের চেষ্টা করবে।

১৮. হাঁচি দেয়ার সময় মুখে রুমাল দেবে যাতে অপরের গায়ে ছিটা না পড়ে। হাঁচির পর আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে) বলবে, শ্রোতা ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন) বলবে, তার উত্তরে হাঁচিদাতা বলবে ইয়াহদীকাল্লাহ (আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করুন।)

১৯. ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করবে, রাসূল (সাঃ) সুগন্ধিকে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি সাধারণত ঘুম থেকে উঠার পর সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

স্বাস্থ্য রক্ষার উত্তম পন্থা

১. ভাল স্বাস্থ্য আল্লাহ তাআলার নে'আমত এবং আমানত। তাই সুস্থতার মর্যাদা রক্ষা করবে এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় কখনও অবহেলা করবে না। একবার স্বাস্থ্য নষ্ট হলে পুনঃ তা উদ্ধার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উইপোকা যেমন বড় বড় পাঠাগারের পুস্তক (অল্পদিনের মধ্যে) খেয়ে ধ্বংস করে দেয় তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও সামান্যতম অবহেলায় ক্ষুদ্র একটি রোগ জীবনকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। স্বাস্থ্যের প্রতি অলসতা ও অবহেলা করা আল্লাহ তাআলার প্রতি অকৃতজ্ঞতাও বটে।

মানব জীবনের মূল রত্ন হলো জ্ঞান, চরিত্র, ঈমান ও উপলব্ধি শক্তি। জ্ঞান, চরিত্র, ঈমান ও অনুভূতি শক্তির সুস্থতা ও অধিকাংশ সময় শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, মহৎ চরিত্রের আবশ্যকতা এবং দীনি কর্তব্যসমূহ আদায় করার জন্য শারীরিক সুস্থতা একটা মৌলিক বিষয়ের মর্যাদা রাখে। অসুস্থ ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধিও দুর্বল হয়, আর তার কাজ কর্মও অত্যন্ত উদ্যমহীন হয়। জীবনের উচ্চাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎসাহ-উদ্দীপনা থেকে মানুষ যখন বঞ্চিত হয় এবং ইচ্ছা শক্তি দুর্বল হয়, আর উত্তেজনা শক্তি লোপ পায় ও নিস্তেজ হয়ে যায়, তখন এমন চেতনাহীন জীবন দুর্বল শরীরের জন্যে রীতিমত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

একজন মুমিনকে খেলাফতের যে মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে তার শারীরিক শক্তি, জ্ঞান, মস্তিষ্কের শক্তি, ইচ্ছা শক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা অপরিহার্য। তার জীবন উদ্যম, উচ্চাশা ও আবেগে পরিপূর্ণ হতে হবে। সুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারাই শক্তিশালী আদর্শ জাতি সৃষ্টি হয়। আর এরূপ জাতিই জীবনের কর্মস্থলের মহান কোরবানী পেশ করে নিজের আসন সুদৃঢ় করে নেয় এবং জীবনের মর্যাদা ও মহত্ব প্রকাশ করে।

২. সর্বদা হাসি-খুশি, কর্ম চঞ্চল ও সক্রিয় থাকবে, স্বচ্চরিত্র, মৃদু হাসি এবং সজীবতা দ্বারা জীবনকে সার্থক, আবেগময় ও সুস্থ রাখবে। চিন্তা, রাগ, দুঃখ-হিংসা, কুচিন্তা, সংকীর্ণমনা, দুর্বলমনা ও মানসিক অস্থিরতা থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। চারিত্রিক রোগসমূহ এবং মানসিক অস্থিরতা পাকস্থলীতে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আর পাকস্থলীর অসম অবস্থা স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক শত্রু। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "সাদাসিদে ভাবে থাক, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং হাসি-খুশিতে থাক।" *(মেশকাত)*

একবার রাসূল (সাঃ) দেখতে পেলেন যে, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তার দু'ছেলের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে তাদের মাঝখানে ছেচঁড়াতে ছেঁচড়াতে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এ বুড়োর কি হয়েছে?" লোকেরা উত্তর দিল যে, লোকটি পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ যাওয়ার মান্নত করেছিল। এজন্য পায়ে হাঁটার কসরত করছে। রাসূল (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তাআলা এ বুড়োর কষ্টভোগের মুখাপেক্ষী নন এবং ঐ বুড়ো লোকটিকে নির্দেশ দিলেন যে, সওয়ারীতে করে তোমার সফর সম্পন্ন কর।"

হযরত ওমর (রাঃ) এক যুবককে দেখতে পেলেন যে, সে দূর্বলের মত পথ চলছে । তিনি তাকে থামালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, "তোমার কি রোগ হয়েছে?" যুবকটি উত্তর দিল যে, কিছু হয়নি। তিনি (তাকে বেত্রাঘাত করার জন্য) বেত উঠালেন এবং ধমক দিয়ে বললেন,"রাস্তায় চলার সময় পূর্ণ শক্তি নিয়ে চলবে ।"

রাসূল (সাঃ) পথে হাঁটার সময় দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতেন, এমন শক্তি নিয়ে হাঁটতেন (যে মনে হতো) যেন তিনি কোন নিম্নভূমির দিকে যাচ্ছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন হারেস (রাঃ) বলেন, "আমি রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে মৃদু হাসিসম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি।" *(তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) নিজ উম্মতদেরকে যে দোআ শিক্ষা দিয়েছেন তা পড়বে। দোয়াটি হলোঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ الْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَضَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ـ(بخاری ومسلم)

"হে আল্লাহ! আমি অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, নিরুপায় অবস্থা, অলসতা,দুর্বলতা, ঋণের বোঝা থেকে এবং লোকদের দ্বারা আমাকে পরাজিত করা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৩. শরীরে সহ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেবেনা, শারীরিক শক্তিকে অন্যায়ভাবে নষ্ট করবে না, শারীরিক শক্তির অধিকারীর দায়িত্ব হলো এই যে, তাকে সংরক্ষণ করবে এবং তার থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী মধ্যম পন্থায় কার্য হাসিল করবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন "কাজ ততোটুকু করবে যতটুকু করার শক্তি তোমার আছে,

কেননা আল্লাহ তাআলা সে পর্যন্ত বিরক্ত হননা, যে পর্যন্ত তোমরা বিরক্ত না হও। *(বুখারী)*

হযরত আবু কায়েস (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন তিনি খুৎবা দিচ্ছেন, এমতাবস্থায় হযরত আবু কায়েস রৌদ্রে দাঁড়িয়ে গেলেন, রাসূল (সাঃ) তাকে ছায়ায় চলে যেতে নির্দেশ দিলে তিনি ছায়ায় চলেন গেলেন। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

রাসূল (সাঃ) শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে এবং কিছু অংশ ছায়ায় রাখতেও নিষেধ করেছেন।

বাহেলা গোত্রের মুজীবাহ (রাঃ) নাম্নী এক মহিলা বর্ণনা করেন যে, একবার আমার পিতা রাসূল (সাঃ)এর দরবারে দীনী ইলম শিক্ষা নেওয়ার জন্য গেলেন এবং দীন সম্পর্কিত কিছু জরুরী বিষয় অবগত হয়ে ফিরে এলেন। এক বছর পর তিনি আবার রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এবার রাসূল (সাঃ) তাঁকে মোটেই চিনতে পারেননি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) ! আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? রাসূল (সাঃ) বললেন, "না। তোমার পরিচয় দাও।" তিনি বললেন, "আমি বাহেলা গোত্রের একজন লোক, গত বছর আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম।" তখন রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তোমার এ কি অবস্থা হয়েছে! গত বছর যখন তুমি এসেছিলে তখন তোমার ছুরত ও অবস্থা বেশ ভাল ছিল। তিনি উত্তরে বললেন, আমি আপনার দরবার থেকে যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত নিয়মিত রোযা রেখেছি শুধু রাতে খাবার খাই। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি অনর্থক নিজকে শাস্তিতে রেখেছ, নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছ। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি পুরো রমযান মাসের ফরয রোযাগুলো রাখবে আর প্রতি মাসে একটি করে রোযা রাখবে । লোকটি আবারও বলল, হুযুর(সাঃ) ! আরো কিছু বেশীর অনুমিত দিন ! হুযুর (সাঃ) বললেন, আচ্ছা প্রতি বছর সম্মানিত মাসসমূহে রোযা রাখবে এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দিবে। এরূপ প্রতি বছর করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সাঃ) একথা বলার সময় নিজের তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন ঐ গুলোকে মিলায়েছেন এবং ছেড়ে দিয়েছেন। (এর দ্বারা এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রজব, শাওয়াল, যিলক্বদ এবং যিলহজ্ মাসের রোযা রাখবে এবং ছেড়ে দিবে আবার কোন বছর মোটেও রাখবে না।)

—2

রাসূল (সাঃ) বলেন, "নিজেকে নিজে অপমানিত করা ঈমানদারের উচিত নয়।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ঈমানদার ব্যক্তি কিভাবে নিজেকে নিজে অপমানিত করে? তিনি উত্তরে বললেন, "(ঈমানদার ব্যক্তি) নিজেকে নিজে অসহনীয় পরীক্ষায় ফেলে।" *(তিরমিযী*

৪. সর্বদা ধৈর্য্য, সহনশীলতা, পরিশ্রম, কষ্ট ও বীরত্বের জীবন যাপন করবে, সব ধরনের বিপদ সহ্য করার এবং কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য অভ্যাস গড়তে হবে এবং দৃঢ়তার সাথে সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করবে। আরাম প্রিয়, পরিশ্রম বিমুখ, কোমলতা প্রিয়, অলস, সুখ প্রত্যাশী, হীনমনা ও দুনিয়াপূজারী হবেনা।

রাসূল (সাঃ) যখন হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন তখন উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, "মুআয! আরামপ্রিয়তা থেকে বিরত থাকবে ! কেননা আল্লাহর বান্দাগণ সব সময় আরামপ্রিয় হয় না। *(মেশকাত)*

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ সাদাসিধে জীবন যাপন করা ঈমানের বড় নিদর্শন।" *(আবু দাউদ)*

রাসূল (সাঃ) সর্বদা সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন এবং সর্বদা নিজের বীরত্বপূর্ণ শক্তিকে বর্দ্ধিত করার চেষ্টা করতেন। তিনি সাঁতার কাটতে পছন্দ করতেন। কেননা, সাঁতার কাটায় শরীরের ব্যায়াম হয়। একবার এক পুকুরে তিনি ও তাঁর কতিপয় সাহাবী সাঁতার কাটছিলেন, তিনি সাঁতারুদের প্রত্যেকের জুড়ি ঠিক করে দিলেন, প্রত্যেকে সাঁতার কেটে আবার তার জুড়ির নিকট পৌছবে। তাঁর জুড়ি নির্বাচিত হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। তিনি সাঁতার কেটে আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর ঘাড় ধরে ফেললেন।

রাসূল (সাঃ) সওয়ারীর জন্যে (বাহন হিসাবে) ঘোড়া পছন্দ করতেন, নিজেই নিজের ঘোড়ার পরিচর্যা করতেন, নিজের জামার আস্তিন দ্বারা ঘোড়ার মুখ মুছে পরিষ্কার করে দিতেন, তার গ্রীবাদেশের কেশরসমূহকে নিজের পবিত্র আঙ্গুলী দ্বারা ঠিক করে দিতেন এবং বলতেন, "কিয়ামত পর্যন্ত এর কপালের সাথে সৌভাগ্য জড়িত থাকবে।"

হযরত উকবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "তীরন্দাজী করা শিখো, ঘোড়ায় চড়ে তীর নিক্ষেপকারীগণ আমার নিকট ঘোড়ায় আরোহণ

কারীদের থেকে প্রিয় এবং যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষালাভ করার পর ছেড়ে দিল, সে আল্লাহর নেআমতের অমর্যাদা করল।” *(আবু দাউদ)*

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদের সময় মুজাহিদদেরকে পাহারা দিল তার এ রাত লাইলাতুল কদরের রাত অপেক্ষা অধিক উত্তম। *(হাকেম)*

রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমার উম্মাতের ওপর ঐ সময় অত্যাসন্ন যে সময় অন্যান্য জাতির লোকেরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেমন খাবারের ওপর লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল(সাঃ)! তখন কি আমাদের সংখ্যা এতই কম হবে যে, ধ্বংস করার জন্য অন্য জাতির লোকেরা একত্রিত হয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, না, সে সময় তোমাদের সংখ্যা কম হবেনা বরং অনেক বেশী হবে। কিন্তু তোমরা বন্যায় ভাসমান খড়কুটার মত হালকা হয়ে যাবে। তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব কমে যাবে এবং হীনমন্যতা ও কাপুরুষতা তোমাদেরকে ঘিরে ধরবে। অতঃপর জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ হীনমন্যতা কেন আসবে? তিনি বললেন ঃ এই কারণে যে, ঐ সময় তোমাদের দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা বেড়ে যাবে এবং মৃত্যুকে বেশী ভয় করতে থাকবে।”

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “উত্তম জীবন ঐ ব্যক্তির, যে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর পথে দ্রুতবেগে দৌড়িয়ে চলে, বিপদের কথা শুনলে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সেখানে দৌড়িয়ে যায় এবং হত্যা ও মৃত্যু থেকে এমন নির্ভীক হয় যেন সে মৃত্যুর খোঁজেই আছে।” *(মুসলিম)*

৫. মহিলারাও বিপদে ধৈর্য্যশীল, পরিশ্রমী ও কষ্টের জীবন যাপন করবে। ঘরের কাজ-কর্ম নিজের হাতেই করবে। কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং সন্তান-সন্ততিকেও প্রথম থেকে ধৈর্য্যশীল, সহনশীল ও পরিশ্রমী হিসাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। ঘরে চাকর-নকর থাকা সত্বেও সন্তান-সন্ততিকে কথায় কথায় চাকর-নকরের সাহায্য নিতে নিষেধ করবে এবং সন্তান-সন্ততিকে নিজের কাজ নিজেদের করে নিতে অভ্যস্থ করে তুলবে। মহিলা সাহাবীগণ বেশীর ভাগ সময় নিজেদের কাজ নিজেদের

হাতেই করতেন, পাকঘরের কাজ নিজেরাই করতেন, চাক্কি পিষতেন। পানি আনা, কাপড় ধোয়া, এমনকি কাপড় সেলাইরও কাজ করতেন। পরিশ্রম ও কষ্টের জীবন-যাপন করতেন, প্রয়োজন বোধে লড়াইয়ের ময়দানে আহতদেরকে সেবাযত্ন করতেন। ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাতেন এবং যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাবার দায়িত্ব পালন করতেন। এর দ্বারা মহিলাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র ভাল থাকে এবং সন্তান-সন্ততির উপরও এর শুভক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম মহিলা সেই, যে ঘরের কাজ কর্মে এতো ব্যস্ত থাকে যে, তার চেহারা ও কপালে পরিশ্রমের চিহ্ন ফুটে উঠে এবং পাক ঘরের ধোঁয়া-কালির মলিনতা প্রকাশ পায়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কাল কিয়ামতের দিন আমি এবং মলিন চেহারার মহিলাগণ এভাবে হবো।"(একথা বলার সময় তিনি নিজের শাহাদাত অঙ্গুলী ও মধ্যমা অঙ্গুলী মিলিয়ে দেখিয়েছেন।)

৬. ভোরে উঠার অভ্যাস করবে, নিদ্রায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। যাতে করে শরীরের আরাম ও শান্তিতে ব্যঘাত না ঘটে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্লান্তি ও অশান্তি অনুভূত না হয়। খুব বেশীও ঘুমাবেনা আবার কমও ঘুমাবে না যাতে করে দুর্বল হয়ে পড়। রাত্রে তাড়াতাড়ি নিদ্রা ও ভোরে তাড়াতাড়ি উঠার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

ভোরে উঠে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। অতঃপর বাগানে অথবা মাঠে পায়চারী করা ও ভ্রমণ করার জন্য বের হবে। ভোরের টাটকা বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। দৈনিক নিজের শারীরিক শক্তি অনুযায়ী হালকা ব্যায়াম করারও চেষ্টা করবে।

রাসূল (সাঃ) বাগানে ভ্রমণ করাকে পছন্দ করতেন এবং কখনো কখনো তিনি নিজেই বাগানে চলে যেতেন। এশার পর জাগ্রত থাকা ও কথা বলতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন, "এশার পর এমন ব্যক্তি-ই জেগে থাকতে পারে যার দীনি আলোচনা করার অথবা ঘরের লোকদের সাথে জরুরী কথা বলার প্রয়োজন আছে।"

৭. নিজের নফস বা অহং আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলবে। উৎসাহ-উদ্দীপনা, চিন্তা ভাবনা ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। নিজের অন্তরকে বিপথে পরিচালিত হওয়া, চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হওয়া এবং দৃষ্টিকে অসৎ হওয়া থেকে রক্ষা করে চলবে। কামনা-বাসনার

অসৎ ভাব ও কুদৃষ্টি দ্বারা মন মস্তিষ্ক শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এ ধরনের লোক চেহারা, সৌন্দর্য্য ও সুপুরুষসুলভ গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অতঃপর সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভীরু ও কাপুরুষ হিসাবে প্রমাণিত হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "চোখের যেনা হলো কুদৃষ্টি আর মুখের যেনা হলো অশ্লীল আলোচনা, অতঃপর মন উহার আকাংখা করে এবং গুপ্তাংগ উহাকে সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যায় প্রতিফলিত করে।"

এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন -

মুসলিমগণ! তোমরা কুকাজের ধারেও যেয়োনা। কুকাজে ছয়টি ক্ষতি নিহিত আছে, তিনটি হলো দুনিয়ায় আর তিনটি হলো পরকালে।

দুনিয়ার তিনটি হলো-

(ক) এর দ্বারা মানুষের চেহারার সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ কমে যায়।

(খ) এর দ্বারা মানুষের উপর অভাব-অনটন পতিত হয়।

(গ) এর দ্বারা মানুষের বয়সও কমে যায়।

৮. নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকবে। নেশা জাতীয় দ্রব্য মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীকে ক্রমশ ধ্বংস করে দেয়। মদ তো হারাম, কাজেই তা থেকে বিরত থাকবেই আর অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকেও বিরত থাকবে।

৯. প্রত্যেক কাজেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। শারীরিক পরিশ্রমে, মস্তিষ্ক পরিচালনায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে, পানাহারে, নিদ্রায় ও বিশ্রামে, দুঃখে-কষ্টে ও হাসি-খুশীতে, আনন্দ-উল্লাস ও ইবাদতে, চলাফেরা ও কথা-বার্তায় অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক কাজেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ স্বচ্ছল অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কতই না সুন্দর ! দরিদ্রাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কতইনা ভাল ! ইবাদতের ক্ষেত্রেও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কতই না উত্তম।"

(মুসনাদে বাযযার, কানযুল উম্মাল)

১০. খাবার সর্বদা সময় মত খাবে। পেট পূর্ণ করে খাবে না। সর্বদা পানাহারে মগ্ন থাকবে না। ক্ষুধা লাগলেই খাবে আবার ক্ষুধা একটু বাকী থাকতেই খাবার থেকে উঠে যাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনো খাবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "মুমিনগণ এক অন্ত্রনালীতে খায় আর কাফের সাত অন্ত্রনালীতে খায়।" *(তিরমিযি)*

পাকস্থলীর সুস্থতার উপর স্বাস্থ্য নির্ভরশীল আর অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে পাকস্থলী রুগ্ন হয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

“পাকস্থলী শরীরের জন্য হাউজ স্বরূপ এবং রগগুলো এ হাউজ থেকে আর্দ্রতা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং পাকস্থলী সুস্থ ও সবল হলে রগগুলো সুস্থ হবে আর পাকস্থলী রুগ্ন ও দুর্বল হলে রগগুলোও রোগে আক্রান্ত হবে।”

কম খাওয়া সম্পর্কে উৎসাহ দিতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ “একজনের খাবারই দুজনের জন্য যথেষ্ট হবে।”

১১. সর্বদা সাদাসিধে খাবারই খাবে। চালনী বিহীন আটার রুটি খাবে, অতিরিক্ত গরম খাদ্য এবং স্বাদ ও রুচির জন্য অতিরিক্ত গরম মসলা ব্যবহার করবেনা। যা সাদাসিধে ও দ্রুত হযম হয় এবং স্বাস্থ্য ও শরীরের পক্ষে কল্যাণকর হয় তা খাবে। শুধু স্বাদ গ্রহণ ও মুখের রুচির জন্য খাবেনা।

রাসূল (সাঃ) না চালা আটার রুটি পছন্দ করতেন, মিহি ময়দার পাতলা চাপাতি পছন্দ করতেন না, অতিরিক্ত গরম যা থেকে ধোঁয়া বের হয় এরূপ খাবার খেতেন না, একটু ঠান্ডা করে খেতেন। গরম খাবার সম্পর্কে কখনও বলতেন, “আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কখনো আগুন খাওয়াননি” আর কখনও বলতেন, “গরম খাদ্যে বরকত নেই।” তিনি গোস্ত পছন্দ করতেন। মূলতঃ শরীরকে শক্তি যোগানোর জন্য গোস্ত একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য। মুমিনের বক্ষ সব সময় বীরত্বের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত থাকা উচিত।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ না করে মৃত্যু বরণ করল এমনকি তার অন্তরে জিহাদের আকাংখাও ছিলনা, সে ব্যক্তি মুনাফিকীর এক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।” *(মুসলিম)*

১২. খাবার অত্যন্ত স্থিরতা ও রুচিসম্মতভাবে খাবে। চিন্তা, রাগ দুঃখ ও ভয়ের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করবে না। খুশী ও শান্ত অবস্থায় স্থিরতার সাথে যে খাদ্য খাওয়া হয় তার দ্বারা শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং দুঃখ-চিন্তা ও ভয়ের সাথে যে খাদ্য খাওয়া হয় তা পাকস্থলীর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে শরীরের চাহিদানুযায়ী শক্তি সৃষ্টি হয় না। খেতে বসে নির্জীব ও চিন্তিত ব্যক্তির ন্যায় চুপ-চাপ খাবেনা আবার হাস্য-রসে উল্লসিত হয়েও উঠবে না। খেতে বসে অট্টহাসিতে মত্ত হওয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

খাবার সময় মৃদু হাসি ও কথা-বার্তা বলবে , খুশী ও প্রফুল্লতা সহকারে খাবার খাবে এবং আল্লাহ তাআলার দানকৃত নেআমতের শুকরিয়া আদায় করবে। রুগ্নাবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বিরত থাকবে।

উম্মে মানযার (রাঃ) বলেন যে, একবার রাসূল (সাঃ) আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। আমার ঘরে ছিলো খেজুরের ছড়া লটকানো, হুজুর (সাঃ) ওখান থেকে খেতে আরম্ভ করলেন, হুজুরের সাথে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন, তিনিও খেতে আরম্ভ করলেন। তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন, আলী ! তুমি মাত্র রোগ শয্যা থেকে উঠে এসেছো, তাই খেজুর খেয়োনা। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) বিরত রইলেন এবং রাসূল (সাঃ) খেজুর খেতে থাকলেন। উম্মে মানযার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি কিছু যব ও বীট নিয়ে রান্না করলাম। রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন, আলী এবার খাও এটা তোমার জন্য উপাদেয়। *(শামায়েলে তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) যখন মেহমান নিয়ে খেতে বসতেন তখন মেহমানকে বার বার বলতেন, "খান আরো খান।" মেহমান তৃপ্ত হয়ে গেলে এবং খেতে অস্বীকার করলে তিনি আর একাধিকবার বলতেন না।

অর্থাৎ নবী করিম (সাঃ) অত্যন্ত পছন্দনীয় পরিবেশে ও হাসিখুশী অবস্থায় কথাবার্তার মাধ্যমে খাবার খেতেন।

১৩. দুপুরে খাবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। রাত্রের খাবার পর কিছুক্ষণ পায়চারি করবে। খানা খাবার সাথে সাথে শারীরিক বা মানসিক কোন কঠিন কাজ করবে না।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে-

تَغَدَّ تَمَدَّ تَعَشَّ تَمَشَّ -

অর্থ ঃ দুপুরের খেয়ে লম্বা হয়ে যাবে- রাতে খেয়ে পায়চারি করবে।

১৪. চোখের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। তীক্ষ্ণ আলোর দিকে দৃষ্টি দেবে না। সূর্যের আলো স্থির দৃষ্টিতে দেখবে না। অত্যন্ত ক্ষীণ বা তীক্ষ্ণ আলোতে পড়া-লেখা করবে না। পরিষ্কার ও স্বাভাবিক আলোতে লেখাপড়া করবে। অতিরিক্ত রাত জাগা থেকেও বিরত থাকবে, ধুলাবালি থেকে চক্ষুকে নিরাপদ রাখবে। খেত-খামার, বাগান ও শস্য-শ্যামল পরিবেশে

ভ্রমণ করবে, সবুজ-শ্যামল বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতে চোখের জ্যোতি বাড়ে, চোখকে সর্বদা কুদৃষ্টি থেকে বিরত রাখবে। এর দ্বারা চোখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রাসূল (সাঃ) বলেন, "তোমাদের চোখেরও অধিকার আছে।" মুমিনের উপর কর্তব্য যে, সে যেনো আল্লাহ তাআলার এ নেআমতের মর্যাদা রক্ষা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক তাকে ব্যবহার করে। এমন ধরনের কাজ করবে যার দ্বারা চোখের উপকার হয়। চোখের ক্ষতি হয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকবে। তদ্রূপ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি রক্ষায়ও খেয়াল রাখবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "হে লোকেরা ! তোমরা চোখে সুরমা ব্যবহার করবে, সুরমা চোখের ময়লা দূর করে এবং ভ্রূ জন্মায়।" *(তিরমিযি)*

১৫. দাঁত পরিষ্কার ও সুরক্ষার চেষ্টা করবে। দাঁত পরিষ্কার রাখলে তৃপ্তি বোধ হয়, হযম শক্তি বৃদ্ধি পায় ও দাঁত শক্ত থাকে। মেসওয়াক ও মাজন ইত্যাদির ব্যবহার করবে, পান-তামাক ইত্যাদি বেশী ব্যবহার করে দাঁত নষ্ট করবে না। খাদ্য খাবার পর অবশ্যই দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করবে। দাঁত অপরিষ্কার থাকলে বিভিন্ন প্রকার অসুখ সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সাঃ) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুম থেকে জেগে মেসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করে নিতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)–এর জন্য সব সময় অজুর পানি ও মেসওয়াক প্রস্তুত রাখতাম, যখনই তিনি আল্লাহর নির্দেশ পেতেন তখনই উঠে বসতেন ও মেসওয়াক করে নিতেন। অতঃপর অজু করে নামায আদায় করতেন। *(মুসলিম)*

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "আমি তোমাদেরকে মেসওয়াক করা সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব প্রদান করছি।" *(বুখারী)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন ঃ "মেসওয়াক মুখ পরিষ্কার ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।" *(নাসায়ী)*

তিনি আরো বলেন, " যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে বলে মনে না করতাম তবে প্রত্যেক ওয়াক্তে মেসওয়াক করার জন্য নির্দেশ দিতাম।" *(আবু দাউদ)*

একবার কয়েকজন সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তাদের দাঁত পরিষ্কার করার অভাবে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল, তিনি তা দেখতে পেয়ে বললেন ঃ "তোমাদের দাঁত হলুদ বর্ণ দেখাচ্ছে কেন ? মেসওয়াক করবে।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

১৬. পায়খানা- প্রস্রাব আবশ্যক হওয়ার সাথে সাথেই তা সম্পন্ন করবে। এগুলোকে দমন করতে গেলে পাকস্থলী ও মস্তিস্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

১৭. পবিত্রতা ও পরিছন্নতার চেষ্টা করবে। কুরআনে আছে, "আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকদেরকে ভালবাসেন, যারা সর্বদা পবিত্র ও পরিষ্কার থাকে।" *(সূরায়ে তওবা)*

রাসূল (সাঃ) বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্দ্ধেক।" পরিষ্কার ও পবিত্রতার গুরুত্বের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। মাছি বসা ও পড়া খাবার খাবেনা, হাড়ি-পাতিল পরিষ্কার রাখবে। পোশাকাদি ও শোয়া-বসার বিছানাসমূহ পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখবে। উঠা-বসার স্থানসমূহ ও পরিষ্কার পরিছন্ন রাখবে। শরীর, পোষাক ও আবশ্যকীয় সকল কিছু পরিষ্কার ও পবিত্রতার দ্বারা আত্মার প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা অর্জিত হয় এবং শরীরে আনন্দ ও সজীবতা অনুভূত হয় এবং মানসিক সুস্থতার ওপর সুফল প্রতিফলিত হয়।

একবার রাসূল (সাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল কিভাবে তুমি আমার আগে বেহেশতে প্রবেশ করলে? তিনি জবাবে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যখনই আযান দিই তখনই দুই রাকয়াত নামায আদায় করি আর যখনই অযু ছুটে যায় তখনই আবার অযু করে নেই।

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ সকল মুসলমানের উপর আল্লাহর একটা হক আছে। সেটা হচ্ছে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত পক্ষে একদিন গোসল করবে এবং মাথা ও শরীর ধৌত করবে।" (বুখারী)

১. এরূপ পোষাক পরিধান করবে যাতে লজ্জা-শরম, মর্যাদাবোধ, আভিজাত্য ও লজ্জা রক্ষার প্রয়োজন পূরণ হয় এবং সভ্যতা সংস্কৃতি, শোভা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

কোরআন মাজিদে আল্লাহ পাক নিজের এ নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে ঘোষণা করেছেন।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا۔

(الاعراف ٢٦)

"হে আদম সন্তান ! আমি তোমাদের জন্য পোষাক প্রদান করেছি যাতে তোমাদের লজ্জা নিরারণ ও রক্ষা পায় এবং তা যেন শোভা ও সৌন্দয্যের উপকরণ হয়।" *(সূরায়ে আরাফ : ২৬)*

رِيْش অর্থঃ পাখির পালক। পাখির পালক হলো পাখির জন্য শোভা ও সৌন্দর্য্যের উপায় এবং তার শরীর রক্ষার উপায়ও বটে। সাধারণ ব্যবহারে رِيْش শব্দটি শোভা সৌর্ন্দয্য ও উত্তম পোশাকের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পোশাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য্য, সাজ-সজ্জা ও আবহাওয়ার খারাপ প্রতিক্রিয়া থেকে শরীর রক্ষার মাধ্যম। মূল উদ্দেশ্য হলো লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করা। আল্লাহ তায়ালা লজ্জা-শরমকে মানুষের মধ্যে স্বভাবগত ভাবে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) থেকে যখন বেহেশতের গৌরবময় পোষাক ছিনিয়ে নেয়া হলো তখন তাঁরা লজ্জা নিবারণের জন বেহেশতী পাতা ছিঁড়ে তাঁদের শরীর ঢাকতে লাগলেন। অতএব পোশাকের এ উদ্দেশ্যটিকে সর্বাধিক অগ্রগণ্য বলে মনে করবে। এরূপ পোষাক নির্বাচন করবে যার দ্বারা লজ্জা নিবারণের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সাথে সাথে এ খেয়াল রাখবে যে, পোষাক যেনো ঋতুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য উপযোগী হয় আর যে পোষাক পরিধান করলে মানুষ অদ্ভুত অথবা খেলার পাত্রে পরিণত হয় এবং লোকদের জন্য হাসি ও পরিহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ায় সেই পোষাক পরবে না।

২. পোষাক পরিধান করার সময় এ চিন্তা করবে যে, এটা ঐ নেয়ামত যা আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে দান করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টি এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত, এ সম্মানিত দান ও পুরস্কারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং এ সম্মানিত পুরস্কারে ভূষিত হয়ে কখনও অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানী প্রদর্শন করবে না। পোষাক আল্লাহর এক স্মারক চিহ্ন। পোষাক পরিধান করে উপরোক্ত নেয়ামতের কথা নতুন করে স্মরণ করবে এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে এমন দোআ পড়বে যা রাসূল (সাঃ) মুমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. সংযমশীলতা হচ্ছে উত্তম পোষাক, সংযমশীলতার পোষাক দ্বারা আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক পবিত্রতা হাসিল হয়।

অর্থাৎ এরূপ পোষাক পরিধান করবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সংযমশীলতা প্রকাশ পায়। মহিলাদের পোষাক যেন পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যের কারণ না হয় এবং পুরুষদের পোষাক যেন মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যের অছিলা না হয়। এমন পোষাক পরিধান করবে যা দেখে পোষাক পরিধানকারীকে আল্লাহ ভক্ত ও ভাল মানুষ মনে হয়। মহিলাগণ পোষাকের বেলায় ঐ সকল সীমারেখার কথা মনে রাখবে যা শরীয়ত তাদের জন্য নির্দ্ধারিত করেছে আর পুরুষগণও পোষাকের বেলায় ঐ সকল সীমারেখার কথা স্মরণ রাখবে যা শরীয়ত তাদের জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

৪. নতুন পোষাক পরিধান করার সময় খুশী প্রকাশ করবে যে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাকে এ কাপড় দান করেছেন এবং ঐ দোয়া পাঠ করবে যা রাসূল (সাঃ) পাঠ করতেন।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) যখন কোন নতুন কাপড়, পাগড়ী, জামা অথবা চাদর পরিধান করতেন তখন ঐ নতুন কাপড়ের নাম ধরে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ
مَاصُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ۔ (ابوداؤد)

"হে আল্লাহ ! তোমার শোকর, তুমি আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছ, আমি তোমার নিকট কল্যাণকারীতার প্রত্যাশী যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ কাপড় তৈরী করা হয়েছে এবং আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি, এ কাপড়ের মন্দ থেকে ।" *(আবু দাউদ)*

দোআর অর্থ এই যে, হে আল্লাহ ! আমি যেন তোমার পোষাক ভাল উদ্দেশ্যে পরিধান করতে পারি যে উদ্দেশ্য তোমার নিকট মহৎ ও পবিত্র। তুমি আমাকে তাওফীক দান কর যেন আমি লজ্জা-নিবারণ করতে পারি এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নির্লজ্জতা থেকে মুক্ত থাকতে পারি আর শরীয়তের গন্ডির ভেতরে থেকে যেনো নিজের শরীরকে রক্ষা করতে পারি এবং যেনো গৌরব ও অহঙ্কার না করি, এ নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য শরীয়তের সীমারেখা যেন লংঘন না করি যা তুমি তোমার বান্দাদের জন্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছ।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করবে তার পক্ষে সম্ভব হলে পুরনো কাপড়টি কোন গরীব ব্যক্তিকে দান করে দেবে আর নতুন কাপড় পরিধান করার সময় এই দোয়াটি পড়বে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ -

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং যার দ্বারা আমি লজ্জা নিবারণ করি ও আমার জীবনে শোভা ও সৌন্দর্য্য লাভ করি।

যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করার সময় এ দোআ পাঠ করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে স্বয়ং নিজের নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণে রাখবেন। *(তিরমিযী)*

৫. কাপড় পরার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে, জামা শেরওয়ানী ও কোট-এর প্রথমে ডান আস্তিন পরবে, পায়জামা-প্যান্ট ইত্যাদিও। রাসূল (সাঃ) যখন জামা পরতেন তখন প্রথমে ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাতেন, তৎপর বাম হাত বাম আস্তিনে প্রবেশ করাতেন। অনুরূপ প্রথমে ডান পা ডান পায়ের জুতায় প্রবেশ করাতেন অতঃপর বাম পা বাম পায়ের জুতায় প্রবেশ করাতেন। জুতা খুলবার সময় প্রথম বাম পায়ের জুতা খুলতেন তৎপর ডান পায়ের জুতা খুলতেন।

৬. কাপড় পরার আগে ঝেড়ে নেবে। কাপড়ের ভেতর কোন কষ্টদায়ক প্রাণী থাকতে পারে (আল্লাহ না করুন) তা কষ্ট দিতে পারে। রাসূল (সাঃ) একবার এক জঙ্গলে মোজা পরছিলেন। প্রথম মোজা পরিধান করার পর যখন দ্বিতীয় মোজা পরিধান করতে উদ্যত হলেন এমন সময় একটি কাক উড়ে এসে মোজাটি নিয়ে গেল এবং উপরে নিয়ে ছেড়ে দিল, মোজা উপর থেকে নিচে পড়ার পর মোজা থেকে এক বিষাক্ত সাপ দূরে ছিটকে পড়ল। তা দেখে তিনি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে বললেন ঃ "প্রত্যেক মুমিনের মোজা পরিধান করার সময় তা ঝেড়ে নেয়া উচিত।"

৭. সাদা রংয়ের পোষাক পরিধান করবে, কেননা সাদা পোষাক পুরুষের জন্য পছন্দনীয়। রাসূল (সাঃ) বলেন,"সাদা কাপড় পরিধান করবে, ইহা উত্তম পোশাক। জীবিতাবস্থায় সাদা কাপড় পরিধান করা উচিৎ এবং সাদা কাপড়েই মৃতকে দাফন করা উচিৎ। *(তিরমিযি)*

তিনি বলেন, "সাদা কাপড় পরিধান করবে। সাদা বেশী পরিষ্কার পরিছন্ন থাকে এবং এতে মৃতদের দাফন করবে।"

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অর্থ হলো, সাদা কাপড়ে যদি সামান্যতম দাগও লাগে তবে তা সহজেই দৃষ্টিগোচরও হবে বলে মানুষ তাড়াতাড়ি তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবে। আর রঙ্গীন কাপড়ে দাগ পড়লে তা সহজে দৃষ্টি গোচর হয় না তাই তা তাড়াতাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করারও প্রয়োজন হয় না। (তা অপরিষ্কারই থেকে যায়।)

রাসূল (সাঃ) সাদা পোষাক পরিধান করতেন অর্থাৎ তিনি নিজেও সাদা পোষাক পছন্দ করতেন এবং উম্মাতের পুরুষদেরকেও সাদা পোষাক পরতে উৎসাহ দিয়েছেন।

৮. পায়জামা, লুঙ্গি ইত্যাদি গিরা ঢেকে পরবেনা। যারা অহংকার ও গৌরব প্রকাশের ইচ্ছায় পায়জামা, প্যান্ট ও লুঙ্গি ইত্যাদি গিরার নিচে পরিধান করে তারা রাসূল (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে বিফল মনোরথ ও কঠিন আযাবগ্রস্থ। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ "তিন ধরনের লোক আছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। আর তাদেরকে পাক-পবিত্র করে বেহেশতেও প্রবেশ করাবেন না। তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! এ হতভাগ্য লোকগুলো কারা ? তিনি বললেন -

(ক) যারা গিরার নিচে কাপড় পরে।

(খ) যারা উপকার করে পরে খোটা দেয়।

(গ) যারা মিথ্যা শপথ পূর্বক ব্যবসা বাড়াতে চায়। *(মুসলিম)*

হযরত ওবাইদ বিন খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একবার মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। পেছন থেকে বলতে শুনলাম যে, "তহবন্দ ওপরে উঠাও। এর দ্বারা লোকেরা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা পায়।" আমি পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে, রাসূল (সাঃ)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা তো একটি সাধারণ চাদর। এতে কি আর গৌরব ও অহংকার হতে পারে ? রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "তোমার জন্য আমার অনুসরণ করা কি কর্তব্য নয়?" হুজুরের কথা শুনা মাত্র আমার দৃষ্টি তাঁর তহবন্দের প্রতি পড়ল। দেখতে পেলাম যে, হুজুরের তহবন্দ পায়ের অর্দ্ধেক গোছার উপরে।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "পায়জামা তহবন্দ ইত্যাদি গিরার উপরে রাখলে মানুষ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার অপবিত্রতা থেকে রক্ষা পায়।"

এ কথাটি বড়ই অর্থবোধক ! এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, কাপড় নীচের দিকে ঝুলে থাকলে রাস্তার আবর্জনায় কাপড় ময়লা ও নষ্ট হবে। পাক রাখতে পারবেনা। এ কাজটি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একান্ত পরিপন্থী। অহংকার ও গৌরবের কারণে এমন হয়, গৌরব ও অহংকার হলো অপ্রকাশ্য আবর্জনা। একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর এ ঘোষণাই যথেষ্ট যে,

"আল্লাহর রাসূলের জীবনই তোমাদের জন্য অতি উত্তম আদর্শ।"

(আল কোরআন)

আবু দাউদে উল্লেখিত এক হাদীসে তো তিনি ভয়ানক শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"মুমিনের তহবন্দ পায়ের গোছা পর্যন্ত হওয়া উচিত এবং তার নীচে গিরা পর্যন্ত হলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু গিরার নীচে যতটুকু পর্যন্ত থাকবে ততোটুকু জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আর যে ব্যক্তি গৌরব ও অহংকারের কারণে নিজের কাপড় গিরার নীচে লটকাবে তার প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।"

৯. রেশমী কাপড় পরিধান করবে না, কেননা এটা মহিলাদের পোশাক। রাসূল (সাঃ) পুরুষদেরকে মহিলাদের মত পোষাক পরিধান করতে আর তাদের মত ছুরত ধারণ করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ রেশমী পোষাক পরিধান করো না, যে দুনিয়াতে তা পরিধান করবে সে আখেরাতে পরিধান করতে পারবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

একবার রাসূল (সাঃ) আলী (রাঃ)কে বলেন ঃ "রেশমী কাপড়টি[১] কেটে ওড়না তৈরী কর এবং ফাতেমাদের[২] মধ্যে বন্টন করে দাও। (মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা যায় যে, মহিলাদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা অধিক পছন্দনীয়। সুতরাং তিনি নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে, মহিলাদের ওড়না তৈরী করে দাও, অন্যথায় কাপড়খানা তো অন্য কাজেও লাগানো যেতো।

১০. মহিলারা পাতলা কাপড় পরিধান করবেনা যাতে শরীর দেখা যায় আর এরূপ আটসাট পোশাকও পরিধান করবেনা যার মধ্য থেকে শরীরের গঠন প্রকৃতি আরো আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। আর তারা কাপড় পরিধান করা সত্বেও উলঙ্গ পরিগণিত হবে। রাসূল (সাঃ) এরূপ নির্লজ্জ মহিলাদের পরকালে কঠিন শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন।

"যারা কাপড় পরিধান করা সত্বেও উলঙ্গ থাকে, তারা নিশ্চিত জাহান্নামী। তারা অপরকে সম্মোহিত করে আর নিজেরাও অপরের উপর সম্মোহিত হয়। তাদের মাথা প্রসিদ্ধ বুখত নগরের বড় উটের চোঁটের ন্যায় বাঁকা অর্থাৎ এরা চলার সময় অহংকারের কারণে ঘাড় হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, এ সকল মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা। বস্তুতঃ জান্নাতের সুগন্ধ বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে। *(রিয়াদুস সালেহীন)*

**টীকাঃ -১. এ কাপড়খানা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে 'দুমাহ' এর শাসক উকিদা উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন।*

২. ফাতেমাদের বলে এখানে মূলতঃ নিম্নোক্ত তিনজন সম্মানিতা মহিলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(ক) ফাতেমা যোহরা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর কন্যা ও হযরত আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত হাসান-হোসাইনের(রাঃ) মাতা।

(খ) ফাতেমা (রাঃ) বিনতে আসাদ, হযরত আলী (রাঃ) এর মাতা।

(গ) ফাতেমা বিনতে হামযা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা শহীদের নেতা হযরত হামযার কন্যা।

একবার হযরত আসমা (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিধান করে রাসূল (সাঃ)এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, আসমা! মেয়েরা যখন যুবতী হয় তখন তাদের জন্য মুখ ও হাত ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়।

১১. তহবন্দ ও পায়জামা পরার পরও এমনভাবে বসা বা শোয়া উচিত নয়– যাতে শরীরের গোপনীয় অংশ প্রকাশ হয়ে যাবার বা দেখা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবেনা, তহবন্দ পরিধান করে এক হাটু পর্যন্ত উঠিয়ে বসবে না, বাম হাতে খাবে না, সারা শরীরে চাদর এভাবে পরিধান করবেনা যে, কাজ-কাম করতে, নামায আদায় করতে এবং হাত বের করতে অসুবিধা হয়। চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা রাখবে না।

১২. মহিলা ও পুরুষরা এক ধরনের পোষাক পরিধান করবে না। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ " আল্লাহ তাআলা ঐ সকল পুরুষদের ওপর লা'নত করেছেন যারা মহিলাদের মত পোষাক পরে; আর ঐ সকল নারীদের উপরও লা'নত করেছেন যারা পুরুষদের মত পোষাক পরে।" *(বুখারী)*

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ঐ পুরুষের ওপর অভিশাপ, যে নারীর মত পোষাক পরিধান করে।" *(আবুদাউদ)*

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট কেউ বললেন যে, এক মহিলা পুরুষের অনুরূপ জুতা পরিধান করে; তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব মহিলাদের ওপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষ সাজার চেষ্টা করে।"

১৩. মহিলাগণ ওড়না ব্যবহার করবে এবং তা দ্বারা মাথাও ঢেকে রাখবে। এমন পাতলা ওড়না পরবে না যার মধ্যে থেকে মাথার চুল দেখা যায়, উড়না পরিধান করার মূল উদ্দেশ্যই হ'ল সৌন্দর্য্যকে গোপন করা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ - النور-

মহিলারা নিজেদের বক্ষস্থলের উপর উড়না ফেলে রাখবে।

একবার রাসূল (সাঃ)-এর নিকট মিশরের তৈরী কিছু পাতলা মখমল কাপড় আসল এবং তিনি তা থেকে কেটে কিছু কাপড় হাদিয়া স্বরূপ ক্বালবী (রাঃ)-কে দিয়ে বললেন যে, এটা থেকে একাংশ কেটে নিজের জন্যে জামা তৈরী করবে আর একাংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর জন্যে ওড়না তৈরী করতে দাও। কিন্তু তাকে বলে দিবে যে, তার নীচে যেনো একটা অন্য কাপড় লাগিয়ে নেয় যাতে শরীরের গঠন বাহির থেকে দেখা না যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "এ নির্দেশ নাযিলের পর মহিলারা পাতলা কাপড় ফেলে দিয়ে মোটা কাপড়ের ওড়না তৈরী আরম্ভ করলেন।

(আবু দাউদ)

১৪. পোষাক নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী পরিধান করবে। এরূপ পোষাক পরবেনা যা দ্বারা নিজের অহংকার ও আড়ম্বর প্রদর্শিত হয় এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্নপূর্বক নিজের অর্থের প্রাচুর্য্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হয়। আর নিজের ক্ষমতার বহির্ভূত উচ্চ মূল্যের পোশাকও পরবেনা যদ্দরুন অযথা ব্যয় বাহুল্যের পাপে পতিত হতে হয়। আবার অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের পোষাক পরিধান করে সহায়-সম্বলহীনের বেশ ধারণ করে অপরের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হবে না বরং সর্বদা নিজের ক্ষমতানুযায়ী রুচিপূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করবে।

অনেকে এমন আছে যারা পুরনো ছেড়া কাপড়, তালি দেওয়া কাপড় পরিধান করে সহায়-সম্বলহীনের বেশ ধারণ করে বেড়ায় এবং এটাকে পরহেযগারী বলে মনে করে। এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং যারা রুচিশীল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে দুনিয়াদার বলে মনে করাও ভুল।

একবার প্রখ্যাত ছুফী হযরত আবুল হাসান আলী শাযালী অত্যন্ত দামী কাপড় পরিহিত ছিলেন, এক ছুফী তাঁকে এমতাবস্থায় দেখে প্রতিবাদ করে বললেন যে, আল্লাহ ওয়ালাদের এত মূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরার কি প্রয়োজন? হযরত শাযালী বললেন, ভাই! এটা হলো মহান প্রতাপশালী মহা শক্তিশালী আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। আর তোমার এ সহায়-সম্বলহীনতা হলো ভিক্ষুকের মতো, তুমি এ অবস্থার দ্বারা মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করছ। প্রকৃতপক্ষে ছেড়া-ফাটা পুরনো, তালি দেওয়া নিম্ন মানের কাপড় পরিধান করার মধ্যেই পরহেযগারী সীমাবদ্ধ নয় এবং অত্যন্ত মূল্যবান গৌরবময়

পোষাক পরিধান করার মধ্যেও নয়। পরহেযগারী মানুষের নিয়ত ও সার্বিক চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত সত্য কথা হলো মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতানুযায়ী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সমতা রক্ষা করে চলবে । সহায়-সম্বলহীনতার বেশ ধারণ করে নিজের আত্মাকে অহংকারী হওয়ার সুযোগ দিবে না আর চমক লাগানো মূল্যবান চাকচিক্যময় পোষাক পরে গৌরব ও অহংকারও প্রদর্শন করবে না।

হযরত আবু আহ্ওয়াছ (রাঃ)এর পিতা নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি একবার নবী করিম (সা)-এর দরবারে অত্যন্ত নিম্ন মানের কাপড়ে উপস্থিত হয়েছিলাম । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি ধন-সম্পদ আছে?" আমি বললাম, জী আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি ধরনের সম্পদ আছে আমি বললাম, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে উট, গরু, বকরী, ঘোড়া, গোলাম ইত্যাদি সব প্রকার সম্পদই দান করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন তোমাকে সব ধন-সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন তখন তোমার শরীরেও তার দান ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিৎ।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাকে পর্যাপ্ত নেয়ামত দান করেছেন তখন তুমি নিঃস্ব ভিক্ষুকদের বেশ ধারণ করেছ কেন? এটাতো আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের না শোকরী!

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল (সাঃ) আমাদের বাড়ীতে এলেন, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে ধুলাবালি মিশ্রিত এবং তার মাথার চুলগুলো এলোমেলোভাবে দেখতে পেলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, তার নিকট কি একটা চিরুনীও নেই যে, সে মাথার চুলগুলো একটু ঠিক করে নিতে পারে? অন্য এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে ময়লা কাপড় পরে আছে। তিনি বললেন, এর নিকট কি সাবান-সোডা জাতীয় এমন কোন জিনিস নেই যার দ্বারা কাপড়গুলো পরিষ্কার করে নিতে পারে?

(মেশকাত)

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-কে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শখ হয় যে আমার পোষাক সুন্দর হোক, মাথায় তেল থাকুক, জুতাগুলোও উত্তম হোক। এভাবে অনেকগুলো জিনিসের কথা বললো । এমন কি সে বললো, আমার হাতের লাঠিটিও অত্যন্ত সুন্দর হোক! রাসূল (সাঃ) তদুত্তরে বললেন "এসব কথা পছন্দনীয়, আর আল্লাহ্ তা'আলাও সুন্দর রুচিকে ভালবাসেন।"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) ! আমার উত্তম কাপড় পরাটা কি গৌরব ও অহংকার হবে? তিনি বললেন, "না, ইহা তো সৌন্দর্য্য আর আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "নামাযের জন্যে উত্তম কাপড় পরিধান করে যাবে। আল্লাহর তাআলার নিকট অত্যধিক যোগ্য সেই ব্যক্তি যে তাঁর দরবারে উপস্থিতির সময় (অর্থাৎ নামায আদায় কালে) ভালোভাবে সেজে গুজে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যার অন্তরে অনু পরিমাণও অহঙ্কার আছে সে বেহেশতে যেতে পারবেনা।" এক ব্যক্তি উঠে বললো, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) প্রত্যেক ব্যক্তিই তো এটা চায় যে , তার কাপড় এবং জুতা জোড়া সুন্দর হোক। (এও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত?) রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ সুন্দর, সুন্দরকে ভাল বাসেন। (অর্থাৎ উত্তম পোষাক অহংকারের নয় বরং উহা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।) প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো সত্যের পরোয়া না করা আর পরকে হীন ও নিকৃষ্ট মনে করা।" *(মুসলিম)*

১৫. পোশাক-পরিচ্ছদ সাজসজ্জা ও শালীনতার প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। জামার বুক খোলা রেখে ঘোরা-ফিরা করা, আড়াআড়িভাবে বুতাম লাগান, পায়জামার এক পা ওপরে উঠিয়ে রাখা, অন্য পা নীচে রাখা, অথবা চুল এলোমেলো রাখা ইত্যাদি রুচি ও শালীনতা বিরোধী।

একদিন রাসূল (সাঃ) মসজিদে (নববীতে) ছিলেন, এমন সময় উস্ক খুস্ক চুল দাড়ি নিয়ে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো, রাসূল (সাঃ) তার প্রতি হাত দ্বারা চুলদাড়ি ঠিক করে আসতে ইঙ্গিত করলেন। তখন ঘরে গিয়ে চুল-দাড়ি পরিচর্যা করে আসলো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, "মানুষের চুল এলোমেলো থাকার চাইতে সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখা কি উত্তম নয়?

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "এক পায়ে জুতা পরে কেউ যেন চলাফেরা না করে, হয়তো উভয়টি পরবে অথবা খালি পায়ে চলবে "।

১৬. লাল, উজ্জ্বল চমৎকার রং, কাল এবং গেরুয়া রংএর পোষাক পরবেনা। লাল উজ্জ্বল ঝিকমিকে রং এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই শোভা পায়। তবে তাদেরও সীমা লংঘন করা উচিৎ নয়। আশ্চর্য ধরনের হাসির উদ্রেককারী পোষাক পরবে না যা পরিধান করলে অনর্থক বেঢং-অদ্ভুত দেখা যায় আর লোকেরা হাসি-ঠাট্টা ও পরিহাস করার জন্যে উৎসাহিত হয়।

১৭. সাদা, রুচিশীল পোষাক পরিধান করবে। পোশাকের ব্যাপারে বিলাসিতা ও প্রয়োজনের অধিক মাধুর্য্য পরিহার করে চলবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "বিলাসিতা থেকে দূরে থেকো কেননা আল্লাহর নেক বান্দাহগণ বেশী বিলাসপ্রিয় হয় না।" *(মেশকাত)*

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মিনতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাদা-সিধা পোষাক পরিধান করে আল্লাহ তাআলা তাকে আভিজাত্যের পোশাকে ভূষিত করবেন। *(আবু দাউদ)*

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) একদিন একত্রে বসে দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, "সাদা-সিধা পোষাক ঈমানের আলামতসমূহের মধ্যে একটি । *(আবু দাউদ)*

একবার রাসূল (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দাহ আছে যাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা থাকে অত্যন্ত সাধা-সিধে। তাদের চুলগুলো পরিপাটি, পরনের কাপড়গুলো সাধা-সিধে ও মলিন, কিন্তু তাদের মর্যাদা এত বেশী যে তারা যদি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের কসম পূর্ণ করে দেন। এ ধরনের লোকদের মধ্যে বারা বিন মালেক একজন" । *(তিরমিযী)*

১৮. আল্লাহ তা'আলার এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় স্বরূপ সে সব গরীবদেরকেও বস্ত্রদান করবে, যাদের শরীর ঢাকার মত কোন বস্ত্র নেই। রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বস্ত্র দ্বারা তার শরীর আবৃত করল কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বেহেস্তের সবুজ পোষাক পরিধান করিয়ে তার শরীরও আবৃত করবেন।" *(আবু দাউদ)*

তিনি এও বলেছেন যে, "কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে বস্ত্র দিলে যতদিন ঐ বস্ত্র তার পরনে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিজের হেফাজতে রাখবেন।"

১৯. যে সকল চাকর দিন রাত আপনার সেবায় নিয়োজিত তাদেরকে আপনার মর্যাদানুযায়ী উত্তম পোষাক পরাবেন।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে যার অধীনস্থ করে দিয়েছেন তার উচিত তাদেরকে তাই খাওয়ান যা সে নিজে খায়, আর তাদেরকে তাই পরাবে যা সে নিজে পরে। তাকে দিয়ে ততটুকু কাজ করাবে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব। অর্পিত কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব না হলে নিজেও অংশ গ্রহণ করে তাকে সাহায্য করবে।"

পানাহারের আদবসমূহ

১. খাবার আগে হাত ধুয়ে নিবে। খাবারে ব্যবহৃত হাত পরিষ্কার থাকলে অন্তরেও শান্তি অনুভব হয়।

২. 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে খাওয়া শুরু করবে, ভুল হয়ে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই 'বিস্‌মিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' বলবে। স্মরণ রাখবে, যে খাদ্যে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না ঐ খাদ্য শয়তান নিজের জন্যে বৈধ করে নেয়।

৩. খাবার সময় হেলান দিয়ে বসবে না। বিনয়ের সাথে পায়ের তালু মাটিতে রেখে হাঁটু উঠিয়ে বসবে অথবা দুই হাঁটু বিছিয়ে (সালাতের ন্যায়) বসবে অথবা এক হাঁটু বিছিয়ে অপর হাঁটু উঠিয়ে বসবে কেননা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এভাবে বসতেন।

৪. ডান হাতে খাবে তবে আবশ্যক বোধে বাম হাতের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

৫. তিন আঙ্গুলে খাবে, তবে আবশ্যক বোধে কনিষ্ঠাঙ্গুলী ছাড়া চার আঙ্গুলে খাওয়া যাবে। আঙ্গুলের গোড়া পর্যন্ত খাদ্য বস্তু লাগাবে না। (অর্থাৎ সারা হাতকে বিশ্রী করবে না। রুটি বা শুকনো খাদ্যখেতে তিন বা চার আঙ্গুলই যথেষ্ট তবে ভাত খেতে পাঁচ আঙ্গুলের প্রয়োজন হয়।

৬. লোকমা একেবারে বড়ও নেবেনা আবার একেবারে ছোটও নেবেনা। এক লোকমা গলাধঃকরণ করার পর অন্য লোকমা নেবে।

৭. রুটি দ্বারা কখনও হাত পরিষ্কার করবে না। এটা অত্যন্ত ঘৃণিত অভ্যাস।

৮. রুটি ঝেড়ে বা আছড়িয়ে নেয়া ঠিক নয়।

৯. প্লেট থেকে নিজের দিক থেকে খাবে, প্লেটের মাঝখান থেকে বা অপরের দিক থেকেও খাবেনা।

১০. খাদ্য বস্তু পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে অথবা ধুয়ে খাবে।

১১. সবাই একত্রে বসে খাবে, এভাবে খেলে পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যে বরকতও হয়।

১২. খাদ্যে কখনও দোষ বের করবে না, পছন্দ না হলে খাবেনা।

১৩. মুখ পুড়ে যায় এমন গরম খাদ্য খাবে না।

১৪. খাবার সময় আট্টহাসি হাসা এবং অতিরিক্ত কথা বলা থেকে যতদূর সম্ভব বিরত থাকবে।

১৫. বিনা প্রয়োজনে খাদ্য বস্তুকে শুঁকবে না। খাবার সময় বার বার এমনভাবে মুখ খুলবে না যেন চিবানো খাদ্য অপরের দৃষ্টি গোচর হয় এবং বার বার মুখে হাত দিয়ে দাঁত থেকে কিছু বের করবে না, কারণ এতে লোকদের ঘৃণার উদ্রেক হয়।

১৬. খাবার বসে খাবে এবং পানিও বসে পান করবে। প্রয়োজনবোধে ফলাদি দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে এবং পানিও পান করা যাবে।

১৭. প্লেটে উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট খাদ্য তরল জাতীয় হলে পান করে নেবে আর ঘন জাতীয় হলে মুছে থালা পরিষ্কার করবে।

১৮. খাবার জিনিসে ফুঁ দেবেনা, কারণ পেটের অভ্যন্তর থেকে আসা শ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়।

১৯. পানি তিন নিঃশ্বাসে থেমে থেমে পান করবে, এতে তৃপ্তিও হয়, তাছাড়া পানি এক সাথে পেটে ঢেলে দিলে অনেক সময় কষ্টও অনুভব হয়।

২০. একত্রে খেতে বসলে দেরীতে ও ধীরে ধীরে খাওয়ার লোকদের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং সকলের সাথে একসাথে খাবার থেকে অবসর হবে।

২১. আঙ্গুল চেটে খাবে তারপর হাত ধুয়ে নিবে।

২২. ফল-ফলাদি খাবার সময় একসাথে দুইটা বা দু ফালি মুখে দেবে না।

২৩. ভাঙ্গা লোটা, সোরাই ইত্যাদি দ্বারা পানি পান করবে না। এমন পাত্রে পান করবে যার থেকে পানি দৃষ্টিগোচর হয় যেনো কোন পচা বা ক্ষতিকর বস্তু পেটে না ঢুকে যায়।

২৪. খাবার থেকে অবসর হয়ে এ দোআ পাঠ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার নিয়মনীতি

১. সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসলে শিশুদেরকে ঘরে ডেকে আনবে এবং বাইরে খেলতে দেবেনা। রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। সাবধানতা হিসেবে একান্ত অবশ্যকতা ব্যতীত শিশুদেরকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দেয়া উচিৎ নয়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যখন সন্ধ্যা হয় তখন ছোট শিশুদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে। কেননা, এ সময় শয়তানের দল (দুষ্ট জ্বিনেরা) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, তবে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর শিশুদেরকে ছেড়ে দিতে পার।" *(সিয়াহ সিত্তাহ, হেছনে হাছীন)*

২. সন্ধ্যায় এ দোআ' পাঠ করবে। রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে এ দোআ পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন।

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ - (ترمذى)

"আয় আল্লাহ! আমরা তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যা পেয়েছি, তোমারই সাহায্যে ভোর পেয়েছি, তোমারই দয়ায় জীবিত আছি, তোমারই নির্দেশে মৃত্যুবরণ করব আর শেষ পর্যন্ত তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।" *(তিরমিযী*

মাগরিবের আযানের সময় এ দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِيْ ـ (ترمذى ابوداؤد)

"হে আল্লাহ! এটা তোমার রাতের আগমনের সময়, তোমার দিনের প্রস্থানের সময়। তোমার আহ্বানকারীদের আহ্বানের সময়, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" *(তিরমিযি, আবু দাউদ)*

৩. এশার নামায আদায়ের আগে নিদ্রা যাবে না। এমতাবস্থায় অধিকাংশ সময় এশার নামায বাদ পড়ার ভয় থাকে, আর এমনও হতে পারে যে, হয়তো এ নিদ্রাই চির নিদ্রা হবে। রাসূল (সাঃ) এশার নামাজের পূর্বে কখনও নিদ্রা যেতেন না।

৪. রাত হওয়া মাত্রই ঘরে আলো জ্বালাবে। আলো জ্বালান হয়নি এমন ঘরে রাসূল (সাঃ) নিদ্রা যেতেন না।

৫. অনেক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে না। রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে ও শেষরাতে তাড়াতাড়ি উঠতে অভ্যাস করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, এশার নামাযের পর আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্যে জাগ্রত থাকতে পারবে অথবা ঘরের লোকদের সাথে আবশ্যকীয় কথা-বার্তা বলার জন্যে জাগ্রত থাকা যাবে।

৬. রাত্রে জেগে দিনে নিদ্রা যাবে না। আল্লাহ তাআলা রাতকে সুখ ও শান্তির জন্যে সৃষ্টি করেছেন আর দিনকে জাগ্রত থাকা এবং জরুরী কাজে পরিশ্রম করার সময় হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।

পবিত্র কোরআনে সূরা আল-ফুরক্বানের ৪৭ নং আয়াতে আছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ـ

"তিনিই আল্লাহ যিনি রাতকে তোমাদের জন্যে পর্দাস্বরূপ, নিদ্রাকে সুখ ও শান্তির জন্যে এবং দিনকে (রুজীর সন্ধানে) ছড়িয়ে পড়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন।" সূরা আন নাবায় আছে–

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَّجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ـ

"আমি তোমাদের জন্যে নিদ্রাকে সুখ ও শান্তি, রাতকে পর্দা ও দিনকে জীবিকার জন্যে কায়িক পরিশ্রম করার উত্তম সময় হিসেবে নির্ধারিত করেছি।"

সূরায়ে আন-নমলের ৮৬ নং আয়াতে আছে–

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

"তারা কি দেখেনি যে, আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি যেনো তারা তাতে সুখ ও শান্তি ভোগ করে আর দিনকে (সৃষ্টি করেছি) উজ্জ্বল হিসেবে (যেনো তারা তাতে জীবিকার জন্যে সাধ্যমত পরিশ্রম করে। নিঃসন্দেহে এতে মুমিনদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"

"একবার রাসূল (সাঃ) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানতে পারলাম যে, তুমি দিনে রোজা রাখ এবং সারা রাত নামাযে মগ্ন থাক, এটা কি সত্য? আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বললেন, জ্বী হাঁ, সত্য। রাসূল (সাঃ) বললেন, না, এরূপ করবে না, কখনও কখনও রোযা রাখবে আবার কখনো কখানো রোযা রাখবেনা। তদ্রূপ ঘুমাবে আবার ঘুম থেকে উঠে নামাযও আদায় করবে। কেননা, তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার ওপর তোমার চোখেরও অধিকার আছে।" *(বুখারী)*

৭. অতিরিক্ত আরামদায়ক বিছানায় আরাম করবে না। দুনিয়ায় মুমিনকে অধিক সুখ অন্বেষণ, আনন্দ উল্লাস ও বিলাস বসন থেকে বিরত থাকতে হবে। মু'মিনের জন্যে জীবন হলো জিহাদ সমতুল্য, তাই মুমিনকে তার জীবন যুদ্ধে অধিক কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূল (সাঃ)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তাতে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল।" *(শামায়েলে তিরমিযী)*

"হযরত হাফছা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনার ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, একটি চট ছিল যা আমি দু'ভাঁজ করে রাসূল (সাঃ)-এর জন্যে বিছিয়ে দিতাম, একদিন আমি ভাবলাম যে, চার ভাঁজ করে বিছানো হলে হয়তো কিছুটা বেশী নরম হবে। সুতরাং আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। ভোরে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার পিঠের নিচে কি বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি উত্তরে বললাম, ঐ চটই ছিল, তবে আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছিলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন, না, উহাকে দুভাঁজেই থাকতে দাও। রাতে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতে নরম বিছানা আমার অলসতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" *(শামায়েল তিরমিযি)*

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার এক আনসারী মহিলা আমাদের ঘরে এসে রাসূল (সাঃ)-এর বিছানা দেখলেন, সেই মহিলা তার ঘরে গিয়ে পশম ভর্তি নরম মোলায়েম বিছানা তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) ঘরে এসে ঐ বিছানা দেখে বললেন, এটা কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক আনসারী মহিলা আমাদের ঘরে এসে আপনার বিছানা দেখে গিয়েছিলেন, পরে তিনি এটা তৈরী করে আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, না, এটা ফিরিয়ে দাও। ঐ বিছানাটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছিল তাই তা ফেরৎ দিতে মন চাচ্ছিল না। কিন্তু রাসূল (সাঃ) তা ফেরৎ দেওয়ার জন্যে এত জোর দিয়ে বলছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমাকে তা ফেরৎ দিতেই হলো।" *(শামায়েলে তিরমিযি)*

"রাসূল (সাঃ) একবার খালি চাটাইতে শোয়ার কারণে তাঁর শরীরে চাটাইর দাগ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তা দেখে কাঁদতে লাগলাম। রাসূল (সাঃ) আমাকে কাঁদতে দেখে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোম ও ইরানের বাদশাহগণ সিল্ক ও পশমের গদিতে ঘুমাবে আর আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও চাটাইর উপর ঘুমাবেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, "এতে কাঁদার কিছু নেই। তাদের জন্যে শুধু দুনিয়া আর আমাদের জন্যে হলো আখিরাত।"

একবার রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "আমি কিভাবে সুখ-শান্তি ও নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করব? ইস্‌রাফীল (আঃ) মুখে সিঙ্গা নিয়ে কান খাড়া করে অবনত মস্তকে অপেক্ষা করছেন যে, কখন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আদেশ হয়।" *(তিরমিযি)*

৮. রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতের দাবী হলো মুমিন এ পৃথিবীতে মুজাহিদের ন্যায় জীবন-যাপন করবে এবং সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবে। ঘুমানোর পূর্বে অযু করারও গুরুত্ব দিবে এবং পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘুমাবে। হাতে কোন তৈলাক্ত জিনিস লেগে থাকলে হাত ধুয়ে ঘুমাবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "কারো হাতে যদি কোন তৈলাক্ত বস্তু লেগে থাকে এবং সে যদি তা না ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং এতে যদি তার কোন ক্ষতি হয় (অর্থাৎ বিষাক্ত প্রাণী আঘাত করে) তাহলে সে যেনো নিজেকেই নিজে তিরস্কার করে।

রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, শোয়ার পূর্বে অযু করতেন।

৯. ঘুমানোর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে। পানাহারের পাত্র ঢেকে রাখবে। আলো নিভিয়ে দেবে।

একবার মদীনায় রাতের বেলায় আগুন লেগে গেল, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ আগুন হলো তোমাদের শত্রু, যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন আগুন নিভিয়ে দেবে।

১০. শোয়ার সময় বিছানার উপর বা বিছানার নিকট, পানি ও গ্লাস, লোটা বা বদনা, লাঠি, আলোর জন্যে দিয়াশলাই, মেসওয়াক, তোয়ালে ইত্যাদি অবশ্যই রাখবে। কোথাও মেহমান হলে বাড়ীওয়ালাদের নিকট থেকে পায়খানা ইত্যাদির কথা অবশ্যই জেনে নেবে, কেননা, হয়তো রাতে আবশ্যক হতে পারে অন্যথায় কষ্ট হতে পারে। রাসূল (সাঃ) যখন আরাম করতেন তখন তাঁর শিয়রে নিম্নের সাতটি বস্তু রাখতেন—

(ক) তেলের শিশি।
(খ) চিরুনী।
(গ) সুরমাদানী।
(ঘ) কাঁশি।
(ঙ) মেসওয়াক।
(চ) আয়না।
(ছ) কাঠের একটি শলাকা যা মাথা ও শরীর চুলকানোর কাজে আসে।

১১. ঘুমানোর সময় জুতা ও ব্যবহারের কাপড় কাছেই রাখবে, যেনো ঘুম থেকে উঠে খুঁজতে না হয় এবং ঘুম থেকে উঠেই জুতা পায়ে দেবে না, তদ্রূপ না ঝেড়ে কাপড়ও পরিধান করবে না, আগে ঝেড়ে নেবে, হয়তো জুতা অথবা কাপড়ের ভেতর কোন কষ্টদায়ক প্রাণী লুকিয়ে থাকতে পারে। আর আল্লাহ না করুন! ঐ প্রাণী কষ্ট দিতে পারে।

১২. শোয়ার আগে বিছানা ভাল করে ঝেড়ে নেবে, প্রয়োজন বোধে শোয়া থেকে উঠে গেলে তারপর আবার এসে শুতে হলে তখনও বিছানা ভাল করে ঝেড়ে নেবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "রাতে তোমাদের কেউ যখন বিছানা থেকে উঠে বাইরে যাবে এবং জরুরত সেরে পুনঃ বিছানায় ফিরে আসবে তখন নিজের পরনের তহবন্দের একমাথা দিয়ে তিন বার বিছানা ঝেড়ে নিবে। কেননা, সে জানেনা যে, তার প্রস্থানের পরে বিছানায় কি এসে পড়েছে।" *(তিরমিযি)*

১৩. বিছানায় গিয়ে এ দোআ পড়বে। রাসূল (সাঃ)-এর বিশিষ্ট খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিছানায় যেতেন তখন এ দোআ টি পাঠ করতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لَا كَافِیَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِیَ ۔ (شمائل ترمذی)

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন, যিনি আমাদের কাজ-কর্মে সাহায্য করেছেন, যিনি আমাদের বসবাসের ঠিকানা দিয়েছেন। আর কত লোক আছে যাদের কোন সাহায্যকারী ও ঠিকানা দাতা নেই।

১৪. বিছানায় গিয়ে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করবে। রাসূল (সাঃ) ঘুমানোর পূর্বে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করতেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি বিছানায় বিশ্রাম করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের কোন সূরা পাঠ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যে সে ঘুম থেকে চৈতন্য হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে পাহারা দেয়। *(আহমাদ)*

তিনি আরো বলেন, "মানুষ যখন বিছানায় গিয়ে পৌঁছে তখন একজন ফিরিশতা ও একজন শয়তানও সেখানে গিয়ে পৌঁছে। ফিরিশতা তাকে বলে–"ভাল কাজ দ্বারা তোমার কর্ম শেষ কর।" শয়তান বলে--"মন্দ কাজ দ্বারা তোমার কর্ম শেষ কর।" অতঃপর সে ব্যক্তি যদি আল্লাহকে স্মরণের কুরআন পাঠের মাধ্যমে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে ফিরিশতা সারা রাত তাকে পাহারা দিতে থাকে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, "রাসূল (সাঃ) বিছানায় গিয়ে দোআ করার মত হাত উত্তোলন করতেন এবং কুলহুআল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস সূরাসমূহ পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দিতেন, তারপর শরীরের যে পর্যন্ত হাত পৌছান সম্ভব হতো সে পর্যন্ত সারা শরীর মর্দন করতেন। মাথা, চেহারা ও শরীরের সামনের অংশ থেকে মর্দন আরম্ভ করতেন। এরূপ তিন তিনবার করতেন।" *(শামায়েলে তিরমিযি)*

১৫. ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ডান হাত ডান চোয়ালের নিচে রেখে ডান পাশে কাত হয়ে শুবে।

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বিশ্রাম করার সময় ডান হাত ডান চোয়ালের নিচে রেখে এ দোআ পাঠ করতেন−

رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সে দিনের আযাব থেকে রক্ষা করো, যে দিন তুমি তোমার বান্দাহদেরকে উঠিয়ে তোমার নিকট হাযির করবে।" হেছনে হাছীন নামক কিতাবে আছে যে, তিনি এ শব্দগুলো তিনবার পাঠ করতেন।

১৬. উপুড় হয়ে ও বামপাশে ঘুমানো থেকে বিরত থাকবে। হযরত মুয়ী'শ (রাঃ)-এর পিতা তাফখাতুল গিফারী (রাঃ) বলেন, "আমি মসজিদে নববীতে উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি পা দিয়ে নাড়িয়ে বলল, এভাবে শোয়াকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, আমি চোখ খুলে দেখতে পেলাম যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন রাসূল (সাঃ)।" *(আবু দাউদ)*

১৭. ঘুমাবার জন্যে এমন স্থান নির্বাচন করবে যেখানে নির্মল বাতাস প্রবাহিত হয় এবং এমন বদ্ধ কামরায় ঘুমাবে না যেখানে এরূপ বাতাস প্রবাহিত হয় না।

১৮. মুখ ঢেকে ঘুমাবে না যাতে স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, মুখ খুলে ঘুমাবার অভ্যাস করবে যেনো (শ্বাস প্রশ্বাসে) নির্মল বাতাস গ্রহণ করা যায়।

১৯. দেওয়াল বা বেড়াবিহীন ঘরে ঘুমাবে না এবং ঘর থেকে নামার সিঁড়িতে পা রাখার আগেই আলোর ব্যবস্থা করবে। কেননা, অনেক সময় সাধারণ ভুলের কারণেও অসাধারণ কষ্ট ভোগ করতে হয়।

২০. যত প্রচণ্ড শীতই পড়ুক না কেন আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে এবং বদ্ধ কামরাতে হারিকেন জ্বালিয়ে ঘুমাবে না। আবদ্ধ কামরায় জ্বলন্ত আগুনে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এমন কি অনেক সময় উহা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

২১. ঘুমানোর পূর্বে দোআ করবে। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) ঘুমাবার আগে এ দোআ পাঠ করতেন।

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ -

"হে আমার প্রতিপালক! তোমারই নামে আমার শরীর বিছানায় শায়িত করলাম এবং তোমারই সাহায্যে বিছানা থেকে উঠব। তুমি যদি রাতেই আমার মৃত্যু দাও তাহলে তার প্রতি দয়া কর। আর তুমি যদি আত্মাকে ছেড়ে দিয়ে অবকাশ দাও, তাহলে তাকে হেফাজত করো। যেমনভাবে তুমি তোমার নেক্কার বান্দাহকে হেফাজত করে থাকো।"

এ দোআ মুখস্থ না থাকলে নিম্নের ছোট দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى -

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যু বরণ করছি এবং তোমারই নামে জীবিত হয়ে উঠবো।"

২২. শেষ রাতে ওঠার অভ্যাস করবে। আত্মার উন্নতি ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যে শেষ রাতে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করা অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করা উচিত। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, "তারা শেষ রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে রুকু–সেজদা করে ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।" রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি রাতের প্রথম ভাগে বিশ্রাম করতেন এবং শেষ রাতে উঠে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হতেন।

২৩. ঘুম থেকে উঠে এ দোআ পাঠ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

(بخاری ومسلم)

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর আবার জীবিত করেন আর তাঁরই দিকে পুনরুত্থিত হতে হবে।"

২৪. যদি সুস্বপ্ন দেখ তবে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে এবং নিজের সু-সংবাদ বলে মনে করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, এখন নবুয়ত থেকে বাশারত ছাড়া আর কিছু বাকী নেই। (কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শেষ নবী হওয়ার কারণে নবুয়তের দরজা একেবারে বন্ধ) সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, বেশারত অর্থ কি? তিনি বললেন, সুস্বপ্ন। (বুখারী) তিনি বলেছেন যে, "তোমাদের মধ্যে যে অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে।" তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, "কোন স্বপ্ন দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং ঈমানদার বন্ধুর নিকট বর্ণনা করবে।" রাসূল (সাঃ) কোন স্বপ্ন দেখলে তা সাহাবায়ে কেরামের নিকট বর্ণনা করতেন আর তাদেরকে বলতেন, "তোমাদের স্বপ্ন বর্ণনা কর, আমি উহার ব্যাখ্যা দেব।" *(বুখারী)*

২৫. দুরূদ শরীফ বেশী বেশী করে পড়বে, কেননা আশা করা যায় যে, এর বরকতে আল্লাহ তাআ'লা রাসূল (সাঃ)এর যিয়ারত নসীব করবেন।

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) একবার হযরত ফজলে রহমান গাঞ্জ মুরাদাবাদী (রঃ) কে বল্লেন যে, "আমাকে এমন একটি দুরূদ শরীফ শিক্ষা দিন যা পড়লে রাসূল (সাঃ)এর দীদার নসীব হয়। তিনি বললেন, এমন কোন বিশেষ দরূদ নেই, শুধু আন্তরিকতা সৃষ্টি করে লও, উহাই যথেষ্ট। তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি বললেন, তবে হযরত সাইয়্যেদ হাসান (রঃ) এ দরূদ শরীফটি পাঠ করে বিশেষ ফল লাভ করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعِتْرَتِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ -

"হে আল্লাহ! তোমার জানা যত কিছু আছে তত সংখ্যক রহমত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর নাযিল কর।"

রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখেছে, কেননা শয়তান কখনোই আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" *(শামায়েলে তিরিমিযি)*

হযরত ইয়াযীদ ফারসী (রঃ) পবিত্র কোরআন লিখতেন। একবার তিনি রাসূল (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পেলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তখন জীবিত ছিলেন। হযরত ইয়াযীদ (রঃ) তাঁর নিকট স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে রাসূল (সাঃ)-এর এ হাদীস শুনিয়ে দিলেন যে, তিনি বলেছেন "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যিই আমাকে দেখেছে, কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।" তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি স্বপ্নে যাকে দেখেছ তাঁর আকৃতির বর্ণনা দিতে পার।" হযরত ইয়াযীদ (রঃ) বললেন, তাঁর শরীর ও দেহের উচ্চতা অত্যন্ত মধ্যমাকৃতির, তাঁর গায়ের রং শ্যামলা সাদা মিশ্রিত সুন্দর, চক্ষু যুগল সুরমা লাগানো। হাসি-খুশী মুখ, সুশ্রী গোল চেহারা, মুখমণ্ডল বেষ্টিত সিনার দিকে বিস্তৃত ঘন দাঁড়ি।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তুমি যদি রাসূল (সাঃ)-কে জীবিতাবস্থায় দেখতে তা হলেও এর থেকে বেশী সুন্দর করে তাঁর আকৃতির বর্ণনা দিতে পারতে না (অর্থাৎ তুমি যে আকৃতির কথা বর্ণনা করেছ তা প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সাঃ)এরই আকৃতি। *(শামায়েলে তিরমিযি)*

২৬. আল্লাহ্ না করুন! কোন সময় অপছন্দনীয় ও ভীতিজনক কোন স্বপ্ন দেখলে তা কারো নিকট বলবেনা এবং ঐ স্বপ্নের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। হযরত আবু সালামা বলেন, মন্দ স্বপ্নের কারণে বেশীরভাগ সময় আমি অসুস্থ থাকতাম। একদিন আমি হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)-এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস শোনালেন, "সু স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। তোমাদের কেউ যদি কোন স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেনো তার একান্ত বন্ধু ছাড়া আর কারো কাছে তা বর্ণনা না করে। আর কোন মন্দ স্বপ্ন দেখলে তা অন্য কাউকে বলবে না। বরং সচেতন হলে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" বলে বামদিকে তিনবার থু থু ফেলবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শু'বে, তাহলে সে স্বপ্নের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাবে।"

(রিয়াদুস সালেহীন)

২৭. নিজের মন থেকে কখনো মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করে বর্ণনা করবে না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মনগড়া মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামতের দিন তাকে দু'টি যবের মধ্যে গিরা দেওয়ার শাস্তি প্রদান করা হবে, বস্তুতঃ সে কখনো গিরা দিতে পারবে না। সুতরাং সে আযাব ভোগ করতে থাকবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "মানুষ চোখে না দেখে যে কথা বলে তা হলো অত্যন্ত জঘন্য ধরনের মিথ্যারোপ।" *(বুখারী)*

২৮ কোন বন্ধু যখন তার নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে তখন তার স্বপ্নের উত্তম ব্যাখ্যা দেবে এবং তার মঙ্গলের জন্যে দোআ করবে। একবার এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে রাসূল (সাঃ) বললেন, "উত্তম স্বপ্ন দেখেছ, উত্তম ব্যাখ্যা হবে।"

রাসূল (সাঃ) ফজরের নামাযের পর পিছনের দিকে ফিরে পা গুটিয়ে বসতেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, যে যা স্বপ্ন দেখেছ তা বল আর স্বপ্নের কথা শোনার আগে বলতেন-

خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ خَيْرًا لَنَا وَشَرًّا عَلٰى اَعْدَائِنَا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

"ঐ স্বপ্নের শুভ ফল তোমার নসীব হোক, উহার খারাপ ফল থেকে তোমাকে রক্ষা করুন, আমাদের জন্যে উত্তম এবং আমাদের শত্রুদের দুর্ভাগ্য হোক, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক।"

২৯. কখনো স্বপ্নে ভয় পেলে অথবা চিন্তাযুক্ত স্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে পড়লে, ঐ ভয় ও অস্থিরতা দূর করার জন্যে এ দোআ পাঠ করবে এবং নিজেদের বুঝ-জ্ঞান সম্পন্ন বাচ্চাদেরকেও এ দোআটি মুখস্ত করিয়ে দেবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে ভীত অথবা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ত তখন রাসূল (সাঃ) তাদের অস্থিরতা দূর করার জন্য এ দোআটি শিক্ষা দিতেন এবং পড়তে বলতেন।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ ـ (ابو داؤد - ترمذى)

"আমি আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর গযব ও ক্রোধ, তাঁর শাস্তি, তাঁর বান্দাদের দুষ্টামী, শয়তানদের ওয়াসওয়াসা ও তারা আমার নিকট উপস্থিতির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পানাহ চাই।" *(আবু দাউদ, তিরমিযি)*

পথ চলার আদব সমূহ

১. রাস্তায় সব সময় মধ্যম গতিতে চলবে। এত দ্রুত গতিতে চলবে না যে, লোকদের নিকট অনর্থক উপহাসের পাত্র হও, আবার এত ধীর গতিতেও চলবে না যে, লোকেরা দেখে অসুস্থ মনে করে অসুস্থতার বিষয় জিজ্ঞেস করে। রাসূল (সাঃ) মধ্যম গতিতে লম্বা কদমে পা উঠিয়ে হাঁটতেন, তিনি কখনও পা হেঁচড়িয়ে হাঁটতেন না।

২. পথ চলার সময় শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সাথে নিচের দিকে দেখে চলবে, রাস্তার এদিকে সেদিকে দেখতে দেখতে চলবে না, এরূপ করা গাম্ভীর্য ও সভ্যতার খেলাফ।

রাসূল (সাঃ) পথ চলার সময় নিজের শরীর মুবারককে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে হাঁটতেন, মনে হত যেনো কেউ ওপর থেকে নিচের দিকে নামছে, তিনি গাম্ভীর্যের সাথে শরীর সামলিয়ে সামান্য দ্রুতগতিতে হাঁটতেন, এ সময় ডানে বামে দেখতেন না।

৩. বিনয় ও নম্রতার সাথে পা ফেলে চলবে এবং সদর্প পদক্ষেপে চলবে না, কেননা, পায়ের ঠোকরে যমীনও ছেদ করতে পারবে না আর পাহাড়ের চূড়ায়ও উঠতে পারবে না সুতরাং সদর্প পদক্ষেপে চলে আর লাভ কি?

৪. জুতা পরিধান করে চলবে, কখনো খালি পায়ে চলবে না, জুতা পরিধান করার কারণে পা কাঁটা, কঙ্কর ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নিরাপদ থাকে এবং কষ্টদায়ক প্রাণী থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (সাঃ) বলেন, "অধিকাংশ সময় জুতা পরিধান করে থাকবে মূলতঃ জুতা পরিধানকারীও এক প্রকারের আরোহী।"

৫. পথ চলতে উভয় পায়ে জুতা পরিধান করে চলবে অথবা খালি পায়ে চলবে , এক পা নগ্ন আর এক পায়ে জুতা পরিধান করে চলা বড়ই হাস্যকর ব্যাপার। যদি প্রকৃত কোন ওযর না থাকে তা হলে এরূপ রুচিহীন ও সভ্যতা বিরোধী কার্য থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "এক পায়ে জুতা পরে চলবে না, উভয় পায়ে জুতা পরবে অথবা খালি পায়ে চলবে ।" *(শামায়েলে তিরমিযি)*

৬. পথ চলার সময় পরিধেয় কাপড় উপরের দিকে টেনে নিয়ে পথ চলবে যেনো অগোছালো কাপড়ে কোন ময়লা বা কষ্টদায়ক বস্তু জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকে। রাসূল (সাঃ) পথ চলার সময় নিজের কাপড় সামান্য উপরের দিকে উঠিয়ে নিতেন।

৭. সঙ্গীদের সাথে সাথে চলবে । আগে আগে হেঁটে নিজের মর্যাদার পার্থক্য দেখাবে না। কখনো কখনো নিঃসংকোচে সঙ্গীর হাত ধরে চলবে , রাসূল (সাঃ) সঙ্গীদের সাথে চলার সময় কখনো নিজের মর্যাদার পার্থক্য প্রদর্শন করতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি সাহাবীদের পিছনে পিছনে হাঁটতেন আর কখনো কখনো নিঃসংকোচে সাথীর হাত ধরেও চলতেন।

৮. রাস্তার হক আদায় করবে। রাস্তায় থেমে অথবা বসে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। আর কখনো রাস্তায় থামতে হলে রাস্তার ৬টি হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

(ক) দৃষ্টি নিচের দিকে রাখবে।

(খ) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরে ফেলে দেবে।

(গ) সালামের জবাব দেবে।

(ঘ) ভাল কাজের আদেশ দেবে, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

(ঙ) পথহারা পথিককে পথ দেখিয়ে দেবে।

(চ) বিপদগ্রস্থকে যথাসম্ভব সাহায্য করবে।

৯. রাস্তায় ভাল লোকদের সাথে চলবে । অসৎ লোকদের সাথে চলাফেরা করা পরিহার করবে।

১০. রাস্তায় নারী-পুরুষ একত্রে মিলেমিশে চলাচল করবে না। নারীরা রাস্তার মধ্যস্থল পুরুষদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে এক পার্শ্ব দিয়ে চলাচল করবে, এবং পুরুষরা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, পচা দুর্গন্ধময় কাদা মাখানো শূকরের সাথে ধাক্কা খাওয়া সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু নারীর সাথে ধাক্কা খাওয়া সহ্য করা যায় না।

১১. ভদ্র মহিলাগণ যখন কোন প্রয়োজনবশতঃ রাস্তায় চলাচল করবে তখন বোরকা অথবা চাদর দিয়ে নিজের শরীর, পোষাক ও রূপ চর্চার সকল বস্তু ঢেকে নিবে এবং চেহারায় ঘোমটা লাগাবে।

১২. মহিলারা চলাফেরায় ঝঙ্কার বা ঝনঝনে শব্দ সৃষ্টি হয় এমন কোন অলঙ্কার পরিধান করে চলাচল করবে না অথবা অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে চলবে যেনো তার শব্দ পর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে।

১৩. মহিলারা সুগন্ধ বিস্তারকারী সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের হবে না, এ ধরনের নারীদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন।

১৪. ঘর থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে এ দোআ পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْنُزَلَّ وَاَنْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا (مسند احمد)

"আল্লাহর নামেই আমি বাইরে পা রাখলাম এবং আল্লাহর উপরই আমি ভরসা রাখি। হে আল্লাহ! আমি পদস্খলন হওয়া অথবা আমাদেরকে পদস্খলিত করা থেকে, আমরা গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়া অথবা, আমাদেরকে কেউ গোমরাহ করে দেয়া, আমরা অত্যাচার করা অথবা আমরা অত্যাচারিত হওয়া থেকে, আমরা মূর্খতাজনিত ব্যবহার করা থেকে অথবা আমাদের উপর মূর্খতাসুলভ ব্যবহার করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

১৫. বাজারে গিয়ে এ দোআ পাঠ করবে,

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ بِهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً۔

"মহান আল্লাহর নামে (বাজারে প্রবেশ করছি)। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ বাজারের অধিকতর উত্তম এবং উহাতে যা কিছু আছে উহার অধিকতর ভালো কামনা করি। আমি আপনার নিকট এ বাজারের অনিষ্ট এবং এ বাজারে যা কিছু আছে তার অনিষ্টতা বলা-থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ বাজারে মিথ্যা বলা থেকে অথবা অলাভজনক সওদা ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্থ্ হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করার সময় এ দোআ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় দশ লাখ নেকী লিপিবদ্ধ করে দেবেন, দশ লাখ গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং দশ লাখ স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন, তিনিই চিরঞ্জীব। তাঁর কোন মৃত্যু নেই, সকল প্রকার উত্তম কিছু তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।" *(তিরমিযি)*

সফরের উত্তম পদ্ধতি

১. সফরে বের হবার জন্যে এমন সময় নির্ধারণ করবে যাতে সময় কম ব্যয় হয় এবং নামাজের সময়ের প্রতিও লক্ষ্য থাকে। রাসূল (সাঃ) নিজে বা অপরকে সফরে রওয়ানা করিয়ে দিতে বৃহস্পতিবারকে বেশী উপযোগী দিন মনে করতেন।

২. একাকী সফর না করে কমপক্ষে তিনজন সাথীসহ সফর করবে, এতে পথিমধ্যে আসবাব-পত্রের পাহারা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজ-কাম স্বহস্তে সমাধা করা এবং অনেক বিপদাপদ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (সাঃ) বলেন, "একাকী সফর করা বিপজ্জনক। এ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানতো তা হলে কোন আরোহী কখনও রাত্রিবেলায় একা সফরে বের হতো না। *(বুখারী)*

এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাসূল (সাঃ)এর দরবারে হাযির হলেন। তিনি মুসাফির ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সাথে আর কে আছে?" বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথে তো আর কেউ নেই, আমি একাই এসেছি। তখন তিনি বললেন, একা ভ্রমণকারী শয়তান। দু'জন আরোহীও শয়তান। তিনজন আরোহীই আরোহী। (তিরমিযি) অর্থাৎ ভ্রমণকারী তিনজন হলে তারা প্রকৃত ভ্রমণকারী আর ভ্রমণকারী তিনজনের কম হলে তারা মূলত শয়তানের সাথী।

৩. মহিলাদের সর্বদা মুহরিম সঙ্গীর সাথে সফর করা উচিৎ। অবশ্যক সফরের রাস্তা একদিন অথবা অর্ধ দিনের হলে একা গেলে তেমন ক্ষতি নেই। কিন্তু সাবধানতা হিসেবে কখনো একা সফর করতে নেই। রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে একাকী তিনদিন তিন রাতের পথ ভ্রমণ করা বৈধ নয়।" সে এত লম্বা সফর তখনই করতে পারবে যখন তার সাথে তার পিতা-মাতা, ভাই, স্বামী অথবা আপন ছেলে অথবা অন্য কোন মুহরিম ব্যক্তি থাকবে।" (বুখারী) অন্য একস্থানে তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন, "মহিলারা একদিন এক রাতের দূরত্বের ভ্রমণে একা যেতে পারবে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৪. সফরে রওয়ানা হবার সময় যানবাহনে বসে এ দোআ করবে।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (القران) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى ومِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِك مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْحُوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ ـ (مسلم ـ ابوداؤد وترمذى)

"পবিত্র ও মহান সে আল্লাহ যিনি এটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, মূলতঃ আমরা আয়ত্ব করতে সক্ষম ছিলাম না, আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী (আল কুরআন) আল্লাহ! আমার এ সফরে তোমাকে ভয় করার তাওফীক প্রার্থনা করছি আর তুমি সন্তুষ্ট হও এমন আমলের তাওফীক প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, সহজ কর তুমি আমাদের এ সফরকে। আর ইহার দূরত্ব আমাদের জন্যে সংক্ষেপ করে দাও! তুমিই আমার এ সফরের সাথী এবং আমার পরিবারের প্রতিনিধি ও রক্ষক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট থেকে, অসহনীয় দৃশ্য থেকে, আমার পরিবারস্থ লোকদের নিকট, ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে মন্দ প্রভাব পড়া থেকে, আর অত্যাচারিতের সাক্ষাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *(মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি)*

৫. চলার পথে অন্য সাথীদের বিশ্রামের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। সাথীদেরও অধিকার আছে বিশ্রামের, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, والصاحب بالجنب "পার্শ্বের সাথীর সাথে সদ্ব্যবহার করো।" পার্শ্বের সাথী বলতে এখানে এমন সব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যারা যে কোন সময় কোন এক উপলক্ষে তোমার সাথী হয়েছিল। সফরকালীন সংক্ষিপ্ত সময়ের সাথীর (বন্ধুরও) তোমার প্রতি অধিকার আছে যে, তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তোমার কোন কথা ও কর্ম দ্বারা যেনো তার শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। রাসূল

(সাঃ) বলেন, "জাতির নেতা তাদের সেবকই হয়; যে ব্যক্তি মানব সেবায় অন্য লোকদের থেকে অগ্রগামী হয়, শহীদগণ ব্যতীত আর কোন লোক নেকীতে তার থেকে অগ্রগামী নয়।" *(মেশকাত)*

৬. সফরে রওয়ানা হবার সময় এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে শোকরানা স্বরূপ দু'রাকাআত নফল নামায পড়বে, কেননা রাসূল (সাঃ) এরূপই করতেন।

৭. রেলগাড়ী, বাস, ট্যাক্সী ইত্যাদি উপরের দিকে উঠার সময় এবং বিমান আকাশে উড্ডয়নের সময় এ দোআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ۔

"হে আল্লাহ! প্রত্যেক উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বে উপর আপনিই বড়, সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আপনারই জন্যে নির্ধারিত।"

৮. রাতে কোথায়ও অবস্থান করতে হলে যথাসম্ভব সুরক্ষিত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে, যেখানে জান ও মাল চোর ডাকাতদের থেকে রক্ষা পায় এবং কষ্টদায়ক প্রাণীদের অনিষ্টতার আশংকাও না থাকে।

৯. সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসবে, অনর্থক ঘোরাফেরা করা থেকে বিরত থাকবে।

১০. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ না দিয়ে বাড়ী প্রবেশ করবে না। আগে থেকে প্রত্যাবর্তনের তারিখ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করে রাখবে, দরকার হলে মসজিদে দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করার জন্যে অপেক্ষা করে বাড়ীর লোকদেরকে সুযোগ দেবে যেন তারা সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।

১১. সফরে কোন প্রাণী সাথে থাকলে তার আরাম ও বিশ্রামের প্রতিও খেয়াল রাখবে। কোন যানবাহন থাকলে তার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

১২. শীতকালে বিছানাপত্র সাথে রাখবে, মেজবানকে বেশী অসুবিধায় ফেলবে না।

১৩. সফরে পানির পাত্র ও জায়নামায সাথে রাখবে যেনো এস্তেঞ্জা, অজু, নামায ও পানি পানে কোন সমস্যা না হয়।

১৪. সফর সঙ্গী হলে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেবে এবং প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র, টাকা পয়সা ও জরুরী আসবাপত্র নিজ নিজ দায়িত্বে রাখবে।

১৫. সফরে কোথাও রাত হয়ে গেলে এ দোআ করবে-

يَـا اَرْضُ رَبِّـى وَرَبُّكِ اللّٰهُ اَعُـوْذُ بِـاللّٰهِ مِـنْ شَـرِّكِ وَشَـرِّ مَـا خُـلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَ اَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّـةِ وَالْعَقْـرَبِ وَمِـنْ شَـرِّ سَاكِنِى الْـبَلَدِ وَمِـنْ وَالِدٍ وَّمَـا وَلَـدَ

(ابـوداؤد)

হে যমীন। আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ! আমি আল্লাহ তাআলার নিকট তোমার ক্ষতি থেকে, তোমার মধ্যে আল্লাহ যেসব ক্ষতিকর প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সে সব প্রাণীর অনিষ্টতা থেকে এবং তোমার উপর বিচরণকারী প্রাণীসমূহের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর নিকট আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি সিংহ, কাল সাপ ও বিচ্ছু, এ শহরবাসীদের অনিষ্টতা এবং এ শহরের প্রত্যেক পিতা ও সন্তানের অনিষ্টতা থেকে। (আবু দাউদ)

১৬. সফর থেকে বাড়ী ফিরে এ দোআ পাঠ করবে।

اٰوِبًا اٰوِبًا لِرَبِّنَا تَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا (حصـن حصـين)

"প্রত্যাবর্তন! প্রত্যাবর্তন! আমাদের প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন! আমাদের প্রতিপালকের নিকট তাওবা করছি যেন তিনি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। (হিসনে হাসিন)

১৭. কোন মুসাফিরকে বিদায় দেবার সময় তার সাথে কিছু পথ চলবে এবং তার নিকট দোআর আবেদন করবে, এ দোআ পড়ে তাকে বিদায় দেবে।

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

"আমি তোমার দীন, আমানত ও কর্মের শেষ ফলাফল আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি।"

১৮. কেউ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং ভালবাসাপূর্ণ কথা বলতে বলতে আবশ্যক ও সময় সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসাফা করবে অথবা মুয়ানাকাহ্ও করবে।

দুঃখ-শোকের সময়ের নিয়ম

১. বিপদাপদকে ধৈর্য্য ও নীরবতার সাথে সহ্য করবে, সাহস হারাবে না এবং শোককে কখনও সীমা অতিক্রম করতে দেবে না। দুনিয়ার জীবনে কোন মানুষ, দুঃখ-শোক, বিপদাপদ, ব্যর্থতা ও লোকসান থেকে সবসময় উদাসীন ও নিরাপদ থাকতে পারেনা। অবশ্য মুমিন ও কাফিরের কর্মনীতিতে এ পার্থক্য রয়েছে যে, কাফির দুঃখ ও শোকের কারণে জ্ঞান ও অনুভূতি শক্তি হারিয়ে ফেলে। নৈরাশ্যের শিকার হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়ে। এমনকি অনেক সময় শোকের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে। মুমিন ব্যক্তি কোন বড় দুর্ঘটনায়ও ধৈর্য্যহারা হয়না এবং ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার উজ্জ্বল চিত্ররূপে পাথর খণ্ডের ন্যায় অটল থাকে, সে মনে করে যে, যা কিছু ঘটেছে, তা আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটেছে। আল্লাহর কোন নির্দেশই বিজ্ঞান ও যুক্তির বাইরে নয়, বরং আল্লাহ যা কিছু করেন বান্দাহর ভালর জন্যই করেন, নিশ্চয়ই এতে ভাল নিহিত আছে, এসব ধারণা করে মুমিন ব্যক্তি এমন শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করে যে, তার নিকট শোকের আঘাতেও অমৃত স্বাদ অনুভব করতে থাকে। তাক্বদীরের এ বিশ্বাস প্রত্যেক বিপদকে সহজ করে দেয়।

আল্লাহ বলেন-

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَءَ هَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ لِكَىْ لَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ ـ (الحديد ٢٢- ٢٣)

"যে সকল বিপদাপদ পৃথিবীতে আপতিত হয় এবং তোমাদের উপর যে সকল দুঃখ-কষ্ট পতিত হয়, এ সকল বিষয় সংঘটিত করার পূর্বেই এক কিতাব (লিপিবদ্ধ) থাকে। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ। যেন তোমরা তোমাদের অকৃতকার্যতার ফলে দুঃখ অনুভব না কর।"

অর্থাৎ- তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের এক উপকারিতা এই যে, মুমিন ব্যক্তি সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাকে নিজের ভাগ্যলিপির ফল মনে করে দুঃখ ও শোকে অস্থির ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে না, সে তার প্রত্যেক কাজে দয়াবান আল্লাহর দিকে দৃষ্টি স্থির করে নেয় এবং ধৈর্য্য ও শোকর করে প্রত্যেক মন্দের মধ্যেও নিজের জন্যে শুভফল বের করার চেষ্টা করে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "মুমিনের প্রত্যেক কাজই উত্তম, সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন। সে যদি দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয় তাহলে সে শান্তি ও ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করে সুতরাং এ পরীক্ষাও তার জন্যে উত্তমই প্রমাণিত হয়, তার যদি শান্তি ও স্বচ্ছলতা নসীব হয় তবে সে আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে (অর্থাৎ দান-খয়রাত করে) সুতরাং স্বচ্ছলতাও তার জন্যে উত্তম প্রতিফল বয়ে আনে।" *(মুসলিম)*

২. যখন দুঃখ-শোকের কোন সংবাদ শুনবে অথবা কোন লোকসান হয় অথবা আল্লাহ্ না করুন হঠাৎ কোন বিপদাপদে জড়িয়ে পুড়ো তখনই এ দোআ পাঠ করবে। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে আর নিশ্চিত আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে ।" *(আল-বাক্বারাহ)*

অর্থাৎ–আমাদের নিকট যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন আবার তিনিই তা নিয়ে যাবেন, আমরাও তাঁরই আবার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। সর্বাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টির ওপর সন্তুষ্ট। তাঁর প্রতিটি কাজ যুক্তি, বিজ্ঞান ও ইনসাফ সম্মত। তিনি যা কিছু করেন তা মহান ও উত্তম । প্রভুভক্ত গোলামের কাজ হলো (মনিবের কোন কাজে) তার ভ্রূ কুঞ্চিত হবেনা। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ - وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

"আর আমি কিছু ভয়ভীতি, দুর্ভিক্ষ, জান ও মালের এবং ফলাদির সামান্য ক্ষতি সাধন করে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যারা বিপদে ধৈর্য্যধারণকারী এবং তারা যখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে আর নিশ্চিয়ই আমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ঐ সকল লোকের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বড় দান এবং রহমত (করুণা) বর্ষিত হবে আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

(আল-বাক্বারা)

রাসূল (সাঃ) বলেন, "যখন কোন বান্দা বিপদে পড়ে.

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

পাঠ করে তখন আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দেন, তাকে পরিণামে মূল্যবান পুরস্কার দান করেন আর তাকে উহার (বিপদের) প্রতিদান স্বরূপ তার পসন্দনীয় বস্তু দান করেন।"

একবার রাসূল (সাঃ) এর প্রদীপ নিভে গেলে তিনি পাঠ করলেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চেরাগ নিভে যাওয়াও কি কোন বিপদ? আল্লাহর নবী বললেন, হ্যাঁ, যার দ্বারা মুমিননের কষ্ট হয় তাই বিপদ।"

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে কোন মুসলমানই মানসিক অশান্তি, শারীরিক কষ্ট, রোগ, দুঃখ-শোক এ আপতিত হয়, এমনকি তার শরীরে যদি একটি কাঁটাও বিঁধে আর সে তাতে ধৈর্য্যধারণ করে তখন আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, পরীক্ষা যত কঠিন ও বিপদ যত ভয়াবহ তার প্রতিদান তত মহান ও বিরাট। আল্লাহ যখন তাঁর কোন দাসকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে খাঁটি ও বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করার জন্যে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। সুতরাং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন, আল্লাহও তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা ঐ পরীক্ষার কারণে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

(তিরমিযি)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যখন কোন বান্দাহর সন্তানের মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দাহর সন্তানের জান কবজ করেছ? তাঁরা উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ,' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরার প্রাণ বের করেছ? তারা বলেন, হ্যাঁ, তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দাহ কি বলল? তারা বলেন, এ বিপদের সময়ও সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন" পড়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, আমার ঐ বান্দাহর জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করো। এবং ঐ ঘরের নাম রাখ বাইতুল হামদ (প্রশংসার ঘর)।" *(তিরমিযি)*

৩. কষ্ট ও দুর্ঘটনার পর শোক-দুঃখ প্রকাশ করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করবে যে, শোক ও দুঃখের চূড়ান্ত তীব্রতায় যেন মুখ থেকে কোন অযথা অনর্থক বাক্য বের হয়ে না যায় এবং ধৈর্য্য ও শোকরের পথ পরিত্যাগ না করো।

রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় সাহেবযাদা ইবরাহীম (রাঃ) মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোলে ছিলেন, রাসূল (সাঃ)-এর চোখ দিয়ে অশ্রুর ফোঁটা ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, "হে ইবরাহীম! আমি তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত! কিন্তু মুখ থেকে তাই বেরুবে যা মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি মোতাবেক হবে।" *(মুসলিম)*

৪. শোকের আধিক্যতায়ও এমন কোন কথা বলবে না যার দ্বারা অকৃতজ্ঞতা (নাশোকরী) ও অভিযোগের সুর প্রকাশ পায় এবং যা শরীয়াত বিরোধী। হট্টগোল করে কান্নাকাটি করা, জামা ছিঁড়ে ফেলা, মুখে থাপ্পড় মারা, চিৎকার করে কাঁদা, শোকে মাথা ও বুকের ছাতি পিটানো মুমিনের জন্যে কখনো জায়েয নয়। রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (শোকে) জামা ছিঁড়ে, মুখে থাপ্পড় মারে এবং জাহেলিয়াতের যুগের মানুষের ন্যায় চিৎকার ও বিলাপ করে কাঁদে সে আমার উম্মত নয়।" *(তিরমিযি)*

হযরত জাফর ত্বাইয়ার শহীদ হবার পর তাঁর শাহাদতের খবর যখন বাড়ী পৌছলো তখন তাঁর বাড়ীর মহিলারা চিৎকার ও বিলাপ করে কান্নাকাটি শুরু করল। রাসূল (সাঃ) বলে পাঠালেন যে, "বিলাপ করা

যাবে না।" তবুও তারা বিরত হলো না। অতঃপর তিনি আবারও নিষেধ করলেন, এবারও তারা মানল না। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাদের মুখে মাটি ভরে দাও। *(বুখারী)*

একবার তিনি এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন, (ঐ জানাযার সাথে) এক মহিলা আগুনের পাতিল নিয়ে আসল, তিনি ঐ মহিলাকে এমন ধমক দিলেন যে, সে ভয়ে পালিয়ে গেল। *(সীরাতুন্নবী ৬ষ্ঠ খণ্ড)*

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন যে, জানাযার পেছনে কেউ আগুন ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাবে না।

আরবদের মধ্যে এমন প্রচলন ছিল যে, জানাযার পেছনে শোক প্রকাশার্থে গায়ের চাদর ফেলে দিত, শুধু জামা থাকত। একবার তিনি সাহাবীদেরকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা অন্ধকার যুগের রীতি পালন করছ। আমার মন চায় আমি তোমাদের ব্যাপারে এমন বদদোআ করি যেন তোমাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। সাহাবীগণ একথা শুনে নিজ নিজ চাদর পরে নিলেন আর কখনো এরূপ করেন নি। *(ইবনু মাজাহ)*

৫. অসুখ হলে ভাল-মন্দ কিছু বলবে না, রোগ সম্পর্কে অভিযোগমূলক কোন কথা মুখে আনবে না বরং অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ধারণ করবে এবং এর জন্যে পরকালের পুরস্কারের আশা করবে।

রোগ ভোগ ও কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে পাপ মোচন হয়ে নিষ্পাপ হওয়া যায় এবং পরকালে মহান পুরস্কার লাভ হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেন, শারীরিক কষ্ট, রোগ অথবা অন্য কোন কারণে মুমিনের যে কষ্ট হয় আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জীবনের যাবতীয় পাপ ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেন যেমন গাছের পাতাগুলো ঋতু পরিবর্তনের সময় ঝরে যায়। *(বুখারী ,মুসলিম)*

একবার এক মহিলাকে কাঁপতে দেখে রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে সায়েবের মাতা! তুমি কাঁপছ কেন? সে উত্তরে বলল, আমার জ্বর, রাসূল (সাঃ) উপদেশ দিলেন যে, জ্বরকে মন্দ বলবেনা, জ্বর মানুষের পাপরাশিকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দেয় যেমনভাবে আগুন লোহার মরিচা দূর করে পরিষ্কার করে দেয়। *(মুসলিম)*

"হযরত আতা বিন রেহাহ (রহঃ) নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আব্বাস (রাঃ) কা'বার নিকট আমাকে বললেন, তোমাকে কি বেহেশতী মহিলা দেখাব? আমি বললাম, অবশ্যই দেখান। তিনি বললেন, কালো রং এর ঐ মহিলাটিকে দেখ। সে একবার রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর মৃগী রোগের এমন প্রভাব যে, তা যখন উঠে তখন আমার হুশ জ্ঞান থাকে না, এমন কি আমার শরীরেরও কোন ঠিক থাকে না, এমতাবস্থায় আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোআ করুন! রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি যদি ধৈর্য্য সহকারে এ কষ্ট সহ্য করতে পারো তাহলে আল্লাহ তোমাকে বেহেশত দান করবেন এবং তুমি যদি ইচ্ছা কর তা হলে আমি দোআ করে দেব যে, আল্লাহ তোমাকে রোগ মুক্ত করে দেবেন। একথা শুনে মহিলাটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধৈর্য্যের সাথে রোগ যন্ত্রণা সহ্য করে যাব তবে আপনি আল্লাহর নিকট দোআ করুন! আমি যেনো এ অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে না যাই। তখন রাসূল (সাঃ) তার জন্য দোআ করলেন। হযরত আতা বলেন, আমি ঐ লম্বা দেহী মহিলা উম্মে রাফাযকে কা'বা ঘরের সিঁড়িতে দেখেছি।"

৬. আপনজনের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করবে না। মৃত্যুতে শোকাহত হওয়া ও অশ্রু ঝরা স্বভাবগত ব্যাপার কিন্তু তার মুদ্দত তিন দিনের বেশী নয়। রাসূল (সাঃ) বলেন, কোন মুমিনের পক্ষে কারো জন্যে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা নাজায়েয, অবশ্য বিধবা (তার স্বামীর জন্যে) চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারে। এ সময়ের মধ্যে সে কোন প্রকার রঙ্গীন কাপড় পরবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং সাজ-সজ্জা এবং রূপ চর্চা করবে না *(তিরমিযি)*

হযরত যয়নাব বিনতে জাহশের ভাইয়ের মৃত্যুর চতুর্থ দিন কিছু মহিলা শোক প্রকাশের জন্য তাঁর নিকট আসল। সকলের সম্মুখে তিনি সুগন্ধি লাগিয়ে বললেন, আমার এখন সুগন্ধি লাগানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি সুগন্ধী শুধু এজন্য লাগিয়েছি আমি রাসূল (সাঃ)-কে

বলতে শুনেছি যে, "কোন মহিলাকেই স্বামী ব্যতিত অন্য কারো জন্যে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়।"

৭. দুঃখ-শোক ও বিপদাপদে একে অন্যকে ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ দেবে। রাসূল (সাঃ) যখন 'উহুদ প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন মহিলারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ জানার জন্যে উপস্থিত হলেন। হামনা বিন্‌তে জাহস যখন রাসূল (সাঃ)-এর সামনে এলেন, তখন তিনি তাকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমার ভাই আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ কর, তিনি "ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাহি রাজিউন" পড়লেন এবং তার জন্যে মাগফিরাত কামনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার মামা হামযা (রাঃ)-এর উপরও ধৈর্য্য ধারণ কর, তিনি আবার "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন এবং তার জন্যেও মাগফিরাতের দোআ করলেন।

"হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর অসুস্থ ছেলেকে অসুস্থ রেখেই তিনি নিজের জরুরী কাজে চলে গেলেন, তাঁর যাবার পর ছেলেটি মারা গেল, বেগম আবু তালহা (রাঃ) স্ত্রী লোকদের বলে রাখল, আবু তালহা (রাঃ)-কে ছেলের মৃত্যুর এ সংবাদ না জানাতে। তিনি সন্ধ্যায় নিজের কাজ থেকে ফিরে এসে বিবিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে? তিনি বললেন, আগের থেকে অনেক নীরব বা শান্ত এবং তিনি তাঁর জন্যে খানা নিয়ে আসলেন, তিনি শান্তিমত খানা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ভোরে সতী বিবি হেকমতের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা কেউ যদি কাউকে কোন বস্তু ধার দিয়ে তা আবার ফেরত চায় তা হলে তার কি ঐ বস্তু আটকিয়ে রাখার কোন অধিকার আছে? আবু তালহা (রাঃ) বললেন, আচ্ছা এ হক কিভাবে পূরণ করা যাবে? তখন ধৈর্য্যশীলা বিবি বললেন, নিজের ছেলের ব্যাপারে ধৈর্য্যধারণ কর।" *(মুসলিম)*

৮. সত্য পথে অর্থাৎ দীনের পথে আসা বিপদসমূহকে হাসি মুখে বরণ করে নেবে এবং ঐ পথে যে দুঃখ-কষ্ট আসে তাতে দুঃখিত না হয়ে ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাঁর পথে তোমার কোরবানী কবুল করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর মাতা হযরত আসমা (রাঃ) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) যুদ্ধ থেকে ফিরে তার মার রোগ সেবার জন্য আসলেন, মা তাঁকে বললেন, বৎস! মনে বড় ইচ্ছা যেন দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি দেখা পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে জীবিত রাখেন। একটি হলো তুমি বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যাবে এবং আমি তোমার শাহাদাতের সংবাদ শুনে ধৈর্য্য ধারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো অথবা তুমি গাজী হবে আমি তোমাকে বিজয়ী হিসেবে দেখে শান্তি পাবো। আল্লাহর ইচ্ছায়–হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের তাঁর মাতার জীবিতাবস্থায়ই শাহাদাত বরণ করলেন, শাহাদাতের পর হাজ্জাজ যোবায়ের (রাঃ) এর লাশ শূলিতে চড়ালে হযরত আসমা (রাঃ) যথেষ্ট বৃদ্ধা ও অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্বেও এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখার জন্যে শূলির নিকট এসে নিজের কলিজার টুকরার লাশ দেখার পর কান্নাকাটি করার পরিবর্তে হাজ্জাজকে বললেন, "এ আরোহীর কি এখনো ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামার সময় হয়নি?"

৯. দুঃখ-কষ্টে একে অন্যের সহযোগিতা করবে। বন্ধু-বান্ধবের দুঃখ-শোকে অংশ গ্রহণ করবে এবং শোক ভুলিয়ে দেবার জন্যে সাধ্যমত সাহায্য করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "সমগ্র মুসলিম জাতি একজন মানুষের শরীরের সমতুল্য, তার যদি চোখ অসুস্থ হয় তা হলে তার সারা শরীর দুঃখ অনুভব করে এবং তার যদি মাথা ব্যথা হয় তা হলে তার সারা শরীর ব্যথায় কষ্ট পায়।" *(মুসলিম)*

হযরত জাফর ত্বাইয়ার (রাঃ) শহীদ হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, "আজ জাফরের ঘরে খানা পাঠিয়ে দাও কারণ আজ তারা শোকাহত। তাদের ঘরের লোকেরা খানা পাকাতে পারবেনা।" *(আবু দাউদ)*

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি সন্তানহারা কোন মহিলাকে সান্ত্বনা প্রদান করে আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দান করবেন এবং তাকে বেহেশতের পোশাক পরিধান করাবেন।" *(তিরমিযি)*

—5

রাসূল (সাঃ) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা প্রদান করবে তিনি এমন পরিমাণ সওয়াব পাবেন যে পরিমাণ সওয়াব বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি বিপদে ধৈর্য্যধারণ করার কারণে পাবেন।" *(তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) জানাযায় অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন, যে জানাযায় অংশ গ্রহণ করে জানাযার নামায পড়ে সে এক ক্বীরাত পরিমাণ, আর যে জানাযার নামাযের পর দাফনেও অংশ গ্রহণ করল সে দু'ক্বীরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ দু'ক্বীরাত কত বড়? অর্থাৎ দু'ক্বীরাতের পরিমাণ কতটুকু? তিনি বললেন, দুটি পাহাড়ের সমতুল্য।" *(বুখারী)*

১০. বিপদ ও শোকে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং নামাজ পড়ে অত্যন্ত মিনতির সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ـ (البقرة)

"হে মুমিনগণ! (বিপদ ও পরীক্ষায়) ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহ তাআলার নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর।" *(আর-বাক্বারাহ)*

শোক অবস্থায় চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া, দুঃখিত হওয়া স্বভাবগত ব্যাপার। অবশ্য চীৎকার করে জোরে জোরে কাঁদা অনুচিত। রাসূল (সাঃ) নিজেও কাঁদতেন, তবে তাঁর কান্নায় শব্দ হতো না। ঠাণ্ডা শ্বাস নিতেন চোখ থেকে অশ্রু বের হতো এবং বক্ষঃস্থল থেকে এমন শব্দ বের হতো যেনো কোন হাঁড়ি টগ বগ করছে অথবা কোন চাক্কি ঘুরছে, তিনি নিজেই নিজের শোক ও কান্নার অবস্থা এমনভাবে প্রকাশ করেছেন।

"চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে, অন্তর দুঃখিত হয়, অথচ আমি মুখ থেকে এমন কথা প্রকাশ করি যার দ্বারা আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন।"

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (সাঃ) যখন চিন্তিত হতেন, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "সুবহানাল্লাহিল আযীম"

(মহান মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত)। আর যখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন এবং দোআয় মগ্ন হয়ে যেতেন তখন বলতেন, ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু (হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী!)। *(তিরমিযি)*

১১. সা'দ বিন আবীওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যুনুনূন[১] মাছের পেটে থাকাবস্থায় দোআ করেছিল। তা ছিল এই–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, আপনি ত্রুটিমুক্ত ও পবিত্র, আমি নিশ্চয়ই অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য ছিলাম।

সুতরাং যে কোন মুসলমান তাদের দুঃখ-কষ্টে এ দোআ দ্বারা প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দোআ কবুল করবেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) যখন দুঃখ-শোকে আপতিত হতেন তখন এ দো'আ করতেন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ (بخارى ومسلم)

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি আরশের মালিক, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি আসমান ও যমিনের প্রতিপালক, তিনি মহান আরশের মালিক। *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَلْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ـ

এ দোয়া ৯৯টি রোগের মহৌষধ। মূল কথা হচ্ছে এ দোআ পাঠকারী দুঃখ ও শোক থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেন, যে বান্দাহ দুঃখ-কষ্টে এ দোআ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার দুঃখ ও শোককে খুশী ও শান্তিতে রূপান্তরিত করে দেন।

(১) অর্থ ঃ গুনাহ বা পাপ থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমল করার সামর্থ দানকারী হচ্ছে আল্লাহ! তাঁর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তিনি ব্যতীত আর কোন আশ্রয় নেই। (অর্থাৎ তাঁর ক্রোধ থেকে একমাত্র সে ব্যক্তিই রক্ষা পেতে পারে, যে তাঁর আশ্রয় তালাশ করে)।

اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَا صِيَتِىْ بِيَدِكَ

مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَائُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ

سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ

خَلْقِكَ اَوْ اِسْتَا ثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ

الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجَلَا حُزْنِىْ وَذِهَابَ هَمِّىْ

(احمد، ابن حبان حاكم ـ حصن حصين)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাহ, তোমার বান্দাহর ছেলে, তোমার বান্দির ছেলে, আমার দেশ তোমার হাতে অর্থাৎ আমার সব কিছু তোমার ইচ্ছাধীন, আমার ব্যাপারে তোমারই নির্দেশ কার্যকর, আমার সম্পর্কে তোমারই সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত, আমি তোমার ঐ সকল নামের অসীলায় যে সকল নামে তুমি নিজে সম্বোধিত হয়েছ অথবা যে সকল নাম তুমি তোমার কিতাবে উল্লেখ করেছ অথবা যে সকল নাম তোমার মাখলুককে দীক্ষা দিয়েছ অথবা তোমার গোপন ভাণ্ডারে লুকায়িত রেখেছ তোমার নিকট আবেদন করছি তুমি কুরআন মজীদকে আমার আত্মার শান্তি, আমার চোখের জ্যোতি, আমার শোকের চিকিৎসা ও আমার চিন্তা দূরীকরণের উপকরণ করে দাও।" *(আহমদ, ইবনে হাম্বল, হাকেম)*

১২. আল্লাহ্ না করুক! কোন সময় যদি বিপদ-আপদ চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে জীবন কঠিন হয়ে ওঠে এবং শোক-দুঃখ এমন ভয়ানক রূপ ধারণ করে যে, জীবন হয়ে যাবে বিষাদময় তখনও মৃত্যু কামনা করবে না এবং কখনও নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করার লজ্জাকর চিন্তাও করবে না। কাপুরুষতা, খেয়ানতও মহাপাপ, এরূপ অস্থিরতা ও অশান্তির সময় নিয়মিত আল্লাহর দরবারে এ দোআ' করবে–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِىْ ـ (بخارى - مسلم)

"আয় আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা ভালো মনে কর ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। আর যখন মৃত্যু ভালো হয় তখন মৃত্যু দান কর।" *(বুখারী, মুসলিম)*

১৩. কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে এ দোআ করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে এ দোআ করবে সে নিশ্চয়ই ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ اللّٰهُ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ـ (ترمذى)

"সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যে যিনি তোমাকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আর অনেক সৃষ্টির উপর তোমাকে মর্যাদা দান করেছেন।"

ভয়-ভীতির সময় করণীয়

১. দীনের শত্রুদের হত্যা ও লুণ্ঠন, অত্যাচার ও বর্বরতা, ফিৎনা-ফাসাদের আতঙ্ক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা ধ্বংস লীলার ভয় ইত্যাদি সর্বাবস্থায় মুমিনের কাজ হচ্ছে মূল কারণ খুঁজে বের করা। ভাসা ভাসা প্রচেষ্টায় সময় নষ্ট না করে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত পথে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ - (شورى - ٣)

"তোমাদের উপর যে সকল বিপদাপদ আসে তা তোমাদেরই কৃত-কর্মের ফল এবং আল্লাহ তার অনেকগুলোই ক্ষমা করে দেন।" *(শূরা ৩০)*

পবিত্র কুরআনে-এর চিকিৎসাও দিয়েছেন।

وَتُوْبُوْآ إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"তোমরা সকলে একত্রিত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। হে মুমিনগণ! যেনো তোমরা কল্যাণ লাভ কর।"

তাওবা শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে আসা। পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত উম্মত যখন নিজেদের পাপরাশির উপর লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দিকে পুনঃ ইবাদতের আবেগ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং লজ্জা অশ্রু দ্বারা নিজ পাপের আবর্জনা ও জঞ্জাল ধুয়ে পরিষ্কার করে আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত কর্মের ওয়াদা পূরণের অঙ্গীকার করে, পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় তাওবাহ বলে তাকেই। এ তাওবাই ও ইস্তেগফার সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকার প্রকৃত চিকিৎসা।

২. দীনের শত্রুদের যুলুম অত্যাচারে যালেমের নিকট দয়া ভিক্ষা করার মাধ্যমে নিজের দীনী চরিত্রকে কলুষিত না করে বরং দুর্বলতার মুকাবেলায় সাহসিকতা প্রদর্শন করতে হবে।

যে কারণে ভীরুতা সৃষ্টি হয় এবং দীনের শত্রুরা তোমার উপর অত্যাচার করতে ও মুসলমানকে গ্রাস করতে সাহস পাচ্ছে। রাসূল (সাঃ) এ দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

(ক) দুনিয়ার মহব্বত এবং

(খ) মৃত্যু ভয়।

এমন সংকল্প করবে যাতে শুধু নিজের নয় এমনকি সমগ্র জাতির অন্তর থেকে এসব রোগ দূর হয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "আমার উম্মতের ওপর ঐ সময় আসন্ন যখন অন্যান্য জাতি (সহজ শিকার মনে করে) তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন পেটুক লোকেরা দস্তরখানে খাদ্য বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ সময় কি আমরা সংখ্যায় এতই নগণ্য হব যে, অন্যান্য জাতি একত্রিত হয়ে আমাদেরকে গ্রাস করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে?" তিনি বললেন, না! ঐ সময় তোমাদের সংখ্যা নগণ্য হবে না বরং তোমরা বন্যায় ভেসে যাওয়া খড়কুটার মত ওজনহীন হবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে ভীরুতা কাপুরুষতা দেখা দেবে। এ সময় জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাপুরুষতা কেন সৃষ্টি হবে? তিনি বললেন, এ কারণে যে–

★ দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

★ তোমাদের মধ্যে মৃত্যু ভয় বাড়বে এবং তোমরা মৃত্যুকে ঘৃণা করবে। *(বুখারী)*

৩. স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, নারী নেতৃত্ব এবং পাপাচার থেকে সমাজকে পবিত্র করবে এবং নিজের সমাজ বা সংগঠনকে অধিক শক্তিশালী করে সম্মিলিত শক্তি দ্বারা সমাজ থেকে ফেৎনা-ফাসাদ নির্মূল করে জাতির মধ্যে বীরত্ব, উৎসাহ-উদ্দীপনা, জীবন চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের শাসকগণ হবে (সমাজের) উত্তম লোক, তোমাদের ধনীরা হবে দানশীল ও উদার এবং তোমাদের পারস্পরিক কাজসমূহ সমাধা হবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন অবশ্যই

যমিনের এপিঠ (জীবনকাল) হবে যমিনের নিচের পিঠ থেকে উত্তম। আর যখন তোমাদের শাসকরা হবে দুর্নীতিবাজ ও দুশ্চরিত্র লোক, তোমাদের সমাজের ধনীরা হবে লোভী, কৃপণ এবং সমাজের কার্যাদি তোমাদের মহিলাদের নেতৃত্বে চলবে তখন যমিনের নিচের অংশ অর্থাৎ মৃত্যু হবে উপরের অংশের (অর্থাৎ জীবন থাকার) তুলনায় উত্তম। *(তিরমিযি)*

৪. অবস্থা যতই নাজুক হোকনা কেন অর্থাৎ পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক ঐ প্রতিকূল পরিবেশেও সত্যের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূরে থাকবে না। সত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন দান করা নির্লজ্জের জীবন থেকে অনেক উত্তম। কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষায় এবং কঠোর থেকে কঠোরতম অবস্থায়ও সত্য থেকে পিছু হটবে না। কেউ মৃত্যুর ভয় দেখালে তাকে মুচকি হাসি দ্বারা উত্তর প্রদান করবে। শাহাদাতের সুযোগ আসলে আগ্রহ ও আকাংখার সাথে তাকে গ্রহণ করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "চাকা ঘূর্ণায়মান। সুতরাং যে দিকে কুরআনের গতি হবে তোমরাও সে দিকে ঘুরবে। সাবধান! অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুরআন ও বাতিল আলাদা হয়ে যাবে। (সাবধান!) তোমরা কুরআন ছাড়বে না। ভবিষ্যতে এমন শাসক আসবে যারা তোমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হবে। তোমরা তাদের আনুগত্য স্বীকার করলে তোমাদেরকে সত্য পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। আর যদি তোমরা তাদের বিরোধিতা করো তা হলে তারা তোমাদেরকে মৃত্যুর মতো কঠিন শাস্তি প্রদান করবে, এমনকি তা মৃত্যু দণ্ডও হতে পারে। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তখন আমরা কি করব? তিনি বললেন, তোমরা তা-ই করবে যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথীরা করেছেন। তাদেরকে করাত দ্বারা ফাড়া হয়েছে এবং শূলীতে চড়ানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে জীবিত থাকার চেয়ে আল্লাহর পথে জীবন দান করা উত্তম।"

৫. যে সমস্ত কারণে সমাজে ভয়-ভীতি বৃদ্ধি পায়, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, হত্যা ছড়িয়ে পড়ে, শত্রুদের যুলুম অত্যাচারে জাতি দিশেহারা হয়ে পড়ে ঐ সব সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে জাতির মধ্যে খেয়ানত কারীর বিস্তার লাভ ঘটে আল্লাহ সে জাতির অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দেন, যে সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়, যে সমাজে বিশ্বাসঘাতকতার রীতি প্রচলিত হবে, তারা অবশ্যই অভাব অনটনের শিকার হবে।

যে সমাজে অবিচার চালু হবে সে সমাজে হত্যা, খুন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হবে। যে জাতি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সে জাতির উপর শত্রুর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। *(মিশকাত)*

৬. শত্রু পক্ষ থেকে ভয় অনুভব হলে এ দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

(ابوداؤد- نسائى)

"হে আল্লাহ! আমরা ঐ শত্রুদের মোকাবেলায় তোমাকেই ঢাল

হিসেবে পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টতা ও দুষ্টামী থেকে মুক্তির জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *(আবু দাউদ, নাসায়ী)*

৭. শত্রু বেষ্টিত স্থানে আবদ্ধ হয়ে গেলে এ দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا - (احمد)

"আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করো এবং আমাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখো।"

৮. যখন ঘূর্ণিঝড় অথবা মেঘ বাদল উঠতে দেখা যায় তখন অস্থিরতা ও ভয় অনুভব করবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল (সাঃ)-কে মুখ খুলে হা-হা করে হাসতে দেখিনি। তিনি শুধু হাসতেন আর কখনো ঘূর্ণিঝড় বা মেঘ-বাদল আসতে দেখলে তিনি ঘাবড়িয়ে যেতেন এবং দোআ করতে শুরু করতেন। ভয়ের কারণে কখনো উঠতেন কখনো বসতেন, বৃষ্টি বর্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি লোকদেরকে দেখছি যে, তারা মেঘ-বাদল দেখলে

খুশী হয় যে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অথচ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি যে, মেঘ-বাদল দেখলে আপনার চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আপনি অস্থির হয়ে পড়েন। এর উত্তরে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

হে আয়েশা! আমি কি করে নির্ভয় হয়ে যাব যে, এ মেঘের মধ্যে শাস্তি নিহিত নেই যে মেঘ দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল সে মেঘ দেখেও তারা বলেছিল, এ মেঘ আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।

(বুখারী ;মুসলিম)

আর এ দোআ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحَ رَحْمَةٍ وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا (طبرانى)

"হে আল্লাহ! বাতাসকে শান্তির বাতাস করে দাও, অশান্তির বাতাস নয়। আয় আল্লাহ! একে রহমত হিসেবে নাযিল কর কিন্তু আযাব হিসেবে নয়।

ঘূর্ণিঝড়ের সাথে যদি ঘোর আঁধারও ছেয়ে যায় তা হলে "কুলআউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব" ও "কুলআউযু বিরাব্বিন্নাস ও পাঠ করবে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ঘূর্ণিঝড় উঠেছে দেখতে পেলে এ দোআ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ـ

(مسلم ترمذى)

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ ঘূর্ণঝড়ের ভালো দিকএর মধ্যে যা আছে তাই এবং যে উদ্দেশ্যে একে প্রেরণ করা হয়েছে তার ভালো দিক কামনা করছি। এ ঘূর্ণিঝড়ের খারাপ দিক, যা আছে তা এবং একে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তার খারাপ দিক হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি। *(মুসলিম ,তিরমিযি)*

৯. অত্যধিক বৃষ্টির কারণে ক্ষতির ভয় দেখা দিলে এ দোআ করবে।

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ـ (بخارى)

"আয় আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক, কিন্তু আমাদের উপর নয়। আয় আল্লাহ! পাহাড়ের উপর টিলা এবং উচ্চ ভূমির উপর, মাঠে ময়দানে এবং ক্ষেত-খামার ও তরুলতা জন্মানোর স্থানে বর্ষিত হোক।

(বুখারী, মুসলিম)

১০. যখন মেঘের গর্জনও বজ্রপাতের শব্দ শুনবে তখন কথাবার্তা বন্ধ করে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করবে—

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ـ (الرعد ١٣)

"আর মেঘের গর্জনও আল্লাহর প্রশংসাসূচক তাসবীহ পাঠ করে, ফিরিশতাগণ আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে তাঁর তাসবিহ্ পাঠ করে।

(সূরায়ে রা'দ ১৩)

হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের মেঘের গর্জন শুনে কথাবার্তা বন্ধ করে আয়াত পাঠ করতেন। *(আল-আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত কা'ব বলেন, যে ব্যক্তি মেঘের গর্জনের সময় তিনবার এ আয়াত পাঠ করবে সে গর্জনের দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদে থাকবে।

(তিরমিযী)

রাসূল (সাঃ) যখন মেঘ গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনতেন তখন এ দোআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ ـ (الادب المفرد)

"আয় আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার গযব দ্বারা ধ্বংস করোনা। আমাদেরকে তোমার আযাব দ্বারা এবং এ ধরনের শাস্তি আসার পূর্বে নিরাপত্তা দান কর। *(আল-আদাবুল মুফরাদ)*

১১. যখন কোথাও আগুন লেগে যায় তখন নিভাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং মুখে "আল্লাহু আকবার" বলতে থাকবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "যখন আগুন লাগতে দেখবে তখন (উচ্চৈঃস্বরে) "আল্লাহু আকবার" বলবে, তাহলে তাকবীর আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"

১২. ভয়-ভীতির আশংকা বেশী হলে এ দোআ পাঠ করবে, আল্লাহর ইচ্ছায় ভীতি দূর হবে এবং শান্তি ও সন্তোষ লাভ হবে। হযরত বারা-বিন আযেব বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলো আমার উপর ভয়-ভীতির প্রভাব লেগেই থাকে। তিনি বললেন, "এ দোআ পাঠ করবে।" সে এ দোআ পাঠ করতে লাগলো, আল্লাহ তাআলা তার মন থেকে ভয়-ভীতি দূর করে দিলেন। *(তিবরানী)*

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جُلِّلَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ۝

"আমি সে মহান আল্লাহর গুণগান প্রকাশ করছি। যিনি সকল পবিত্রতার মালিক এবং ফিরিশতাগণের ও জিব্রাঈল (আঃ)-এর প্রতিপালক! সমগ্র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে তোমারই ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বিরাজমান।

খুশীর সময় করণীয়

১. যখন খুশী বা আনন্দ প্রকাশের সুযোগ আসে তখন আনন্দ প্রকাশ করবে। খুশী মানুষের জন্য একটি স্বাভাবিক দাবী ও প্রাকৃতিক নিয়ম। দীন মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা ও গুরুত্ব অনুভব করে এবং কতিপয় সীমারেখা ও শর্তসাপেক্ষে ঐ প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে উৎসাহ প্রদান করে। দীন কখনো এটা চায়না যে তুমি কপট গাম্ভীর্য, অবাঞ্ছিত মর্যাদা, সর্বদা মনমরা ভাব ও নির্জীবতা দ্বারা তোমার কর্মকুশলতা ও যোগ্যতাকে নিস্তেজ করে দেবে। সে (দীন) তোমাকে খুশী ও আনন্দ প্রকাশের পূর্ণ অধিকার প্রদান করে এও দাবী করে যে, তুমি সর্বদা উচ্চ আকাংখা, সজীব উদ্যম ও নব উদ্দীপনায় সজীব থাকো।

জায়েয স্থানসমূহে খুশী প্রকাশ না করা এবং খুশী বা আনন্দ উদযাপনকে দীনী মর্যাদার পরিপন্থী মনে করা দীনের প্রকৃত জ্ঞান নেই এমন লোকের পক্ষেই সম্ভব। তোমার কোন দীনী কর্তব্য পালনের সৌভাগ্য লাভ হলো, তুমি, অথবা তোমার কোন বন্ধু যোগ্যতার দ্বারা উচ্চাসন লাভ করলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধন-দৌলত অথবা অন্য কোন নেয়ামত দান করলেন, তুমি কোন দীনী সফর শেষে বাড়ীতে ফিরলে, তোমার বাড়ীতে কোন সম্মানিত মেহমানের আগমন ঘটল, তোমার বাড়ীতে বিয়ে-শাদী অথবা শিশু জন্মগ্রহণ করল এবং কোন প্রিয়জনের সুস্থ অথবা মঙ্গলের সুসংবাদ আসলো অথবা কোন মুসলিম সেনা বাহিনীর বিজয় সংবাদ শুনলে বা যে কোন ধরনের উৎসব হলে এ জাতীয় সকল স্থলে আনন্দ উদযাপন ও উৎসব পালন অবশ্যই তোমার জন্মগত অধিকার। ইসলাম শুধু আনন্দ উদযাপনের অনুমতিই দেয় না বরং দীনী দাবীর অংশ হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়।

হযরত কাআ'ব বিন মালেকের বর্ণনা ঃ আল্লাহ তাআলা আমার তওবাহ কবুল করেছেন এই সুসংবাদ জানতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি গিয়ে সালাম দিলাম ঐ সময় রাসূল (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল ঝকঝক করছিল। প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সাঃ) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল এমন ঝিকিমিকি করতো যেনো

চাঁদের একটি টুকরো। তাঁর মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল প্রভা দেখেই আমরা বুঝতে পারতাম যে, তিনি খুশী অবস্থায় আছেন। *(রিয়াদুস সালেহীন)*

২. উৎসব উপলক্ষে মন খুলে আনন্দ করবে এবং নিজকে কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দ উদযাপনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবে। অবশ্য তা যেন সীমার মধ্যে থাকে।

রাসূল (সাঃ) যখন (হিজরত করে) মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন বললেন ঃ তোমরা বছরে যে দু'দিন আনন্দ উদযাপন করতে, এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম দু'দিন দান করেছেন অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। সুতরাং বছরের এ দু' ইসলামী উৎসবে আনন্দ খুশীর পরিপূর্ণ প্রদর্শনী করবে এবং মিলেমিশে খোলামনে স্বাভাবিক নিয়মে কিছু চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করবে। এ কারণে উৎসবের এ দু'দিন রোজা রাখা হারাম। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

এ দিন উত্তম পানাহার, পরস্পর আনন্দ উৎসবের স্বাদ গ্রহণ ও আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে।" (শরহে মা আনিউল আসার)

ঈদের দিন গুরুত্বের সাথে পরিচ্ছন্নতা এবং নাওয়া-ধোয়ার ব্যবস্থা করবে। ক্ষমতানুযায়ী সর্বোত্তম কাপড় পরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে, খাদ্য খাবে এবং শিশুদেরকে জায়েয পন্থায় আনন্দফূর্তি ও খেলাধুলা করে চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের সুযোগ দেবে। যেনো তারা খোলা মনে আনন্দ উদযাপন করতে পারে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ঈদের দিন আনসারী মেয়েরা (আমার ঘরে) বসে আনসাররা 'বুআস'[১] যুদ্ধের সময় যে গান গেয়েছিল সে গান গাচ্ছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে বললো, "নবীর ঘরে এ গান-বাদ্য!" রাসূল (সাঃ) বললেন, "আবু বকর! তাদের কিছু বলো না, প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের একটি দিন থাকে—আজ আমাদের ঈদের দিন।"

(১) অন্ধকার যুগে আনসারদের আওস ও খাযরাজ দু'গোত্রের মধ্যে" যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল ঐ যুদ্ধকে বুআস যুদ্ধ বলে।

একবার ঈদের দিন কিছু হাবশী (কাফ্রী) বাজিকর যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখাচ্ছিল। রাসূল (সাঃ) নিজেও দেখছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-কেও নিজের আড়ালে রেখে দেখাচ্ছিলেন, তিনি বাজিকরদেরকে ধন্যবাদও দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা যখন দেখতে দেখতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন তখন তিনি বললেন, আচ্ছা এখন যাও। *(বুখারী)*

৩. আনন্দ উদযাপনে ইসলামী রুচি, ইসলামী নির্দেশ ও রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যখন আনন্দ উপভোগ করবে তখন প্রকৃত আনন্দদাতা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে। তাঁর দরবারে সেজদায় শোকর আদায় করবে। আনন্দের উত্তেজনায় ইসলাম বিরোধী কোন কার্য বা রীতিনীতি ও আকীদা বিরোধী কোন কার্যকলাপ করবে না। আনন্দ প্রকাশ অবশ্যই করবে কিন্তু কখনও সীমালংঘন করবে না। আনন্দ প্রকাশে এত বাড়াবাড়ি করবে না যাতে গৌরব অহংকার প্রকাশ পায়। আর আবেদন-নিবেদন, বন্দেগীতেও ও বিনয়ের অনুভূতি লোপ পায়।

পবিত্র কুরআনে আছে–

وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে তোমরা অহংকার করবে না, কেননা আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না। *(সূরায়ে আল-হাদীদ, আয়াত–২৩)*

আনন্দে এমন বিভোর হয়ে যাবে না যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাবে, মুমিনের আনন্দ প্রকাশের ধারা এই যে, মূল আনন্দদাতা আল্লাহকে আরো বেশী বেশী স্মরণ করা। তাঁর দরবারে সেজদায় শোকর, এবং নিজের কথা ও কাজে আল্লাহর দান, মাহাত্ম্য ও মহিমা প্রকাশ করা।

রমযানের পূর্ণ মাস রোযা পালন করে এবং রাত্রিকালে কুরআন তেলাওয়াত ও তারাবীহের সুযোগ পেয়ে যখন ঈদের চাঁদ দেখ তখন আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠ। কারণ, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আল্লাহর অনুগ্রহে পালন করতে সফলকাম হয়েছ। তাই

তুমি তাড়াতাড়ি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আল্লাহ তোমাকে যে ধন-দৌলত দান করেছেন তার একটা অংশ (ছাদক্বাতুল ফিতর) তোমার গরীব মিসকীন ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেবে যেনো তোমার বন্দেগীতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় এবং আল্লাহর গরীব বান্দাগণও যেনো এ অর্থ পেয়ে ঈদের আনন্দে শরীক হয়ে সবাই ঈদের আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং তুমি এসব নেয়ামত লাভের শোকরিয়া স্বরূপ ঈদের মাঠে গিয়ে জামায়াতের সাথে দু'রাকাআত নামায আদায় করে সঠিক আনন্দ প্রকাশ কর। আর ইহাই হলো সালাতুল ঈদ। অনুরূপভাবে ঈদুল আযহার দিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর মহান ও অনুপম কোরবানীর স্মৃতি স্মারক উদযাপন করে কোরবানীর উদ্দীপনায় নিজের অন্তরাত্মাকে মাতোয়ারা করে শুকরিয়ার সেজদা আদায় কর। ইহাই হল সালাতুল ঈদুল আযহা।

অতঃপর প্রতিটি জনবসতির অলিগলি, রাস্তা-ঘাট তাকবীর তাহলীল ও আল্লাহর মহানত্বের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। আবার যখন শরীয়তানুযায়ী ঈদের দিনগুলোতে ভালো খাদ্য আহার কর, ভালো কাপড় পরিধান এবং আনন্দ প্রকাশের জন্যে জায়েয পন্থা গুলোকে অবলম্বন কর, তখন তোমার প্রতিটি কর্মকাণ্ড তোমার ইবাদতে পরিগণিত হয়।

৪. নিজের আনন্দে অন্যকে শরীক করবে অনুরূপভাবে অন্যের আনন্দে নিজে এবং আনন্দ প্রকাশের সুযোগ লাভে ধন্যবাদ দেয়ারও চেষ্টা করবে।

কা'আব বিন মালেক (রাঃ)এর তাওবা কবুল হওয়ার সংবাদ সাহাবায়ে কেরাম জানতে পেরে তাঁরা দলে দলে এসে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। এমনকি হযরত তালহা (রাঃ) এর কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ প্রকাশে হযরত কা'আব এতই আবেগাপ্লুত হন যে, জীবনভর তাঁর নিকট স্মরণীয় হয়েছিল। হযরত কাআ'ব বৃদ্ধাবস্থায় যখন নিজের পরীক্ষা ও তাওবা কবুলের ঘটনা নিজ ছেলে আবদুল্লাহকে বিস্তারিত বল্লেন তখন বিশেষ করে হযরত তালহা (রাঃ)-এর আনন্দ প্রকাশের কথা আলোচনা করলেন এবং বললেন, আমি

(হযরত) তালহা (রাঃ)-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আনন্দ প্রকাশের আকর্ষণকে কখনও ভুলতে পারব না। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) যখন হযরত কাআ'ব (রাঃ)-কে তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিলেন তখন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "কাআ'ব! এটা তোমার জীবনের সব চাইতে বেশী খুশীর দিন। (রিয়াদুস সালেহীন)

কারো বিয়ের অনুষ্ঠানে অথবা কারো সন্তানের জন্ম দিনে অথবা অনুরূপ অন্য কোন আনন্দ উৎসবে যোগদান করবে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) যখন কারো বিয়েতে যেতেন তাকে মোবারকবাদ দিতেন ও এরূপ বলতেন–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ -

(ترمذى)

"আল্লাহ তোমাকে বরকতময় রাখুন! তোমাদের উভয়ের উপর বরকত নাযিল করুন! এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালো ও সুন্দর জীবন-যাপনের তাওফীক দিন।"

একবার হযরত হোসাইন (রাঃ) একজনের সন্তানের জন্মে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, "এভাবে বলবে যে, আল্লাহ! তোমাকে এ দ্বারা খায়ের ও বরকত দান করুন! তাঁর শুকরিয়া আদায় করার তওফীক দিন, সন্তানকে যৌবনের সখ ও সৌন্দর্য দেখার সুযোগ দিন। আর তাকে তোমার অনুগত করে দিন।"

৫. কারো কোন প্রিয়জন অথবা হিতকারী ব্যক্তি দীর্ঘ সফর শেষে যখন ফিরে আসে তখন তাকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং তার সুস্থ শরীরে বাড়ী ফিরে আসা ও সফলকাম হওয়ার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করবে। সে যদি শান্তিতে দেশে ফিরে আসার শুকরিয়া স্বরূপ কোন উৎসবের ব্যবস্থা করে থাকে তা হলে তাতে যোগদান করবে। তুমি যদি বিদেশ থেকে শান্তি ও সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে আসার শুকরিয়া স্বরূপ কোন আনন্দ উদযাপনের ব্যবস্থা কর তাহলে এ আনন্দ উৎসবেও অন্যদেরকে শরীক রাখবে। তবে

অনর্থক অতিরিক্ত খরচ ও লোক দেখানো কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে আর নিজের শক্তির বাইরে খরচ করবে না।

রাসূল (সাঃ) যখন বিজয়ী বেশে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন তখন সাহাবায়ে কেরাম ও শিশু-কিশোররা অভ্যর্থনার জন্য সানিয়াতুল বেদা (বিদায়ী ঘাঁটি) পর্যন্ত আসে। *(আবু দাউদ)*

রাসূল (সাঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরত শেষে মদীনায় পৌছে দক্ষিণ দিক থেকে শহরে প্রবেশ করতে লাগলেন তখন মুসলমান পুরুষ-মহিলা, সন্তান-সন্ততি সবাই অভ্যর্থনা জানাবার জন্য শহর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন এবং তখন আনসারদের ছোট ছোট মেয়েরা মনের আনন্দে গান গাচ্ছিল–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

"(আজ) আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলো, (দক্ষিণ দিকের) সানিয়াতুল বিদা[১] থেকে, আমাদের উপর শোকর ওয়াজিব, আহ্বানকারী আল্লাহর পথে যে আহ্বান করেছেন তার জন্যে হাজার শোকরিয়া।

হে, আমাদের মধ্যে প্রেরিত ব্যক্তি! আপনি এমনি দীন এনেছেন আমরা যার অনুসরণ করব।"

"একদা রাসূল (সাঃ) সফর থেকে মদীনায় পৌছে উট যবেহ করে লোকদের দাওয়াত করেন।" (আবু দাউদ)

৬. বিয়ে শাদী উপলক্ষেও আনন্দ করবে। এ আনন্দে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকেও শরীক করবে। এ উপলক্ষে রাসূল (সাঃ) কিছু ভালো গান পরিবেশন করতে ও দফ নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও অনুমতি দিয়েছেন। এর কারণ আনন্দের মত্ততা প্রশমিত করা এবং বিবাহের সাধারণ প্রচার ও এর প্রসিদ্ধিও উদ্দেশ্য।

---

(১) ** সানিয়াতুলবিদারী অর্থ বিদায়ী টিলা। মদিনার দক্ষিণে একটি টিলা ছিল। মদিনাবাসীগণ তাদের মেহমানদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতো। সুতরাং পরবর্তীকালে এ টিলাটির নাম "সানিয়াতুল বিদা" বা বিদায় টিলা নামকরণ হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের এক আত্মীয় মহিলার সাথে জনৈক আনসারী পুরুষের বিবাহ দিলেন। তাকে যখন বিদায় দেয়া হল তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, লোকেরা তার সাথে কেন একটি দাসী পাঠালোনা, যে দফ বাজাত। (বুখারী)

হযরত রবী' বিন্‌তে মাসউদ (রাঃ)-এর বিয়ে হলো। এজন্য কিছু মেয়ে তাঁর নিকট বসে দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদের প্রশংসা সূচক কবিতা দিয়ে গান গাচ্ছিল, একটি মেয়ে কবিতার এক পংক্তি পাঠ করলো ঃ (যার অর্থ হলো)।

আমাদের মধ্যে এমন এক নবী আছেন যিনি আগামী দিনের কথা জানেন।

রাসূল (সাঃ) শুনে বললেন ঃ এটা বাদ রাখ, আগে যা গাচ্ছিলে তাই গাইতে থাক।

৭. বিয়ে-শাদীর খুশীতে নিজের সাধ্য ও ক্ষমতানুযায়ী নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে কিছু পানাহার করানোর ব্যবস্থা রাখবে। রাসূল (সাঃ) নিজের বিয়েতেও ওলীমার দাওয়াত করেছেন এবং অন্যকেও এরূপ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

"আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি বক্‌রী যবেহ করে হলেও খাইয়ে দাও।" *(বুখারী)*

বিয়েতে যাওয়ার সুযোগ না হলে অন্ততঃপক্ষে ধন্যবাদ বাণী পাঠিয়ে দেবে। বিয়ে-শাদী বা এ জাতীয় আনন্দ প্রকাশের অনুষ্ঠানসমূহে উপহার সামগ্রী উপঢৌকন দিলে পারস্পরিক সম্পর্কে সজীবতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় এবং বন্ধুত্বও বৃদ্ধি পায়। হ্যাঁ এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে, উপহার যেনো নিজের ক্ষমতানুযায়ী দেয়া হয়, লোক দেখানো ও প্রদর্শনীসুলভ না হয় আর তাতে নিজের অকপটতার হিসাব নিকাশ অবশ্যই করবে।

নামেও মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায় এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও নামের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নাদুস-নুদুস সুশ্রী শিশুদেরকে সবাই আদর করতে চায়। কিন্তু যখন তার নাম জিজ্ঞেস করা হয় এবং যে কোন অর্থহীন এবং বিশ্রী নাম বলে তখন মনটা দমে যায়। এ সময় মন চায় যে, আহা! তার নামও যদি তার চেহারার মতো হতো। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সুন্দর নাম অনুভূতি এবং আবেগের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে কোন মহিলাকে যদি বিশ্রী এবং খারাপ নামে ডাকা হয় তাহলে তার ক্রোধমূলক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। খারাপ নামে সম্বোধন করায় তার খারাপ আবেগই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে যদি কোন মহিলাকে সুন্দর নামে ডাকা হয়, তাহলে সে মহিলা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ভালোভাবে জবাবও দিয়ে থাকে কারণ নিজের ভালো নাম শুনে সে নিজেকে মর্যাদাবান বলে মনে করে।

১. লোকজন সন্তানকে ভালো নামে ডাকুক, এটাই মাতা-পিতার স্বাভাবিক আকাংখা। ভালো নামে ডাকার ফলে একদিকে যেমন শিশু খুশী হয়। অন্যদিকে যিনি ডাকেন তার অন্তরেও তার জন্য ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটা নিজের সন্তানের ভালো নাম রাখার উপর। আপনার উপর আপনার প্রিয় সন্তানের অধিকার হলো আপনি তার সুন্দর রুচিসম্মত ও পবিত্র নাম রাখবেন।

রাসূল (সাঃ) সন্তানের ভালো এবং পবিত্র নাম রাখার তাগিদ দিয়েছেন। সাহাবীরা (রাঃ) যখনই রাসূল (সাঃ)-এর নিকট নিজের সন্তানের নাম রাখার জন্য আবেদন জানাতেন তখনই তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও উদ্দেশ্যপূর্ণ নাম প্রস্তাব করতেন। কারো নিকট তার নাম জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি অর্থহীন এবং অপছন্দনীয় নাম বলতো তাহলে রাসূল (সাঃ) অপছন্দ করতেন এবং তাকে নিজের কোন কাজ করতে বলতেন না। পক্ষান্তরে সুন্দর ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করলে তিনি পছন্দ করতেন। তার জন্য দোয়া করতেন এবং নিজের কাজ করতে দিতেন। প্রিয় নবী (সাঃ) নিজের কোন প্রয়োজনে বাইরে বেরুলে তিনি 'ওয়া নাজিহ' অথবা

ইয়ারাশেদ এর মত বাক্য শুনতে পছন্দ করতেন। যখন কাউকে কোন স্থানের দায়িত্বশীল বানিয়ে প্রেরণ করতেন তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সে তার নাম বলার পর, তাঁর পছন্দ হলে খুব খুশী হতেন এবং খুশীর আলামত তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হতো। যদি তার নাম তিনি অপছন্দ করতেন তাহলে তার প্রভাব চেহারায় ফুটে উঠতো। যখন তিনি কোন বস্তিতে প্রবেশ করতেন তখন সে বস্তির নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি সে বস্তির নাম তাঁর পছন্দ হতো তাহলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। অধিকাংশ সময় এটাও হতো যে তিনি অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে দিতেন। খারাপ নাম তিনি কোন বস্তুর জন্যই মেনে নিতে পারতেন না। একটি স্থানের নাম হুজরাহ অর্থাৎ বাঁজা বা বন্ধ্যা বলে ডাকতো। তিনি সে স্থানের নাম পরিবর্তন করে খুজরাই অর্থাৎ চির-সবুজ ও শস্য-শ্যামল রেখে দিলেন। একটি ঘাঁটিকে গুমরাহির ঘাঁটি বলা হতো। তিনি তার নাম রাখলেন হেদায়াতের ঘাঁটি। এমনিভাবে তিনি অনেক পুরুষ এবং মহিলার নামও পরিবর্তন করে দেন। যে ব্যক্তি তাঁর পরিবর্তিত নামের পরিবর্তে পূর্বের নাম সম্পর্কেই পীড়াপীড়ি করতো তাহলে সে তার পূর্বের নামের খারাপ প্রভাব নিজের ব্যক্তিত্বের উপরও অনুভব করতো এবং বংশধরদের উপর তার খারাপ প্রভাব অবশিষ্ট থাকতো।

২. তোমার শিশুর জন্য পছন্দনীয় নাম বলতে সেসব নাম বুঝায় যাতে কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া এবং কিছু বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক ঃ আল্লাহর জাত অথবা ছিফতি নামের সাথে আবদ অথবা আমাতাহু শব্দ মিলিয়ে কিছু বানানো হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আবদুল গাফ্ফার, আমাতাহুল্লাহ, আমাতাহুর রহমান ইত্যাদি। অথবা এমন নাম হবে যা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসার প্রকাশ ঘটে।

দুই ঃ কোন পয়গাম্বরের নামানুসারে নাম রাখা। যেমন ঃ ইয়াকুব, ইউসুফ, ইদরিস, আহমদ, ইবরাহিম, ইসমাইল প্রভৃতি।

তিন ঃ কোন মুজাহিদ, ওলি এবং দীনের খাদেমের নামানুসারে নাম রাখা, যেমন ঃ ফারুক, খালিদ, আবদুল কাদের, হাজেরা, মরিয়ম, উম্মে সালমাহ, সুমাইয়াহ প্রভৃতি।

চার ঃ নাম যেন দীনি আবেগ ও সুন্দর আকাংখার প্রতিবিম্ব হয়। উদাহরণ স্বরূপ মিল্লাতের বর্তমান দুরবস্থা দেখে তুমি তোমার শিশুর নাম ওমর এবং সালাহউদ্দিন প্রভৃতি রাখতে পার এবং এ ইচ্ছা পোষণ করতে পার যে, তোমার শিশু বড় হয়ে মিল্লাতের ডুবন্ত তরীকে তীরে ভেড়াবে এবং দীনকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

পাঁচ ঃ কোন দীনী সফলতা সামনে রেখে নাম প্রস্তাব করা। যেমন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে এ আয়াত সামনে এলো ঃ

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ

"যখন সেদিন আসবে, যেদিন তুমি কারো সাথে কথা বলার শক্তি পাবে না। তবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কথা বলতে পারবে। অতঃপর সেদিন কিছু মানুষ হতভাগা হবে এবং কিছু মানুষ ভাগ্যবান হবে।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতি দু'ভাবে বিভক্ত হবে। এক গ্রুপ হবে হতভাগা এবং অপর গ্রুপ হবে সৌভাগ্যবান।

এ আয়াত পড়ে অযাচিতভাবে তোমার অন্তর থেকে দোয়া হলো যে, হে পরওয়ারদিগার আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে সে ভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন এবং তুমি সন্তানের সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর তার নাম রাখ সাঈদ।

প্রকৃতপক্ষে তুমি তোমার ইচ্ছা, আবেগ, আশা ও আকাংখা অনুযায়ী সচেতন অথবা অচেতনভাবে নাম প্রস্তাব করে থাক এবং এসব আশা-আকাংখার ভিত্তিতেই শিশু বড় হতে থাকে এবং প্রকৃতিগতভাবে সাধারণ অবস্থায় সে তোমার স্বপ্নের বাস্তবায়নই করে থাকে।

এসব বিষয়ে নাম প্রস্তাব করার সময় সামনে রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আবার কিছু বিষয় এমন আছে যা নাম প্রস্তাব করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

এক ঃ এমন চিন্তা ও অনুভূতি যা ইসলামী আকীদা এবং আদর্শের পরিপন্থী। বিশেষভাবে যে নামে তাওহীদি ধ্যান-ধারণায় আঘাত লাগে। যেমন নবী বখশ, আবদুর রাসূল ইত্যাদি।

দুই ঃ কোন এমন শব্দ যা দিয়ে গর্ব অহংকার অথবা নিজের পবিত্রতা ও বড়াই প্রকাশ পায়।

তিন ঃ এমন নাম যা অনৈসলামিক আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটায় এবং আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির কোন আশা থাকে না।

উত্তম নাম রাখার হেদায়াত ও হিকমত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَاءِ كُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ

"রাসূল (সাঃ) ফরমান, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব উত্তম নাম রাখো।" *(আবু দাউদ)*

আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম–

عَنْ اَبِىْ وَهَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ

"হযরত আবু ওয়াহাব রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবীদের নামে নাম রাখো এবং আল্লাহর পছন্দীয় নাম হলো আবদুল্লাহ এবং

আবদুর রহমান প্রিয় নাম হলো হারেছ এবং হাম্মাম তাছাড়া অত্যন্ত অপছন্দীয় নাম হারব ও মুররাহ।" *(আবু দাউদ নাসায়ী)*

'আল্লাহ' শব্দ আল্লাহর জাতি নাম। রহমান আল্লাহর জাতি নাম নয়। তবে ইসলামের পূর্বে কতিপয় জাতির মধ্যে এটা আল্লাহর জাতি নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ জন্যে তারও অন্যান্য গুণের বা ছিফাতের তুলনায় গুরুত্ব রয়েছে। হাদীসে শুধু এ দু' নামের উল্লেখের উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু এ দু'নামই রাখা যাবে এবং শুধু এটাই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। শুধুমাত্র এটাকে উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর কোন সিফাতের সাথে আবদ শব্দ লাগিয়ে নাম রাখা হলে তাই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম। সম্ভবত রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র এ দু' নামের উল্লেখ এ জন্যেও করে থাকতে পারেন যে, পবিত্র কুরআনে আবদের সম্বন্ধের সাথে বিশেষভাবে এ দু'নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

হারিছ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কৃষি এবং আয়ের কাজে লেগে থাকে। যদি সে হালাল উপায়ে দুনিয়া কামাই করে তাহলেও উত্তম আর যদি সে পরকাল কামাইয়ে লেগে থাকে তাহলে তার থেকে উত্তম আর কি হতে পারে!

হাম্মাম বলা হয়–সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তিকে, যে এক কাজ শেষে অন্য কাজে লেগে যায়।

হারব–যুদ্ধকে বলা হয়, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যুদ্ধ কোন পছন্দীয় কাজ নয়।

মুররাহ ঃ তিতো জিনিসকে বলা হয়, আর তিতো নিশ্চয়ই সবার পছন্দীয় নয়।

হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) এক উটনী দোহানোর জন্য লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

مَنْ يَحْلِبُ هٰذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اِسْمُكَ ؟ قَالَ مُرَّةُ فَقَالَ لَهُ اِجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلِبُ هٰذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اِسْمُكَ ؟ قَالَ حَرْبٌ فَقَالَ لَهُ اِجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلِبُ هٰذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اِسْمُكَ ؟ قَالَ يَعِيْشُ فَقَالَ لَهُ اِحْلِبْ .

"এ উটনীকে কে দুধ দোহন করবে? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বললো তার নাম হলো মুররাহ্। তিনি বললেন, বসো। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ উটনীকে কে দুধ দোহন করবে? অন্য এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বললো, তার নাম হারব। তিনি বললেন, বসে পড়। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ উটনীকে কে দুধ দোহন করবে? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বললো, তার নাম ইয়ায়িশ। তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমিই দুধ দোহন কর। *(জামযুল ফাওয়ায়েদ বাহাওয়ালা মুয়াত্তা ইমাম মালিক)*

প্রথম দু' নামের ভাবার্থ অপছন্দনীয় এবং সর্বশেষ নামের ভাবার্থ পছন্দনীয়। ইয়ায়িশ শব্দ জীবন্ত থাকার অর্থবোধক।

এমনিভাবে ইমাম বুখারীও একটি হাদীস নকল করেছেন।

"রাসূল (সাঃ) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের এ উটকে কে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে? অথবা তিনি বলেছিলেন, "কে তাকে পৌঁছাবে?" এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম

কি?" সে বললো, আমার নাম হলো এই। তিনি বললেন "বসে পড়।" অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?" তিনিও বললেন, "আমার নাম এই।" তিনি বললেন, "বসে পড়।" অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়ালো। তার নিকটও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?" সে বললো, তাঁর নাম নাজিয়াহ।" তিনি বললেন, "তুমি এ কাজের উপযুক্ত। হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।"

ইবাদতের সৌন্দর্য্য

মসজিদের আদবসমূহ

১. যে স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে আল্লাহর কাছে সেই স্থান হলো পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান, আল্লাহকে যারা ভালোবাসে তারা মসিজদকেও ভালোবাসে। কিয়ামতের ভয়ানক দিন, যে দিন কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ তাআলা মসজিদের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে নিজের আরশের ছায়ায় স্থান প্রদান করবেন।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "যার অন্তর মসজিদের সাথে থাকে সে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।

২. মসজিদের খেদমত করবে এবং ইবাদত চালু রাখবে, মসজিদের খেদমত করা ও আবাদ রাখা ঈমানের আলামত। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -

"আল্লাহর মসজিদসমূহকে তারাই আবাদ রাখে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে।"

৩. ফরজ নামাযসমূহ সর্বদা মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করবে। মসজিদে জামাআত ও আযানের যথারীতি নিয়ম এবং মসজিদের শৃংখলার দ্বারা নিজের সমগ্র জীবনকে শৃংখলিত করবে। মসজিদ এমন

একটা কেন্দ্র যে, মুমিনের সমগ্র জীবন আবর্তিত হয় মসজিদকে কেন্দ্র করে। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মসজিদে আবদ্ধ থাকে এবং মসজিদ থেকে নড়ে না, ফিরিশতাগণ এমন সব লোকের সাথী হয়। যদি এরা অনুপস্থিত থাকে তখন ফিরিশতাগণ তাদেরকে তালাশ করতে থাকে। অসুস্থ হলে ফিরিশতাগণ দেখতে যান, কোন কাজ করতে থাকলে ফিরিশতাগণ সাহায্য করেন, এসব ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রহমতের হকদার। *(মুসনাদে আহমদ)*

৪. মসজিদে নামাযের জন্যে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে যাবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "সকাল সন্ধ্যায় নামাযের জন্যে যাওয়া হলো জেহাদের জন্য যাওয়ার সমতুল্য।" তিনি এও বলেন, "যারা ভোরে আঁধারের ভেতরে মসজিদে যায় কিয়ামতের দিনের ঘোর অন্ধকারে তাদের সাথে থাকবে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।" তিনি আরো বলেন, "জামাআতের সাথে নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে যাতায়াতকারী ব্যক্তির প্রতিটি কদমে একটি নেকী যোগ করে একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।" *(ইবনে হাব্বান)*

৫. মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, মসজিদ নিয়মিত ঝাড়ু দেবে। খড়কুটা আবর্জনা পরিষ্কার করবে। সুগন্ধি (আতর বা আগরবাতি) লাগাবে বিশেষতঃ শুক্রবার দিন। রাসূল (সাঃ) বলেন, "মসজিদে ঝাড়ু দেবে মসজিদকে পবিত্র ও পরিষ্কার রাখবে, মসজিদের আবর্জনা বাইরে ফেলবে, মসজিদে সুগন্ধি বিশেষতঃ শুক্রবার দিন মসজিদকে সুগন্ধি দ্বারা সুরভিত করা বেহেশতে প্রবেশের সহায়ক। অর্থাৎ ঃ উপরোক্ত আলামতসমূহ বেহেশতে প্রবেশকারীর আমল।" *(ইবনু মাজাহ)*

রাসূল (সাঃ) এও বলেন, মসজিদের আবর্জনা পরিষ্কার করা সুন্দর আঁখি বিশিষ্ট হুরদের মোহর। অর্থাৎ এ আমলকারী বেহেশতে হুরদের পাবে। *(তিবরানী)*

৬. মসজিদে ভয়ে ভীত ও নরম স্বভাবে যাবে। মসজিদে প্রবেশ করার সময় "আসসালামু আলাইকুম"১ বলবে এবং চুপচাপ বসে আল্লাহর যিকির

---

(১) আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী রচিত 'মুনাব্বেহাত'।

করবে যেনো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব তোমার অন্তরে বিরাজিত থাকে, হাসতে হাসতে অথবা কথা বলতে বলতে অমনোযোগিতার সাথে মসজিদে প্রবেশ যারা করে তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র আল্লাহর ভয় নেই, এটা অমনোযোগী ও বেয়াদবের কাজ। কোন কোন লোক ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হবার জন্য এবং রাকাআত পাবার জন্যে মসজিদের দিকে দৌড়ে যায় এটাও মসজিদের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। জামাআতে রাকাআত পাওয়া যাক বা না যাক ভদ্রতা, মাহাত্ম্য ও বিনয়ের সাথে মসজিদের দিকে যাবে এবং দৌড় দেয়া থেকে বিরত থাকবে।

৭. মসজিদে প্রশান্তচিত্তে বসবে এবং ঈমান আকীদার খেলাফ দুনিয়াদারী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে। মসজিদে হৈ-চৈ অথবা হাসি-ঠাট্টা করা, বাজার দর জিজ্ঞেস করা এবং বলা, দুনিয়ার অবস্থার ওপর ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং বেচাকেনার বাজার গরম করা মসজিদের মর্যাদা বিরোধী। মসজিদ আল্লাহর ইবাদতের ঘর এবং তাতে শুধু ইবাদতই কাম্য।

৮. মসজিদে এমন ছোট শিশুদেরকে নিয়ে যাবে না যারা মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ, ফলে তারা হয়তো মসজিদে পেশাব, পায়খানা করবে অথবা থুথু ফেলবে।

৯. মসজিদকে যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহার করবে না। মসজিদের দরজায় নামায পড়বে অথবা আল্লাহর যিকির করবে এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে।

১০. মসজিদের বাইরে কোন জিনিস হারিয়ে গেলে মসজিদে প্রচার করবে না, মসজিদে নববীতে কেউ যদি এমন ঘোষণা দিত তা হলে রাসূল (সাঃ) অসন্তুষ্ট হতেন এবং এ কথাগুলো বলতেন,

لاَ رَدَّاللّٰهُ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ ـ

"আল্লাহ তোমাকে তোমার হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরিয়ে না দিক।"

১১. মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রাখবে এবং দুরূদ ও সালাম পেশ করার পর প্রবেশের দো'আ পড়বে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি মসজিদে আসে তবে প্রথমে নবীর উপর দরূদ পাঠ করবে তারপর এ দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ (مسلم)

"আয় আল্লাহ। আমার জন্যে আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

মসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাকাত নফল নামায পড়বে, এ নফল গুলোকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলে। অনুরূপ সফর থেকে আসার পর সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু রাকাত নফল নামায পড়বে তারপর বাড়ী যাবে। রাসূল (সাঃ) যখনই সফর থেকে আসতেন তখনই প্রথমে মসজিদে গিয়ে নফল নামায পড়তেন। তারপর বাড়ী যেতেন।

১২. মসজিদ থেকে বের হবার সময় বাম পা বাইরে রাখবে এবং এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

"আয় আল্লাহ ! আমি তোমার বদান্যতা ও অনুগ্রহ কামনা করি।

১৩. মসজিদে রীতিমত আযান ও জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নিয়্যত করবে এবং ইমাম ও মুয়াযযিন এমন লোকদেরকে নিযুক্ত করবে যারা দীন ও চারিত্রিক দিক থেকে সকলের থেকে মোটামুটি উত্তম। । যথাসম্ভব চেষ্টা করবে যে, এমন লোক যেন আযান ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন, যিনি পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় পরকালের পুরস্কারের আশায় এ সকল দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

১৪. আযানের পর এ দোয়া পাঠ করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দোয়া করবে কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই আমার শাফায়াতের হকদার হবে।"

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

"আয় আল্লাহ! এ পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠালাভকারী সালাতের মালিক। মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নৈকট্য ও ফযিলত দান কর এবং তাঁকে সে প্রশংসিত স্থান দান কর যার ওয়াদা তুমি তার সাথে করেছো। "নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করোনা অঙ্গীকার" *(বুখারী)*

১৫. মুয়ায্যিন যখন আযান দেবেন তখন শ্রোতা মুয়ায্যিনের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করবে অবশ্য মুয়ায্যিন যখন "হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ" বলে শ্রোতা তখন "লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম" বলবে। ফজরের আযানে মুয়ায্যিন যখন "আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাওম" বলে শ্রোতা তখন বলবে "ছাদ্দাকতা ওয়া বারাকতা" তুমি সত্য বলেছ এবং পুণ্যের কথা বলেছ।

১৬. তাকবীর দাতা যখন 'ক্বাদ কামাতিচ্ছালাহ, বলে তখন শ্রোতা "আকামাহুল্লাহু ওয়া আদামাহা (আল্লাহ সর্বদা উহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুক) বলবে।

১৭. মহিলারা মসজিদে যাবার পরিবর্তে ঘরে নামায আদায় করবে। একবার আবু সাঈদ হুমাইদী (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার আপনার সাথে নামায পড়ার বড়ই ইচ্ছা। তিনি বললেন, আমি তোমাদের আগ্রহ সম্পর্কে অবগত আছি কিন্তু তোমাদের ঘরের মধ্যে নামায পড়া মসজিদের নামায পড়া থেকে অধিক উত্তম। দালানে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়া থেকে উত্তম। অবশ্য মহিলাগণ মসজিদের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে। পানি ও বিছানার ব্যবস্থা করবে, সুগন্ধি ইত্যাদি প্রেরণ করবে এবং মসজিদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বহাল রাখবে।

১৮. পিতারা বুদ্ধিমান ছেলেদেরকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাবে, মাতাগণ ছেলেদেরকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে মসজিদে পাঠাবে যেনো তাদের মধ্যে মসজিদে যাবার আগ্রহ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হয়। মসজিদে তাদের সাথে অত্যন্ত নম্র, মমতা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করবে। তারা যদি মসজিদে অসতর্ক ব্যবহার বা দুষ্টামী করে বসে তাহলে ধমক বা তিরস্কার না করে বরং স্নেহ ও মমতা দ্বারা বুঝিয়ে দেবে এবং পুণ্যের প্রশিক্ষণ দেবে।

নামাযের আদবসমূহ

১. নামাযের জন্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিপূর্ণ খেয়াল রাখবে। অযু করলে মেসওয়াক করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের পরিচয় হবে তাদের কপাল ও অযুর স্থানগুলো দেখে, ঐ স্থানগুলো নূরের আলোকে ঝলমল করতে থাকবে। সুতরাং যারা তাদের আলো বাড়াতে চায় তারা যেনো আলো বাড়িয়ে নেয়।"

২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মর্যাদাশীল, সুরুচিপূর্ণ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে।

পবিত্র কুরআনে আছে–

يَا بَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ

"হে আদমের সন্তানগণ! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে যাবে।"

৩. ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে নামায আদায় করবে। আল্লাহ পাক বলেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ـ

"ওয়াক্তের নিয়মানুবর্তিতার সাথে মুমিনদের উপর নামায ফরয করা হয়েছে।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) একদা রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আল্লাহর নিকট (বান্দাহর) কোন আমল বেশী প্রিয়? জবাবে তিনি বললেন, "সময় মত নামায আদায় করা।" রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি ঐ নামাযগুলোকে নির্ধারিত সময়ে ভালভাবে অযু করে বিনয় ও নম্রতার সহিত একাগ্রচিত্তে আদায় করবে তাহলে আল্লাহর ওপর তার এ অধিকার বর্তায় যে, তিনি (আল্লাহ) তাকে ক্ষমা করেন আর যে ব্যক্তি নামাযে ত্রুটি করে আল্লাহর ওপর তার মাগফিরাত ও নাজাতের কোন দায়িত্ব থাকেনা, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। *(মুয়াত্তা মালেক)*

৪. নামায সবসময় জামাআতের সাথে আদায় করবে। যদি কখনো জামাআত ছুটে যায় তা হলেও ফরয নামায মসজিদেই আদায় করার চেষ্টা করবে। অবশ্য সুন্নাত ও নফল নামাযগুলো ঘরে পড়াই উত্তম।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি একাধারে ৪০ দিন যাবৎ তাকবীরে উলার সাথে ফরয নামায জামাআতে আদায় করে তাকে দোযখ ও নেফাক থেকে নিরাপত্তা দান করা হয়। *(তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) এও বলেন, লোকেরা যদি জামাআতের সাথে নামায আদায় করার সওয়াব ও পুরস্কার সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতো তাহলে তারা হাজারো অসুবিধা সত্ত্বেও জামাআতের জন্যে দৌড়ে আসত। জামাআতের প্রথম কাতার ফিরিশতাদের ছফের সমতুল্য। একাকী নামায পড়া থেকে দু'জনের জামাআত উত্তম। সুতরাং লোক যত বেশী হয় ততই এ জামাআত আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হয়। *(আবু দাউদ)*

৫. নামায শান্তি ও স্বস্তির সাথে পড়বে এবং রুকু, সিজদা ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করবে। রুকু থেকে উঠার পর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর সেজদায় যাবে। অনুরূপভাবে দু'সেজদার মাঝেও বিরাম করবে এবং এ দো'আও পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَاجِرْنِىْ وَارْزُقْنِىْ - (ابوداؤد)

"আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমার দুরবস্থা দূর করে দাও, শান্তি দাও এবং আমাকে জীবিকা দান কর। *(আবু দাউদ)*

রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ভালভাবে আদায় করে, নামায তার জন্য দোআ করে যে, 'আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুক। যেভাবে তুমি আমাকে হেফাযত করেছো।'

রাসূল (সাঃ) আরো বলেন, "নিকৃষ্টতম চুরি হলো নামাযের চুরি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (মানুষ) নামাযের মধ্যে কিভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, "রুকু সেজদা অপূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ করে নামাযে চুরি করে।

৬. আযানের আওয়ায শোনামাত্রই নামাযের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেবে। অযু করে আগে ভাগেই মসজিদে পৌঁছে যাবে এবং নীরবতার সহিত কাতারে বসে জামাআতের জন্য অপেক্ষা করবে। আযান শুনার পর অলসতা, দেরী করা ও গড়িমসি করতে করতে নামাযের জন্যে যাওয়া মুনাফিকের আলামত।

৭. আযান আগ্রহের সাথে দেবে। রাসূল (সাঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু কাজ শিক্ষা দিন যা আমাকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি তাকে বললেন, "নামাযের জন্যে আযান দেবে।" তিনি আরো বলেন, মুয়ায্যিনের আযান যে পর্যন্ত পৌঁছে এবং যারা শুনে তারা সবাই কিয়ামতের দিন মুয়ায্যিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। যে ব্যক্তি জঙ্গলে বকরী চরায় এবং আযানের সময় হলেই উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দেয় আর চারদিকে যে পর্যন্ত সে আযানের আওয়ায পৌঁছবে, কিয়ামতের দিন সেখানের সকল বস্তুই তার জন্য সাক্ষ্য দেবে। *(বুখারী)*

৮. ইমাম হলে নামাযের সকল নিয়ম-কানুন ও শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করে নামায পড়বে এবং মুক্তাদিদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে সুন্দরভাবে ইমামতের দায়িত্ব পালন করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ইমাম নিজের মুক্তাদিদের ভালভাবে নামায পড়ান আর এ কথা মনে করে নামায পড়ান যে, আমি আমার মুক্তাদিদের নামাযের যামিন। সে তার মুক্তাদিদের নামাযের সওয়াবের একটি অংশ পাবে। মুক্তাদিগণ যতটুকু সওয়াব পাবে, ইমামও ততটুকু সওয়াব পাবেন। মুক্তাদিদের পুরস্কার ও সওয়াবের মধ্যেও কোন কম করা হবে না। *(তিবরানী)*

৯. নামায এমন বিনয় ও নম্রতার সাথে পড়বে যে, অন্তরে আল্লাহ তায়ালার মহিমার ভীতি প্রকাশ পায় এবং ভয় ও নীরবতা বিরাজ করে, নামাযে বিনা কারণে হাত পা নাড়ানো, শরীর চুলকানো, দাঁড়ি খেলাল করা, নাকে আঙ্গুলী প্রবেশ করানো, কাপড় সামলানো অত্যন্ত শিষ্টাচার বিরোধী কাজ। এ থেকে দৃঢ়তার সাথে বিরত থাকা উচিৎ।

১০. নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করবে। নামায এমনভাবে আদায় করবে যেনো নামাযি আল্লাহকে দেখছে। অথবা কমপক্ষে এতটুকু ধারণা রাখবে যে, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "বান্দাহ্ নিজের প্রতিপালকের নিকটতম যখন সে তাঁর সেজদাহ্ করে সুতরাং তোমরা যখন সেজদাহ্ করবে তখন বেশী বেশী দোআ করবে। *(মুসলিম)*

১১. নামায আগ্রহের সাথে পড়বে। জোর-জবরদস্তির পদ্ধতিতে নামায প্রকৃত নামায নয়। এক ওয়াক্ত নামায পড়ার পর অন্য ওয়াক্ত নামাযের জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করবে। একদিন মাগরিবের নামাযের পর কিছু সাহাবী এশার নামাযের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) তাশরীফ আনলেন, এমনকি দ্রুতগতিতে চলার কারণে তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা খুশী হয়ে যাও, তোমাদের প্রতিপালক আকাশের একটি দরজা খুলে তোমাদেরকে ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং গর্ব করে বললেন, দেখ আমার বান্দারা এক নামায আদায় করেছে আর দ্বিতীয় নামাযের জন্যে অপেক্ষা করছে।" *(ইবনু মাজাহ)*

১২. অমনোযোগী ও উদাসীনদের মত তাড়াতাড়ি নামায পড়ে শুধুমাত্র মাথা থেকে বোঝা হাল্কা করবে না অর্থাৎ যিম্মা খালাস করবে না। বরং হুজুরে ক্বালব এর সাথে (একাগ্র মনে) আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং মন, মস্তিষ্ক অনুভূতি, আকর্ষণ, চিন্তাধারা ও কল্পনা প্রত্যেক কর্ম দ্বারা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে পূর্ণ একাগ্রতা ও ধ্যানের সাথে নামায আদায় করবে। যে নামাযে আল্লাহর স্মরণ হয় উহাই হলো প্রকৃত নামায, মুনাফিকদের নামায আল্লাহর স্মরণ শূন্য।

১৩. এছাড়া নামাযের বাইরেও নামাযের কিছু হক আছে। অর্থাৎ পূর্ণ জীবনকে নামাযের আয়না হিসেবে তৈরী করবে। পবিত্র কুরআনে আছে, "নামায নির্লজ্জতা ও নাফরমানী থেকে ফিরিয়ে রাখে।" রাসূল (সাঃ) একটি ফলপ্রসূ উদাহরণের মাধ্যমে এটাকে পেশ করেছেন এভাবে, তিনি শুকনো গাছের ডালকে জোরে জোরে নাড়লেন, নাড়ার কারণে ডালে লেগে থাকা (শুকনো) পাতাগুলো ঝরে পড়লো। অতঃপর তিনি বললেন, এ শুকনো ডাল থেকে পাতাগুলো যে ভাবে ঝরে পড়লো ঠিক এমনিভাবেই নামাযী ব্যক্তির গুনাহ্গুলোও নামাযের দ্বারা ঝরে যায়। এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াতটি তেলাওয়া করলেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۔

"আর নামায কায়েম করো দিনের উভয় অংশে–অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিতের পর অর্থাৎ এশায়। নিশ্চয়ই নেক কাজসমূহ খারাপ কাজসমূহকে মুছে দেয়। এবং ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উত্তম। *(নাসায়ী)*

১৪. নামাযে ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ করবে, নামাযের অন্যান্য তাসবীহগুলোও পূর্ণ মনোযোগ, অন্তরের আসক্তি, মানসিক উপস্থিতির সাথে পড়বে, বুঝে সুঝে পড়লে মনের আগ্রহ বাড়ে এবং এই নামায প্রকৃত নামায হয়।

১৫. নিয়মিত নামায পড়বে, কখনও বাদ দেবে না। মুমিনের প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে সে নিয়মিত নামায পড়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۔

"কিন্তু নামাযী তারাই যারা নিয়মিত নামায আদায় করে।"

১৬. নিয়মিত ফরয নামায আদায় করার সাথে সাথে নফল নামাযেরও গুরুত্ব দেবে এবং বেশী বেশী করে নফল নামায পড়ার চেষ্টা করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ফরয নামায ব্যতীত দিন রাত ১২ (বার) রাকাত[১] নামায আদায় করবে তার জন্যে বিশেষভাবে বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করে দেয়া হবে।"

১৭. সুন্নাত ও নফল নামায মাঝে মাঝে ঘরে পড়বে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "মসজিদে নামায পড়ার পরও কিছু নামায ঘরে পড়বে। আল্লাহ তাআলা এ নামাযের অসীলায় তোমাদের ঘরে সুখ শান্তি দান করবেন।" *(মুসলিম)*

রাসূল (সাঃ) নিজেও সুন্নাত ও নফল নামাযসমূহ অধিকাংশ সময় ঘরে পড়তেন।

---

(১) ইহা দ্বারা ঐ সকল সুন্নাত নামায যা ফরয নামাযের সাথে পড়া হয়। যেমন ঃ ফজরে ২, জোহরে ৬, মাগরিবে ২, এশায় ২, (মোট বার রাকাত)

১৮. ফজরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যখন ঘর থেকে বের হবে তখন এ দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا وَفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَ فِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَفِىْ جِلْدِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَاعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ نُوْرا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا ـ (حصن حصين)

"আয় আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর (আলো) সৃষ্টি করে দিন, আমার চোখে নূর, আমার কানে নূর, আমার ডানে নূর, বামে নূর, আমার পিছনে নূর, সামনে নূর, আমার মধ্যে শুধুই নূর সৃষ্টি করে দিন। আমার শিরা উপশিরায় নূর, আমার গোশতে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার আত্মায় নূর সৃষ্টি করে দিন। আমার জন্যে নূর সৃষ্টি করে দিন এবং আমাকে নূর দ্বারা ভূষিত করে দিন। আমার ওপরে এবং নিচে নূর সৃষ্টি করে দিন। আয় আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন। *(হেছনে হাছীন)*

১৯. ফজর ও মাগরিবের নামায থেকে অবসর হয়েই কথাবার্তা বলার পূর্বে নিম্নের দোআটি সাতবার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ ـ

আয় আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার এ দোআ পাঠ করবে, যদি ঐ দিন অথবা ঐ রাতে মরে যাও তবে তুমি জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।" *(মেশকাত)*

২০. প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলে এ দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - (مسلم)

"ইয়া আল্লাহ! তুমি সর্বময় শান্তি, শান্তির ধারা তোমারই পক্ষ থেকে, হে মহিমান্বিত, মহান দাতা! তুমি মঙ্গল ও প্রাচুর্যময়।" *(মুসলিম)*

হযরত সাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) নামায থেকে সালাম ফিরিয়ে তিনবার "আস্তাগ্ফিরুল্লাহ" বলে উপরোক্ত দোআ পাঠ করতেন। *(মুসলিম)*

২১. জামাআতের নামাযে ছফগুলো যথাসাধ্য ঠিক রাখার চেষ্টা করবে, ছফ সোজা রাখবে এবং দাঁড়ানোর সময় এমনভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে যেনো কোন ফাঁক না থাকে। সামনের ছফ পূর্ণ না হতেই পিছনের ছফে দাঁড়াবে না। একবার এক ব্যক্তি জামাআতের নামাযে এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে, তার কাঁধ্ ছফের বাইরে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখতে পেয়ে সতর্ক করে দিলেন। "আল্লাহর বান্দাহগণ! নিজেদের ছফগুলোকে সোজা ও ঠিক রাখতে চেষ্টা করবে নতুবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবেন। *(মুসলিম)*

অন্য এক জায়গায় রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের ছফকে সঠিকভাবে যুক্ত করলো আল্লাহ তাআলা তাকে যুক্ত করবেন, আর যে ব্যক্তি ছফকে ছেদ করলো আল্লাহ তাকে ছেদ করবেন। *(আবু দাউদ)*

২২. শিশুদের কাতার বয়স্ক পুরুষদের পেছনে করবে। অবশ্য ঈদের মাঠ ইত্যাদিতে যেখানে পৃথক করলে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে অথবা শিশু অপহরণের আশংকা থাকে এসব ক্ষেত্রে শিশুদেরকে পিছনে পাঠানোর দরকার নেই, বরং নিজেদের সাথেই রাখবে। মহিলাদের কাতার একেবারে পেছনে হবে অথবা পৃথক হবে যদি মসজিদে তাদের জন্যে পৃথক স্থান তৈরী করা থাকে। অনুরূপ ঈদের মাঠেও মহিলাদের জন্যে পৃথক পর্দাশীল স্থানের ব্যবস্থা করবে।

কুরআন পাঠের সহীহ্ তরীকা

১. স্বাচ্ছন্দে ও আগ্রহের সাথে মনোযোগ দিয়ে কোরআন মজীদ পাঠ করবে এবং এ বিশ্বাস রাখবে যে, কুরআন মজীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা অর্থ আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন। রাসূল (সাঃ) বলেন, "আমার উম্মতের জন্যে সর্বোত্তম ইবাদত হলো কুরআন পাঠ।"

২. বেশীর ভাগ সময় কুরআন পাঠরত থাকবে আর বিরক্ত হবে না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, "যে বান্দাহ কোরআন পাঠে এতই ব্যস্ত যে, সে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করার সুযোগই পায় না তখন আমি তাকে প্রার্থনা ব্যতিরেকেই প্রার্থনাকরীদের থেকে বেশী দেব।" *(তিরমিযী)*

৩. পবিত্র কুরআন শুধু হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যেই পাঠ করবে। লোকদেরকে নিজের আসক্ত করা, নিজের সুমধুর স্বরের প্রভাব বিস্তার করা এবং নিজের ধার্মিকতার খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে নয়। এসব হলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের উদ্দেশ্য এবং এসব উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াতকারী হেদায়াত লাভ থেকে মাহরুম থাকে।

৪. তেলাওয়াতের পূর্বে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে নেবে। এবং পবিত্র ও পরিষ্কার স্থানে বসে কুরআন তেলাওয়াত করবে।

৫. তেলাওয়াতের সময় কেবলামুখী হয়ে দু'জানু বিছিয়ে তাশাহুদে বসার ন্যায় বসবে এবং মাথা নত করে গভীর মনোযোগ, একাগ্রতা, অন্তরের আসক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে তেলাওয়াত করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

"আপনার নিকট যে কিতাব পাঠিয়েছি বড়ই বরকতময় যেনো তারা আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করে এবং জ্ঞানীগণ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।"

৬. (কুরআন পাঠে) তাজবীদ ও তারতীলের যথাসম্ভব খেয়াল রাখবে। অর্থাৎ কুরআন পাঠের নিয়মানুযায়ী হরফগুলোকে যথাস্থান থেকে উচ্চারণ করে ধীর স্থিরভাবে তা পাঠের চেষ্টা করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী কুরআনকে সুসজ্জিত করো।" *(আবু দাউদ)*

রাসূল (সাঃ) (কুরআনের) প্রতিটি হরফকে পরিষ্কার করে এবং প্রতিটি আয়াতকে পৃথক পৃথক করে পড়তেন।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "কুরআন পাঠকারীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, যে ধীরগতিতে এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরে সুসজ্জিত করে দুনিয়ায় কুরআন পাঠ করতে ঐভাবে পাঠ কর এবং প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে এক স্তর উপরে উঠতে থাকো, তোমার বাসস্থান তোমার তেলাওয়াতের শেষ আয়াত স্থলে। (তিরমিযী)

৭. কুরআন বেশী জোরেও পড়বে না এবং একেবারে চুপে চুপেও পড়বে না বরং মধ্যম আওয়াজে পাঠ করবে। আল্লাহর নির্দেশ,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ۔

"নামাযে বেশী জোরেও পড়বে না এবং চুপেও পড়বে না, উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করবে।"

৮. যখনই সুযোগ পাবে তখনই কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু শেষ রাত তাহাজ্জুদেও কুরআন পাঠের চেষ্টা করবে। এ সময়ে তেলাওয়াত কুরআন পাঠের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আর একজন মুমিন ব্যক্তির পক্ষে তেলাওয়াতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের আকাঙ্খা থাকাই উচিৎ।

৯. তিন দিনের কমে কুরআন শরীফ খতমের চেষ্টা করবে না। রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পাঠ শেষ করলো সে নিশ্চিত কুরআন-এর অর্থ বুঝেনি।"

১০. কুরআনের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার অনুভূতি রাখবে আর যে বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সম্মান করেছ অনুরূপ অন্তরকেও পঁচা দুর্গন্ধময় চিন্তাধারা, খারাপ চেতনা এবং নাপাক উদ্দেশ্য থেকে পাক ও শুদ্ধ করে নেবে। যে অন্তর পঁচা ও নাপাক চিন্তাধারায় জড়িত, সে অন্তরে আল্লাহর কুরআনের মহানত্ব ও মর্যাদা স্থান পেতে পারেনা আর সে অন্তর কুরআনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও যথার্থতা বুঝতে সক্ষম নয়। হযরত ইকরামা (রাঃ) যখন কুরআন শরীফ খুলতেন, তখন অধিকাংশ সময় অজ্ঞান হয়ে যেতেন এবং বলতেন, "ইহা আমার গৌরবময় ও মহান আল্লাহর বাণী।"

১১. পৃথিবীতে মানুষ যদি হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তাহলে আল কুরআন দ্বারাই হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে। এ দৃষ্টিতেই চিন্তা-ভাবনা করবে এবং এর মূল রহস্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝার চেষ্টা করবে। দ্রুত তেলাওয়াত করবে না বরং বুঝে সুঝে পড়ার অভ্যাস করবে এবং চিন্তা ও গবেষণা করার চেষ্টা করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, আমি 'বাকারাহ' ও 'আলে ইমরান' এর মত বড় বড় সূরা না বুঝে তাড়াতাড়ি পড়ার চেয়ে 'আলকারিআহ' ও 'আলকাদর' এর মত ছোট ছোট সূরা বুঝে ধীরগতিতে পাঠ করা বেশী উত্তম বলে মনে করি।

রাসূল (সাঃ) একবার 'সারা রাত এক আয়াত বার বার পাঠ করছিলেনঃ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(আয় আল্লাহ) "আপনি যদি তাদেরকে আযাব দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাহ। আর আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তা হলে আপনি মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানী।"

১২. প্রবল আগ্রহের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করবে, মনে করবে এর নির্দেশাবলী মোতাবেক আমার জীবনে পরিবর্তন আনতে হবে এবং তার হেদায়াতের আলোকে আমার জীবন গড়তে হবে। অতঃপর হেদায়াত মোতাবেক নিজের জীবন গঠন ও অসতর্কতা বশতঃ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে জীবনকে পবিত্র করার জন্যে নিয়মিত চেষ্টা করবে। কুরআন আয়না স্বরূপ মানুষের প্রতিটি দাগ ও কলঙ্ক তা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরবে। এখন ঐ সকল দাগ ও কলঙ্ক থেকে তোমার জীবনকে পাক ও পবিত্র করা তোমার ঈমানী দায়িত্ব।

১৩. কুরআনের আয়াত থেকে সুফল লাভের চেষ্টা করবে। যখন রহমত দয়া, মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারের বিষয় পাঠ করবে তখন আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করবে। আর যখন আল্লাহর ক্রোধে এবং গযব এবং জাহান্নামের ভীষণ আযাবের বিষয় পাঠ করবে তখন শির ভয়ে কাঁপতে থাকবে, চক্ষু থেকে অচেতন ভাবে অশ্রু প্রবাহিত হবে, অন্তর

তওবা ও লজ্জার ভাবধারায় কাঁদতে থাকবে মুমিন ও নেক্কার বান্দাহদের সফলতার কথা কুরআন পাঠের সময় চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে এবং বিভিন্ন জাতিসমূহের ধ্বংসের কাহিনী পাঠের সময় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়বে, শান্তির প্রতিজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শনমূলক আয়াত পাঠ করে অন্তর ভয়ে কম্পমান হবে এবং সু-সংবাদ জাতীয় আয়াত পাঠে অন্তর কৃতজ্ঞতার আবেগে প্রফুল্ল হয়ে উঠবে।

১৪. তেলাওয়াত শেষে দোআ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) তেলাওয়াতের পর এ দোআ করতেন।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى التَّفَكُّرَ وَالتَّدَبُّرَ بِمَا يَتْلُوْهُ لِسَانِىْ مِنْ كِتَابِكَ وَالْفَهْمَ لَهٗ وَالْمَعْرِفَةَ بِمَعَانِيْهِ وَالنَّظْرَ فِىْ عَجَائِبِهٖ وَالْعَمَلَ بِذٰلِكَ مَا بَقِيْتُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"ইয়া আল্লাহ! কিতাবের যে অংশ পাঠ করি এতে চিন্তা ও গবেষণা করার তাওফীক দান করো। আমাকে বুঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দাও। রহস্যগুলো উপলব্ধি করার এবং আমার বাকী জীবনে তার উপর আমল করার তাওফীক দাও। নিশ্চয় তুমি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।

জুমুআর দিনের আমল সমূহ

১. শুক্রবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওযু গোসল ও সাজ-সজ্জার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কেউ জুমুআর নামায পড়তে আসলে, তার গোসল করে আসা উচিৎ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর এ অধিকার যে, সে প্রতি সপ্তাহে গোসল করবে এবং মাথা ও শরীর সুন্দরভাবে পরিষ্কার করবে।"

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক বালেগ পুরুষের পক্ষে প্রত্যেক শুক্রবার গোসল করা কর্তব্য, আর সম্ভব হলে মেসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানোও উচিৎ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করলো, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করল এবং নিজের সাধ্যমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করলো, তার পর তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করলো তারপর দ্বিপ্রহরের পর মসজিদে গিয়ে এভাবে বসলো যে, দু,জন লোককে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করেনি অর্থাৎ দু'জনের মাঝখানে জোর করে প্রবেশ করেনি, তারপর নির্ধারিত নামায আদায় করলো, ইমাম যখন মিম্বরের দিকে যান, তখন সে চুপচাপ বসে খোতবা শুনতে থাকল, তা হলে সে এক জুমা থেকে অন্য জুমা পর্যন্ত যত গুনাহ করেছে তার ঐ সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। *(বুখারী)*

২. জুমুআর দিন যিকির, তাসবীহ, কুরআন তেলাওয়াত, দোআ খায়ের, ছদকা, খয়রাত, রোগী দেখা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা ও অন্যান্য নেক কাজ বেশী বেশী করা ভাল।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে শুক্রবার হলো সর্বোত্তম দিন, এদিন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিন তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং আল্লাহর খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এদিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। *(মুসলিম)*

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "এমন পাঁচটি কাজ আছে যে ব্যক্তি একই দিনে ঐ পাঁচটি কাজ করবে আল্লাহ তাকে বেহেশতবাসী বলে লেখে দেবেন।" সেগুলো হলো—

১. রোগী দেখা

২. জানাযায় শরীক হওয়া

৩. রোযা রাখা

৪. জুমুআর নামায আদায় করা

৫. গোলাম আযাদ করা *(ইবনু হাব্বান)*

প্রকাশ থাকে যে, এ পাঁচটি কাজ সম্পাদন করা শুধুমাত্র শুক্রবারেই সম্ভব। শুক্রবার ছাড়া জুমুআর নামায হয় না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) দ্বারা আরো একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরায়ে 'কাহাফ' পাঠ করবে, তার জন্য উভয় জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ে একটি নূর চমকিতে থাকবে। *(নাসায়ী)*

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে সূরায়ে 'দোখান' তেলাওয়াত করে তার জন্যে ৭০ হাজার ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনা করে অতঃপর তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। *(তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) বলেন, "জুমুআর দিন এমন এক কল্যাণকর সময় আছে সে সময়ে যাই প্রার্থনা করা হয় তাই কবুল হয়।" *(বুখারী)*

কিন্তু এ সময়টি কোনটি? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে, কেননা, এ সময় সম্পর্কে বিভিন্নমুখী রেওয়ায়াত অত্যন্ত বিশুদ্ধ ঃ

(১) ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্যে যখন মিম্বরে এসে বসেন তখন থেকে নামায হওয়া পর্যন্ত সময়।

(২) জুমুআর দিনের শেষ সময় যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে। উভয় সময় আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত আদব ও কাকুতি-মিনতির সাথে দোআর মাধ্যমে অতিবাহিত করবে। নিজের অন্যান্য দোআর সাথে এ দোআ করলেও ভাল হয়।

দোআটি হলো—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ ـ (بخارى- نسائى)

"আয় আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দাহ এবং আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তি অনুযায়ী হাজির আছি। আপনি আমাকে সকল নেয়ামত দান করেছেন আমি সে সব স্বীকার করি। আমার পুণ্যসমূহও আমি সমর্থন করি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া আর কোন ক্ষমাকারী নেই। আমি যা কিছু করেছি তার অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।"

৩। জুমুআর নামাযের গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। জুমুআর নামায প্রত্যেক বালেগ, সুস্থ, মুকীম, হুশ-জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমান পুরুষের উপরই ফরয। কোন স্থানে যদি ইমাম ব্যতীত আরো দু'জন লোক হয় তা হলেও জুমুআর নামায আদায় করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, লোকদের উচিৎ তারা যেনো জুমুআর নামায কখনও তরক না করে, নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে সিলমোহর লাগিয়ে দেবেন। ফলে তারা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(মুসলিম)*

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে অর্থাৎ জুমুআর জন্যে গোসল করে ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে জুমুআর নামায পড়ার জন্যে মসজিদে উপস্থিত হয় এবং নির্ধারিত সুন্নাত আদায় করে চুপচাপ বসে (খোতবা শুনতে) থাকে, ইমাম খোতবা থেকে অবসর হলে ইমামের সাথে ফরয নামায আদায় করে তখন তার এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ পর্যন্ত আরো তিন দিনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"

হযরত ইয়াযিদ বিন মরিয়ম বলেন, আমি জুমুআর নামাযের জন্যে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আবায়া বিন রেফায়ার সাথে দেখা হলো তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি উত্তর দিলাম, জুমুআর নামায পড়তে। তিনি বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ। এটাই তো আল্লাহর রাস্তা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে বান্দাহর পা আল্লাহর পথে ধূলায় মলিন হলো তার উপর (জাহান্নামের) আগুন হারাম।"

৪। জুমুআর আযান শোনামাত্রই মসজিদের দিকে চলে যাবে। কাজ-কারবার ও অন্যান্য ব্যস্ততা বন্ধ করে দেবে এবং পূর্ণ একাগ্রতার সাথে খোতবা শোনা ও নামায আদায়ের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। নামায আদায়ের পর আবার কাজ-কারবারে লেগে যাবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ (الجمعة)

"হে, মুমিনগণ! জুমুআর দিন যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্যে আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা দ্রুতগতিতে আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও, তোমরা যদি জ্ঞানী হও তবে তোমাদের এটা করাই উত্তম। অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন যমিনে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর দান অন্বেষণে লেগে যাও অতঃপর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো যেনো তোমরা সফলকাম হও।"

একজন মুমিন যে সকল আয়াত দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তা হলোঃ

১. একজন মুমিনকে মনে-প্রাণে জুমুআর নামাযের গুরুত্ব প্রদান করা এবং আযান শোনামাত্র সকল প্রকার কাজ-কারবার ছেড়ে দিয়ে দ্রুত মসজিদের দিকে যাওয়া উচিৎ।

২. আযান শোনার পর মুমিনের পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা পার্থিব কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে খাঁটি দুনিয়াদার হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

৩. মুমিনের পুণ্যের রহস্য হলো, সে দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাহ ও গোলাম এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ডাক আসলে একজন প্রভুভক্ত ও অনুগত গোলাম হিসেবে নিজের সর্ব প্রকার পার্থিব উন্নতির চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে এবং কার্যতঃ ইহা প্রমাণ করবে যে, দীনের প্রয়োজনে পার্থিব উন্নতি উৎসর্গ করা ধ্বংস ও অকৃতকার্যতা নয় বরং পার্থিব উন্নতির লালসায় দীন ধ্বংস করাই প্রকৃত অকৃতকার্যতা।

৪. পার্থিব ব্যাপারে শুধুমাত্র এ মনোভাব ঠিক নয় যে, মানুষ দীনদার হতে গিয়ে দুনিয়া বিমুখ হয়ে পার্থিব কাজে একেবারে অকেজো প্রমাণিত হবে। বরং নামায থেকে অবসর হওয়া মাত্রই আল্লাহর যমীনে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় জীবিকা অর্জনের জন্যে যে সকল উপায় এবং উপকরণ দান করেছেন তা থেকে পূর্ণ ফায়দা লাভ করবে এবং নিজের যোগ্যতাকে পূর্ণ কাজে লাগিয়ে নিজের জীবিকা তালাশ করে নেবে। কেননা মুমিনের জন্যে বৈধ নয় যে, সে নিজের আবশ্যকতা পূরণের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, আবার এটাও ঠিক নয় যে, সে নিজের অধীনস্থদের জরুরত পূরণে ত্রুটি করবে আর তারা অস্থিরতা ও নৈরাশ্যতার শিকার হবে।

৫. শেষ জরুরী হেদায়াত এই যে, মুমিন পার্থিব ধাঁধায় ও কাজে এমনিভাবে জড়িয়ে পড়বে না যে, নিজে আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে যাবে, বরং তাকে সর্বদা এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তার জীবনের প্রধান পুঁজি ও প্রকৃত রত্ন হলো আল্লাহর স্মরণ।

হযরত সায়ীদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেন, শুধু মুখে তাসবীহ, তাহ্মীদ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদি উচ্চারণ করার নামই আল্লাহর যিকির নয় বরং আল্লাহর আনুগত্যে নিজের জীবন গঠন করার নামই আল্লাহর যিকির বা স্মরণ।

৬. জুমুআর নামাযের জন্যে তাড়াতাড়ি মসজিদে পৌছে যেতে এবং মসজিদে গিয়ে প্রথম ছফে (সারিতে) স্থান লাভ করার চেষ্টা করবে। হযরত আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এমনভাবে গোসল করলো, যেমন গোসল করে পবিত্রতা হাসিলের জন্যে, অতঃপর মসজিদে গিয়ে পৌছল তাহলে সে

যেনো একটি উট কুরবানী করলো, যে ব্যক্তি এর দ্বিতীয় সময়ে পৌঁছল সে যেনো একটি গরু কুরবানী এবং যে ব্যক্তি তারপর ৩য় সময়ে গিয়ে পৌঁছল সে যেনো একটি সিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করলো, এবং যে ব্যক্তি ৪র্থ সময়ে গিয়ে পৌঁছলো সে যেনো আল্লাহর রাস্তায় একটি ডিম দান করলো। অতঃপর খতীব বা ইমাম যখন খোতবা পাঠের জন্যে দাঁড়ান তখন ফিরিশতারা মসজিদের দরজা ছেড়ে দিয়ে খোতবা শোনা ও নামায পড়ার জন্যে মসজিদে এসে বসেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত ইরবায বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) প্রথম কাতারের লোকদের জন্যে তিনবার আর ২য় সারির লোকদের জন্যে একবার মাগফিরাতের দোআ করতেন। *(ইবনু মাজাহ, নাসায়ী)*

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, মানুষের প্রথম কাতারের সওয়াব ও পুরস্কার সম্পর্কে সঠিক জানা নেই। যদি প্রথম কাতারের সাওয়াব ও পুরস্কারের কথা জানতে পারতো তা হলে প্রথম সারির জন্যে লটারীর সাহায্য নেয়া লাগতো। *(বুখারী, মুসলিম)*

৭. জুমআর নামায জামে মসজিদে পড়বে এবং যেখানেই জায়গা পাবে সেখানেই বসে পড়বে। মানুষের মাথা ও কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে যেতে চেষ্টা করবে না। এর দ্বারা মানুষ শারীরিক কষ্ট ও মানসিক দুঃখ অনুভব করে এবং তাদের নীরবতা, একাগ্রতা ও মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক মুসলমান ভাইয়ের সুবিধার্থে প্রথম কাতার ত্যাগ করে দিয়ে ২য় সারিতে আসে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রথম সারির দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দান করবেন। *(তিবরানী)*

৮. খোতবা নামায থেকে সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা, খোতবা মূলতঃ উপদেশবাণী যার দ্বারা ইমাম লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদতের উপর উৎসাহ প্রদান করেছেন। কিন্তু নামায শুধু ইবাদতই নয় বরং সর্বোত্তম ইবাদত, সুতরাং কখনো খোতবা বেশ লম্বা চওড়া দেয়া হবে কিন্তু নামায তাড়াতাড়ি সংক্ষিপ্ত করবে এটা ঠিক নয়। *(মুসলিম)*

রাসূল (সাঃ) বলেন, "নামায দীর্ঘ করা আর খোতবা সংক্ষিপ্ত করা বুদ্ধিমান ইমামের কাজ, সুতরাং তোমরা নামায দীর্ঘ করবে আর খোতবা সংক্ষিপ্ত আকারে দেবে।" *(মুসলিম)*

৯. খোতবা অত্যন্ত চুপচাপ, মনোযোগ, একাগ্রতা আবেগ ও আগ্রহের সাথে শুনবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যে সকল নির্দেশ জানা হলো সর্বান্তকরণে তার আমল করবে।

"খতীব খোতবা দেয়ার জন্যে বের হয়ে আসলে তখন কোন নামায পড়া ও কথা বলা জায়েয নেই।"

১০. দ্বিতীয় খোতবা আরবীতে পড়বে। তবে প্রথম খোতবায় মুক্তাদিদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কিছু নির্দেশ, উপদেশ, পরামর্শ ও সকর্তবাণী মাতৃভাষায় দেয়ার চেষ্টা করবে। রাসূল (সাঃ) যে খোতবা দিয়েছেন তা দ্বারা বুঝা যায় যে, খতীব মুসলমানদেরকে অবস্থানুযায়ী কিছু উপদেশ ও পরামর্শ দেবেন। এ উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে যখন বক্তা শ্রোতাদের জন্যমাতৃভাষায় ভাষণ দেবে।

১১. জুমআর ফরয নামাযে সূরায়ে 'আল-আ'লা' ও 'আলগাশিয়া' পাঠ করা অথবা সূরায়ে মুনাফেকুন ও জুমআ পাঠ করা উত্তম ও সুন্নাত। রাসূল (সাঃ) জুমুআর নামাযে বেশীর ভাগ সময় এ সকল সূরা পড়তেন।

১২. জুমুআর দিন রাসূল (সাঃ)-এর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করার বিশেষ ব্যবস্থা করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "জুমআর দিন আমার ওপর বেশী বেশী করে দুরূদ পেশ করবে। এদিন দরূদ পাঠের সময় ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং এ দুরূদ আমার কাছে পৌছে যায়। *(ইবনে মাজাহ)*

জানাযার নামাযের নিয়ম-কানুন

১. জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। জানাযার নামায হলো মৃত ব্যক্তির জন্যে মাগফিরাতের দোআ আর মৃত ব্যক্তির অধিকার। অজু করতে করতে জানাযা শেষ হয়ে যাবার আশংকা হলে তায়াম্মুম করেই নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "জানাযার নামায পড়বে সম্ভবতঃ ঐ নামাযের দ্বারা তোমরা চিন্তাগ্রস্ত হবে, চিন্তান্বিত ব্যক্তি আল্লাহর ছায়ায় থাকে এবং চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি সকল নেক কাজকে অভ্যর্থনা জানায়।" *(হাকেম)*

রাসূল (সাঃ) বলেন যে, যে মৃত ব্যক্তির ওপর মুসলমানদের তিন কাতার জানাযার নামায পড়ে তার জন্যে বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যায়।

(আবু দাউদ)

২. জানাযার নামাযের জন্যে মৃত ব্যক্তির খাট এমনভাবে রাখবে যেনো, মাথা উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে এবং মুখমণ্ডল কেবলার দিকে থাকে।

৩. জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে।

৪. জানাযার নামাযে সর্বদা কাতার বেজোড় সংখ্যক রাখবে, লোক কম হলে এক কাতার করবে আর লোক বেশী হলে তিন, পাঁচ, সাত, লোক যত বেশী হবে কাতারও তত বেশী করবে কিন্তু সংখ্যায় বেজোড় থাকতে হবে। ইমাম ছাড়া ৬ জন লোক হলে তখন ৩ কাতার করবে।

৫. জানাযা আরম্ভ করতে নিয়্যত করবে এভাবে-"আমি পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নিকট এ মৃত ব্যক্তির জন্যে মাগফিরাতের কামনায় নামাযে জানাযা পড়ছি।" ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ে এ নিয়্যতই করবে।

৬. জানাযার নামাযে ইমাম যা পড়বে মুক্তাদিও তাই পড়বে, মুক্তাদি নীরব থাকবে না। অবশ্য ইমাম তাকবীরসমূহ উচ্চস্বরে বলবে আর মুক্তাদি বলবে চুপি চুপি।

৭. জানাযা নামাযে চার তাকবীর বলবে, প্রথম তাকবীর বলার সময় হাত কান পর্যন্ত নিয়ে যাবে, তারপর হাত বেঁধে সানা পড়বে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

"ইয়া আল্লাহ! আপনি পবিত্র ও মহান, আপনার গুণগানের সাথে, আপনার নাম উত্তম ও প্রাচুর্যময়, আপনার মহানত্ব ও মহত্ব অনেক উর্ধ্বে, আপনার প্রশংসা মহিমান্বিত, আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।

সানা পাঠের পর দ্বিতীয় তাকবীর বলবে, এ তাকবীরে হাত উঠাবে না এবং মাথা দ্বারা ইশরাও করবে না। দ্বিতীয় তাকবীর বলার পর এই দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

"ইয়া আল্লাহ! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল কর। যেমন তুমি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত মহিমান্বিত। আয় আল্লাহ! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করো। যেমন ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর দান করেছো। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।"

এখন হাত না উঠিয়ে তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং মাসনুন দোআ পাঠ করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে উভয় দিকে সালাম ফিরাবে।

৮. মৃত ব্যক্তি যদি বালেগ পুরুষ অথবা মহিলা হয় তবে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

"আয় আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট,

বড়, পুরুষ, মহিলা সবাইকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের সাথে জীবিত রাখ আর যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো।"

মৃত যদি নাবালেগ ছেলে হয় তাহলে এ দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

"আয় আল্লাহ! ঐ শিশুকে আমাদের জন্যে মুক্তির খুশীর ও আনন্দের উপকরণ কর, তাকে আমাদের জন্যে পুরস্কার ও আখেরাতের সম্পদ কর এবং আমাদের জন্যে এমন সুপারিশকারী কর যার সুপারিশ আখেরাতে গৃহীত হয়।"

আর মৃত যদি নাবালেগ মেয়ে হয় তাহলে এ দোআ পাঠ করবে, এ দোআর অর্থও পূর্বের ছেলের জন্যে পাঠকৃত দোআর অনুরূপ।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً ـ

৯. জানাযার সাথে যাবার সময় নিজের শেষ ফল সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং মনে করবে যে আজ তুমি যেমন অন্যকে মাটির নিচে দাফন করতে যাচ্ছ ঠিক তেমনি একদিন অন্যেরাও তোমাকে মাটিতে দাফন করতে নিয়ে যাবে। এ শোক ও চিন্তায় তুমি অন্ততঃ এ সময়টুকু পরকালের ধ্যানে মগ্ন থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে এবং পার্থিব জটিলতা ও কথাবার্তা থেকে রক্ষা পাবে।

মৃতপ্রায় ব্যক্তির সাথে করণীয়

১. মৃতপ্রায় ব্যক্তির নিকট গেলে মৃদু উচ্চঃস্বরে কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পাঠ করবে, তাকে পড়তে বলবে না। রাসূল (সাঃ) বলেন, যখন মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির নিকট বসবে তখন কালেমার যিকির করতে থাকবে। *(মুসলিম)*

২. অন্তিমকালে মৃত্যুযন্ত্রণার সময় সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করো।" *(আলমগীর ১ম খণ্ড)*

গোসল না দেয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন শরীফ পাঠ করবে না। যার উপর গোসল ফরয এমন নাপাক ব্যক্তি এবং হায়েয-নেফাসওয়ালী নারীও মৃত ব্যক্তির নিকট যাবে না।

৩. মৃত্যু সংবাদ শুনে, "ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"[১] পাঠ করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করবে তার জন্য তিনটি পুরস্কার।

প্রথমতঃ তার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সত্যের খোঁজ ও অন্বেষণে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়তঃ তার ক্ষতিপূরণ করে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু থেকে উত্তম বস্তু দান করা হয়।

৪. মৃতের শোকে চিৎকার-ফুৎকার ও বিলাপ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকবে। অবশ্য শোকে অশ্রুপাত করা স্বাভাবিক ব্যাপার।

রাসূল (সাঃ)-এর ছেলে ইবরাহীমের (রাঃ) মৃত্যু হলে তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, অনুরূপ তাঁর দৌহিত্রের (জয়নব (রাঃ) এর ছেলে) মৃত্যুতেও তার চক্ষু মুবারক থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাঁদছেন? তিনি উত্তর দিলেন, এটা দয়া। যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে আমানত রেখেছেন, আল্লাহ সেসব বান্দাহকে দয়া করেন যারা দয়াকারী অর্থাৎ যারা অন্যকে দয়া করে আল্লাহও তাদেরকে দয়া করেন।

---

(১) আমরা সবাই তাঁরই জন্যে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

তিনি বলেছেন যে, "যারা মুখে থাপ্পড় দেয়, জামার বুকের অংশ ছিঁড়ে এবং অন্ধকার যুগের ন্যায় বিলাপ করে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

৫. নিঃশ্বাস ত্যাগের পর পরই মৃতের হাত-পা সোজা করে দেবে, চক্ষু বন্ধ করে দেবে। একটি রুমাল চোয়ালের নিচে দিয়ে মাথার উপর বেঁধে দেবে, পায়ের উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী একত্র করে রশি দ্বারা বেঁধে এবং চাদর দ্বারা ঢেকে রাখবে এবং পড়তে থাকবে, "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" আল্লাহর রাসূলের মিল্লাতের উপর।" লোকদেরকে মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে এবং কবরে রাখবার সময়ও ঐ দোআ পাঠ করবে।

৬. এ সময় মৃত ব্যক্তির গুণের কথা বর্ণনা করবে, দোষের কথা বর্ণনা করবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেন, নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের গুণের কথা বর্ণনা করবে, এবং দোষের কথা থেকে মুখ বন্ধ রাখবে। *(আবু দাউদ)*

তিনি বলেছেন যে, "যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং চতুর্দিকের পড়শীগণ তার ভাল হওয়ার কথা সাক্ষ্য দেয় তখন আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম আর যে সকল দোষের কথা তোমরা জানতে না তা আমি মাফ করে দিলাম।" *(ইবনু হাব্বান)*

একবার রাসূল (সাঃ) এর সাক্ষাতে সাহাবায়ে কেরাম এক মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলো, তিনি বললেন, "তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো। হে লোক সকল! তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা যাকে ভাল বলো নিশ্চয় আল্লাহ তাকে বেহেশত দান করেন আর তোমরা যাকে মন্দ বলো আল্লাহ তাকে দোযখে ফেলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাও অথবা কারো জানাযায় অংশ গ্রহণ করো তবে সর্বদা মুখে ভাল কথা বলবে, কেননা, ফিরিশতাগণ তোমার কথার উপর আমীন (কবুল করো) বলতে থাকেন। *(মুসলিম)*

৭. মৃত্যু শোকে ধৈর্য্য ও সহশীলতার প্রমাণ দেবে। কখনো অকৃতজ্ঞতাসুলভ কোন শব্দ মুখে আনবে না। রাসূল (সাঃ) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি নিজের সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য্যধারণ করে তখন আল্লাহ তাআলা নিজে ফিরিশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার

বান্দাহর সন্তানের প্রাণ হরণ করেছো ? ফিরিশতাগণ উত্তরে বলেন, প্রতিপালক! আমরা আপনার আদেশ পালন করেছি। পুনঃ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দাহর কলিজার টুকরারও প্রাণহরণ করেছ? তারা উত্তরে বলেন, জ্বী হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দাহ কি বলেছে? তারা উত্তরে বলেন, প্রতিপালক! সে আপনার শুকরিয়া প্রকাশ করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলেন, আমার ঐ বান্দাহর জন্যে বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করো এবং ঐ ঘরের নাম 'বাইতুল হাম্‌দ' (শোকরের ঘর) রাখো।" *তিরমিযি)*

৮. মৃতের গোসল ও ধোয়াতে দেরী করবে না। গোসলের জন্যে পানিতে সামান্য বরই পাতা দিয়ে সামান্য গরম করে নেয়া ভাল। মৃত ব্যক্তিকে পবিত্র ও পরিষ্কার তক্তা বা খাটে শোয়াবে, কাপড় খুললে নিম্নাঙ্গ যেনো লুঙ্গি দ্বারা ঢাকা থাকে। অতঃপর অযু করাবে, অযুতে কুলি করানো ও নাকে পানি দেয়ার দরকার নেই, গোসল করাবার সময় নাকে ও কানে তুলা দেবে যেনো ভেতরে পানি প্রবেশ না করে। তারপর মাথা সাবান বা অন্য কোন জিনিস দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবে। বাম দিকে কাত করে শুইয়ে ডান পাশে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি ঢেলে পরিষ্কার করবে। তারপর অনুরূপ (ডান দিকে কাত করে শোয়াবে) বাম পাশে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি ঢেলে পরিষ্কার করবে। অতঃপর ভিজা লুঙ্গি সরায়ে দিয়ে শুকনা লুঙ্গি বা চাদর দ্বারা নিম্নাঙ্গ ঢেকে দেবে, অতঃপর এখান থেকে উঠিয়ে খাটে বিছানো কাফনের উপর শুইয়ে দেবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিল এবং তার দোষ গোপন করলো আল্লাহ তাআলা ঐরূপ বান্দাহর ৪০টি কবীরা গুনাহ মাফ করে দেন এবং যে ব্যক্তি মৃতকে কবরে নামিয়ে রাখলো সে যেনো তাকে হাশর পর্যন্ত থাকার ঘর তৈরী করে দিল। *(তিবরানী)*

৯. কাফন মধ্যম মানের সাদা কাপড় দিয়ে তৈরী করবে, মূল্যবান কাপড় দেবে না অথবা খুব নিম্নমানের কাপড়ও দেবে না। পুরুষের জন্যে কাফনে তিন কাপড় দেবে। (১) চাদর, (২) তহবন্দ বা ছোট চাদর, (৩) জামা বা কাফনী। চাদর লম্বায় দেহের উচ্চতা থেকে একটু বেশী রাখবে যেনো মাথা ও পা উভয় দিক থেকে বাঁধা যায়, প্রস্থে এতোটুকু রাখবে

যেনো মৃতকে ভাল করে জড়ানো যায়। এছাড়া মহিলাদের মাথা পেচানোর জন্যে ঘোমটা জাতীয় (যার দৈর্ঘ্য হবে এক গজের কিছু বেশী, প্রস্থে এক গজের থেকে কিছু কম এবং বগল থেকে হাঁটু পর্যন্ত) একটি সীনাবন্দও দিতে হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মৃতকে কাপড় পরিধান করাল আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতে রেশমী পোশাক পরিধান করাবেন। *(হাকেম)*

১০. কফিন কবরস্থানের দিকে একটু দ্রুতগতিতে নিয়ে যাবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "জানাযায় তাড়াতাড়ি করো।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কফিন কি গতিতে নিয়ে যাবো? তিনি বলেন, তাড়াতাড়ি তবে দৌড়ের গতি থেকে কিছু কম। যদি ভাল লোক হয় তা হলে ভাল পরিণামের দিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছিয়ে দাও আর যদি দুষ্ট লোক হয় তাহলে তাড়াতাড়ি তাকে দূর করে দাও। *(আবু দাউদ)*

১১. কফিনের সাথে পায়ে হেঁটে যাবে।

রাসূল (সাঃ) এক কফিনের সাথে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে, কিছু লোক জানোয়ারের পিঠে চড়ে যাচ্ছে। তিনি তাদেরকে ধমকালেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, আল্লাহর ফিরিশতাগণ পায়ে হেঁটে যাচ্ছে অথচ তোমরা প্রাণীর পিঠের ওপর? তবে দাফনকার্য শেষ করে ফেরত আসার সময় বাহনে চড়ে আসতে পার।

রাসূল (সাঃ) আবু ওয়াহেদী (রাঃ)-এর দাফনের সময় পায়ে হেঁটে যান এবং আসার সময় অশ্বারোহণ করে আসেন।

১২. যখন কফিন আসতে দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে আর যদি তার সাথে শরিক হওয়ার ইচ্ছা না হয় তা হলে সামনে এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমরা যখন কফিন (আসতে) দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে আর যারা তার সাথে যাবে তারা তা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেন, মুসলমানের ওপর মুসলমানের একটি হক হলো যে, সে মৃতের সাথে যাবে। তিনি এও বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক

হলো, জানাযার নামায পড়ল সে এক ক্বীরাত সমতুল্য সওয়াব পায়, নামাযের পর যে দাফনে অংশ গ্রহণ করলো তাকে দু'ক্বীরাত সওয়াব দেওয়া হয়। কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ক্বীরাত কত বড়? তিনি বললেন, ক্বীরাত দু'পাহাড়ের সমতুল্য। *(বুখারী মুসলিম)*

১৩. মৃতের কবর লম্বায় উত্তর-দক্ষিণে খনন করবে, মৃতকে কবরে রাখার সময় কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাবে। মৃত ব্যক্তি যদি হালকা পাতলা হয় তাহলে নামাবার জন্য দু'জনই যথেষ্ট, নতুবা তিন অথবা ততোধিক লোকে নামাবে। নামানোর সময় মৃতকে কেবলামুখী করে নামাবে এবং কাফনের গিরাগুলো খুলে দেবে।

১৪. মহিলোকে কবরে নামাবার সময় পর্দার ব্যবস্থা করবে।

১৫. কবরে মাটি ফেলার সময় মাথার দিক থেকে আরম্ভ করবে এবং উভয় হাতে মাটি নিয়ে তিনবার কবরের ওপর ফেলবে। প্রথমবার মাটি ফেলার সময় পাঠ করবে, "মিনহা খালাক্বনাকুম" (এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি) ২য় বার মাটি ফেলার সময় পাঠ করবে, "ওয়া ফীহা নুয়ীদুকুম" (আর আমি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করছি) ৩য় বার মাটি ফেলার সময় পাঠ করবে, "ওয়া মিনহা নুখরীজুকুম তারাতান উখরা" (আর এ মাটি থেকেই দ্বিতীয় বার উঠাবো)।

১৬. দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে অপেক্ষা করবে, মৃতের জন্যে মাগফিরাতের দোআ করবে, কুরআন শরীফ থেকে কিছু পাঠ করে উহার সওয়াব মৃতের রূহের উপর বখশিয়ে দেবে, উপস্থিত লোকদেরকে দোআয়ে এস্তেগফার করানোর জন্যে উৎসাহ দেবে।

রাসূল (সাঃ) নিজে দাফনের পর দোআয়ে মাগফিরাত করতেন এবং অন্যদেরকেও তা করার নির্দেশ দিতেন, এ সময়টি হিসাব-নিকাশের সময় তোমাদের ভাইয়ের জন্যে দোআয়ে মাগফিরাত কর। (আবু দাউদ)

১৭. বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অথবা পাড়া প্রতিবেশীর কেউ মারা গেলে তাদের ঘরে দু'এক বেলার খানা পাঠিয়ে দেবে। কেননা, তারা এ সময় শোকে কাতর থাকে। তিরমিযী শরীফে আছে, হযরত জাফর (রাঃ)এর শহীদ হওয়ার সংবাদ আসার পর রাসূল (সাঃ) বললেন, জাফরের (রাঃ) ঘরের লোকদের জন্যে খানা তৈরী করে দাও কেননা ওরা আজ শোকাহত।

১৮. মৃত ব্যক্তির জন্যে তিন দিনের বেশী শোক পালন করবে না, অবশ্য কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে তার জন্যে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যখন উম্মুল মুমেনিন উম্মে হাবীবার পিতা আবু সুফিয়ান (রাঃ) মারা যান তখন উম্মুল মুমেনিন বিবি জয়নাব তাঁর কাছে শোক প্রকাশের জন্যে গেলেন। হযরত উম্মে হাবীবা জাফরান ইত্যাদি মিশ্রিত সুগন্ধি আনলেন এবং তা থেকে কিছু নিজের দাসীকে লাগাতে দিলেন আর কিছু নিজের মুখমণ্ডলে মাখলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ সাক্ষী আমার সুগন্ধি লাগানোর কোন আবশ্যকতা ছিল না কিন্তু আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনিছে যে, যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে তিন দিনের বেশী শোক পালন করবে না, অবশ্য স্বামী শোকের ইদ্দত হলো চার মাস দশ দিন। *(আবু দাউদ)*

১৯. মৃতের পক্ষ থেকে সাধ্যমত দান-খয়রাত করবে। অবশ্য এ ব্যাপারে সুন্নাত বিরোধী রসম-রেওয়াজ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার চেষ্টা করবে।

কবরস্থানের নিয়ম

১. মৃতের সাথে কবরস্থানে যাবে এবং দাফন করার কাজে অংশ গ্রহণ করবে। মাঝে মধ্যে এমনিতেই কবরস্থানে যাবে, কেননা এতে পরকালের স্মরণ তাজা হয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে প্রস্তুতির আবেগ সৃষ্টি হয়।

রাসূল (সাঃ) এক মৃতের সাথে কবরস্থানে গেলেন এবং কবরের পাশে বসে এতো কাঁদলেন যে, (চোখের পানিতে) মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, ভাইসব! এদিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। *(ইবনু মাজহা)*

অন্য একবার তিনি কবরের নিকট বসে বললেন, কবর প্রতিদিন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার দিয়ে বলে, হে আদম সন্তানগণ! তোমরা কি আমাকে ভুলে গিয়েছ! আমি একাকিত্বের নির্জন ঘর! আমি অচেনা অপরিচিত ও আতঙ্কময় স্থান! আমি হিংস্র পোকা-মাকড়ের ঘর! আমি সংকীর্ণ ও বিপদ সংকুল স্থান! যাদের জন্যে আল্লাহ আমাকে উন্মুক্ত ও

সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন সে সকল সৌভাগ্যবান ব্যতীত অন্য সকল লোকের জন্যে আমি এরূপ কষ্টদায়ক! তিনি বলেন, কবর হয়তো জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহ হতে একটি বাগান। *(তিবরানী)*

২. কবরস্থানে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং কল্পনাবিলাসী মানসিকতা ত্যাগ করে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। একবার হযরত আলী (রাঃ) কবরস্থানে গেলেন, হযরত কামিলা (রাঃ)ও তার সাথী ছিলেন, কবরস্থানে গিয়ে তিনি একবার কবরগুলোর প্রতি তাকালেন এবং তিনি কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে কবরবাসী! হে পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটিরে বসবাসকারী! হে ভয় সংকুল একাকীত্বে বসবাসকারী! তোমাদের কি সংবাদ বলো? আমাদের সংবাদ তো তোমাদের সম্পদ বন্টন হয়ে গিয়েছে তোমাদের সন্তানেরা ইয়াতিম হয়ে গিয়েছে। তোমাদের স্ত্রীরা গ্রহণ করেছে অন্য স্বামী, এ তো হলো আমাদের সংবাদ। এখন তোমরাও তোমাদের কিছু সংবাদ শুনাও! এ বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, অতঃপর তিনি কামিলের দিকে দেখে বললেন, হে কামিলগণ এ কবরবাসীদের যদি বলার অনুমতি থাকতো তাহলে তারা বলতো, "উত্তম সম্পদ হোল পরহেজগারী" একথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন, তারপর বললেন, হে কামিল! কবর হলো আমলের সিন্ধুক! মৃত্যুর পরই তা বুঝা যায়।

৩. কবরস্থানে প্রবেশ করার সময় এ দোআ পাঠ করবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

"তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক, হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! অবশ্যই আমরা শীঘ্রই আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আমি আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্যে (আযাব ও গযব থেকে) নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি।"

অমনোযোগী লোকদের মত কবরস্থানে হাসি-ঠাট্টা এবং দুনিয়াদারীর কথা-বার্তা বলবে না। কবর পরকালের প্রবেশদ্বার, এ প্রবেশদ্বারকে নিজের ওপর প্রভাবিত করে কান্নার চেষ্টা করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছিলাম (যেন তাওহীদ তোমাদের অন্তরে দৃঢ় হয় সুতরাং) কিন্তু এখন তোমাদের ইচ্ছে হলে তোমরা যেতে পার, কেননা, কবর নতুনভাবে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। *(মুসলিম)*

৫. কবর পাকা করা ও সজ্জিত করা থেকে বিরত থাকবে। রাসূল (সাঃ)-এর ওপর যখন মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হলো তখন ব্যথা যন্ত্রণায় তিনি অত্যন্ত অস্থির ছিলেন, কখনও তিনি চাদর মুড়ি দিতেন আর কখনও ফেলে দিতেন, এ অসাধারণ অস্থিরতার ভেতর হযরত আয়েশা (রাঃ) শুনতে পেলেন, পবিত্র মুখ থেকে একথা বের হচ্ছে, যে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও লা'নত–তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে ইবাদতগাহ্ বানিয়েছে।"

৬. কবরস্থানে গিয়ে ইছালে সওয়াব করবে এবং আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দোআ করবে। হযরত সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, জীবিত লোকেরা যেমন পানাহারের মুখাপেক্ষী অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিরাও দোআর অত্যন্ত মুখাপেক্ষী।

এক বর্ণনায় আছে যে আল্লাহ্ তাআলা বেহেশতে এক নেক্কার বান্দাহর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, সে বান্দাহ তখন জিজ্ঞেস করে, হে প্রতিপালক! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বাড়লো ? আল্লাহ বলেন, তোমার ছেলেদের কারণে, তারা তোমার জন্যে মাগফিরাতের দোআ করেছে।

কুসূফ ও খুসুফের আমল

১. সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ লাগলে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তা থেকে উদ্ধারের জন্যে দোআ করবে। তাসবীহ, তাহলীল ও দান খয়রাত করবে। এ সকল নেক আমলের বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আপদ-বিপদ দূর করে দেন।

"হযরত মুগীরাহ বিন শো'বাহ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সূর্য চন্দ্র আল্লাহর দু'টি চিহ্ন মাত্র। কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগে না, তোমরা যখন দেখবে যে, গ্রহণ লেগেছে তখন সূর্য চন্দ্র পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাকে ডাক, তার নিকট দোআ কর এবং নামায পড়।" *(মুসলিম)*

২. যখন সূর্য গ্রহণ লাগবে তখন মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করো, অবশ্য ঐ নামাযের জন্যে আযান ও ইক্বামত বলবে না, এভাবেই মানুষদেরকে অন্য উপায়ে একত্রিত করবে। যখন চন্দ্র গ্রহণ লাগবে তখন একাকী নফল নামায পড়বে জামাআতে পড়বে না।

৩. সূর্য গ্রহণের সময় যখন দু'রাকাত নফল নামায জামাআতের সাথে পড়বে তখন ক্বেরাআত দীর্ঘ করবে। সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকবে এবং ক্বেরাআত উচ্চস্বরে পড়বে।

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লাগলো। ঘটনাক্রমে ঐ দিন তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইব্রাহীম (রাঃ)-এরও ইন্তেকাল হয়। লোকেরা বলতে শুরু করলো যে, যেহেতু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে তাই সূর্য গ্রহণ লেগেছে। তখন রাসূল (সাঃ) লোকদের একত্রিত করলেন, দু'রাকআত নামায পড়লেন, এ নামাযে অত্যন্ত লম্বা ক্বিরাত পড়লেন সূরায়ে বাক্বারাহ সমতুল্য কুরআন পাঠ করলেন, রুকু সিজদাও অত্যন্ত দীর্ঘ সময় পড়লেন, নামায থেকে অবসর হলেন, ইত্যবসরে গ্রহণ ছেড়ে গেল।

অতঃপর তিনি লোকদের বললেন, চন্দ্র ও সূর্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দু'টি চিহ্ন এদের মধ্যে কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগে না। তোমাদের যখন এমন সুযোগ আসে তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো। প্রার্থনা করো, তাকবীর ও তাহলীলে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু যিকিরে) ব্যস্ত থাক, নামায পড় এবং ছদকা-খয়রাত করো। *(বুখারী মুসলিম)*

হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ বলেছেন, রাসূল (সাঃ) এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লাগলো। আমি মদীনার বাইরে তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি তীরগুলো ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, দেখব আজ এ দুর্ঘটনায় রাসূল (সাঃ) কি আমল করেন। সুতরাং আমি রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। দেখতে পেলাম তিনি নিজের দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহর হামদ ও তসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল এবং দোআ ফরিয়াদে ব্যস্ত আছেন। অতঃপর তিনি দু'রাকাত নামায পড়লেন, উভয় রাকআতে লম্বা লম্বা দুটি সূরাহ পাঠ করলেন এবং সূর্য পরিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নামাযে ব্যস্ত রইলেন।

সাহাবায়ে কেরামও কুসূফ[১] এবং খুসূফের নামায পড়তেন। একবার মদীনায় গ্রহণ লাগলো তখন হযরত আবদুল্লা বিন যোবাইর নামায পড়লেন, আরেকবার গ্রহণ লাগলো এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস লোকদেরকে একত্রিত করে জামাআতের সাথে নামায আদায় করলেন।

৪. কুসূফ নামাযের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা আনকাবুত আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে রূম পাঠ করবে। এ সূরাগুলো পাঠ করা সুন্নাত। অবশ্য জরুরী নয়। অন্য সূরাও পাঠ করা যায়।

৫. কুসূফের নামাযে যদি মহিলারা অংশগ্রহণ করতে চায়, আর তা যদি সহজও হয় তাহলে তাদেরকে শরীক করবে, শিশুদেরকে নামাযে শরীক হতে উৎসাহ দান করবে যেনো প্রথম থেকেই তাদের অন্তরে তাওহীদের শিক্ষা হয়ে যায় এবং তাওহীদ বিরোধী কোন চেতনাও তাদের অন্তরে স্থান না পায়।

৬. যে সকল সময়ে নামায পড়া শরীয়তে নিষিদ্ধ অর্থাৎ সূর্য উদয় অস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যদি সূর্য গ্রহণ হয় তাহলে নামায পড়বে না। অবশ্য যিকির ও তসবীহ পাঠ করবে এবং গরীব-মিসকীনদের মধ্যে ছদকা-খয়রাত করবে। সূর্য উদয় ও ঠিক দ্বিপ্রহরের পরও যদি গ্রহণ স্থায়ী হয় তাহলে ঐ সময় নামায পড়বে।

---

১. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ উভয়টিকে কুসুফ বলে। শুধু চন্দ্র গ্রহণকে খুসুফ বলে। খুসুফের বিপরীতে যখন কসুফ বলা হয় অথবা খুসুফের সাথে যখন কুসুফ বলা হয় তখন কুসুফ দ্বারা শুধু সূর্য গ্রহণ বুঝায়

১. রমযানুল মুবারকের উপযুক্ত মর্যাদাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে শা'বান মাসেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং শা'বান মাসের ১৫ তারিখের আগেই অর্থাৎ প্রথম পনের তারিখের মধ্যে অধিক পরিমাণে রোযা রাখবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) শা'বান মাসে অন্য সব মাস থেকে বেশী রোযা রাখতেন।

২. অত্যন্ত গুরুত্ব ও আগ্রহের সাথে রমযানুল মুবারকের চাঁদ দেখার চেষ্টা করবে। এবং চাঁদ দেখে এ দোআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

"আল্লাহ মহান! আয় আল্লাহ! এ চাঁদকে আমাদের জন্যে নিরাপদ ঈমান, শান্তি ও ইসলামের চাঁদ হিসেবে উপস্থাপন করো। যা তুমি ভালবাস ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট এ মাসে আমাদেরকে তা করার তওফীক দাও। (হে চাঁদ!) আমাদের প্রতিপালক ও তোমার প্রতিপালক একই আল্লাহ।"

৩. রমযান মাসে ইবাদতের সাথে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। ফরয নামায ব্যতীত নফল নামাযেও বিশেষ গুরুত্ব দেবে এবং বেশী বেশী নেকী অর্জনের চেষ্টা করবে। এ মহান ও প্রাচুর্যময় মাস আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান ও দয়ার মাস। শা'বানের শেষ তারিখে রাসূল (সাঃ) রমযান মাসের বরকতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ তোমাদের উপর এক মহান মর্যাদা ও বরকতপূর্ণ মাস আসছে যাতে এমনি একরাত আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। আল্লাহ তাআলা ঐ মাসের রোযা ফরয করে দিয়েছেন এবং রাত্রি জাগরণকে (তারাবীহ এর সুন্নাত) নফল করে দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি এ মাসে মনের আনন্দে নিজ ইচ্ছায় কোন একটি নেক আমল করবে সে অন্য মাসের ফরয আদায়ের সমতুল্য সওয়াব পাবে, যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে অন্য মাসের ৭০টি ফরয আদায় করার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন।

৪. সারা মাসের রোযা মনের আনন্দ, আগ্রহ ও গুরুত্বের সাথে রাখবে, যদি কখনও রোগের কারণে অথবা শরয়ী কোন ওযরবশতঃ রোযা রাখতে অক্ষম হও তা হলেও রমযান মাসের সম্মানে খোলাখুলি পানাহার থেকে বিরত থাকবে এবং এমন ভাব দেখাবে যেন রোযাদারের মত দেখায়।

৫. কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করবে। এ মাসের সাথে কুরআনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। পবিত্র কুরআন এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ হয়েছে এ মাসের প্রথম অথবা ৩য় তারিখে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ওপর কয়েকটি ছহীফা বা ছোট কিতাব অবতীর্ণ হয়। এ মাসের ১২ অথবা ১৮ তারিখে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওপর যব্বুর অবতীর্ণ হয়। এ বরকতময় মাসের ৬ তারিখে হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হয়। এ বরকতময় মাসেরই ১২ অথবা ১৩ তারিখে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এ মাসে বেশী বেশী পবিত্র কুরআন পাঠের চেষ্টা করবে। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রতি বছর এ মাসে রাসূল (সাঃ)-কে পূর্ণ কুরআন পাঠ করে শোনাতেন, রাসূল (সাঃ) থেকে শুনতেন এবং নবুওতের শেষ বছর তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে দু'বার পালাক্রমে শুনান ও শুনেন।

৬. পবিত্র কুরআন ধীরে ধীরে থেমে থেমে এবং বুঝে সুঝে পড়তে চেষ্টা করবে। অধিক তেলাওয়াতের সাথে সাথে বুঝার এবং ফল লাভেরও বিশেষ চেষ্টা করবে।

৭. তারাবীহের নামাযে পূর্ণ কুরআন শোনার চেষ্টা করবে। রমযান মাসে একবার পূর্ণ কুরআন শোনা সুন্নাত।

৮. তারাবীহের নামায বিনয়, মিনতি, আনন্দ, ধৈর্য্য ও আগ্রহের সাথে পড়বে, যেনতেন ভাবে বিশ রাকাআতের গণনা পূর্ণ করবে না বরং নামাযকে নামাযের মতই পড়বে যেনো জীবনের উপর ইহার ষোলআনা প্রভাব পড়ে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয় এবং আল্লাহ তাওফীক দিলে তাহাজ্জুদ পড়ারও চেষ্টা করবে।

৯. দান-খয়রাত করবে। গরীবদের, বিধবাদের এবং এতীমদের খোঁজ-খবর রাখবে, গরীবও অভাবীদের সাহরী ও ইফতারের ব্যবস্থা করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "রমযান সহানুভূতির মাস[১]।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) দানশীল ও দয়ালু তো ছিলেনই তবুও রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো অধিক বেড়ে যেতো। যখন জিব্রাঈল (আঃ) প্রতিরাতে এসে কুরআন পাঠ করতেন ও শুনতেন তখন তিনি ঐ সময় তীব্রগতি সম্পন্ন বাতাস থেকে তীব্র গতিময় দানশীল ছিলেন।

১০. শবেকদর বা সম্মানিত রাতে খুব বেশী নফল নামায পড়ার চেষ্টা করবে এবং কুরআন তেলাওয়াত করবে। এ রাতের গুরুত্ব হলো, এ রাতেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা ক্বদরে আল্লাহ পাক বলেন–

"নিশ্চয় আমি এ কুরআনকে লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করেছি। আপনি জানেন লাইলাতুল ক্বদর কি? লাইলাতুল ক্বদর হলো হাজার মাস থেকেও উত্তম। ঐ রাতে ফিরিশতাগণ ও জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্যে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা ফজর অর্থাৎ ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত অবস্থান করে।" *(ক্বদর)*

হাদীসে আছে যে, শবেক্বদর রমযানের শেষ দশ রাতের যে কোন এক বেজোড় রাতে (গোপন) আছে। সে রাতে এ দোআ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

"আয় আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমাকে ভালবাসেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, এক বৎসর রমযান সামনে রেখে রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের নিকট এমন একটি মাস আসছে যার মধ্যে এমন রাত আছে যা হাজার মাস থেকেও উত্তম, যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত থাকলো সে রাতের সকল প্রকার উত্তম ও প্রাচুর্য থেকে মাহরূম বা বঞ্চিত হলো। *(ইবনু মাজাহ)*

---

(১) অর্থাৎ গরীব ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সহানুভূতির দ্বারা অর্থনৈতিক ও মৌখিক উভয় প্রকার সহযোগিতা করাই আসল উদ্দেশ্য। তাদের সাথে কথাবার্তা ও আচরণে নম্র ব্যবহার করবে। কর্মচারীদের শ্রম লাঘব করে আরাম দেবে এবং আর্থিক সাহায্য দেবে।

১১. রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করবে, রাসূল (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন রাতে ইবাদত করতেন এবং তাঁর স্ত্রীদেরকেও ঘুম থেকে জাগাতেন এবং পূর্ণ উদ্যম ও আন্তরিক একাগ্রতার সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন।

১২. রমযান মাসে মানুষের সাথে অত্যন্ত নম্র ও দয়াপূর্ণ আচরণ করবে। কর্মচারীদের কাজ সহজ করে দেবে এবং মেটানোর চেষ্টা করবে। খোলা মনে তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে এবং ঘরের লোকদের সাথেও দয়া ও দানশীলতার আচরণ করবে।

১৩. অত্যন্ত বিনয়, খুশী ও আগ্রহের সাথে বেশী বেশী করে দোআ পাঠ করবে। "দুররে মানসুর" গ্রন্থে আছে যে, যখন রমযান আসতো তখন রাসূল (সাঃ)-এর স্বরূপ পরিবর্তন হয়ে যেতো, নামায বেশী বেশী পড়তেন, দোআয় অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করতেন এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়তেন।

১৪. ছাদক্বায়ে ফিতর আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আদায় করবে। ঈদের নামাযের আগেই ছাদকা আদায় করবে এবং এতটুকু আদায় করবে যে, অভাবী এবং গরীব লোকেরা যেন ঈদের জরুরী জিনিসপত্র যোগাড় করার সুযোগ পায় এবং তারাও যেন সকলের সাথে ঈদের মাঠে হাসিমুখে যেতে পারে আর ঈদের খুশীতে শরীক হতে পারে।

হাদীসে আছে যে, রাসূল (সাঃ) উম্মতের উপর ছদক্বায়ে ফিতর এজন্যে আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) করে দিয়েছেন যেন রোযাদার ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় যেসব অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে তার কাফ্ফারা হয়ে যায় এবং গরীব-মিসকীনদের খাদ্যের সংস্থান হয়। *(আবু দাঊদ)*

১৫. রমযানের বরকতময় দিনসমূহে নিজে বেশী বেশী নেকী অর্জনের সাথে সাথে অন্যকেও অত্যন্ত আবেগ ও উদ্বেগ, নম্রতা ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নেকী এবং ভাল কাজের দিকে উৎসাহিত করবে যাতে ভাল পরিবেশে আল্লাহর ভয়, উত্তম অভিরুচি ও ভাল কাজের প্রতি আকর্ষণ বিরাজ করে এবং সম্পূর্ণ সমাজ রমযানের অমূল্য বরকতের দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

রোযার আদব কায়দা ও নিয়ম-কানুন

১. রোযার বিরাট সওয়াব ও মহান উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ণ উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে রোযা রাখার চেষ্টা করবে, ইহা এমন একটি ইবাদত যার পরিপূরক অন্য কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ কারণেই সকল জাতির উপরই রোযা ফরয ছিল।

সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয় করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, তোমরা যেন মুত্তাকী হতে পারো। (বাকারাহ)

রাসূল (সাঃ) রোযার এ মহান উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"যে ব্যক্তি রোযা রেখেও মিথ্যা বলা, মিথ্যার উপর আমল করা ছেড়ে দেয়না এমন ব্যক্তির ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন–

"যে ব্যক্তি দৃঢ় ঈমান ও এহতেসাবের (১) সাথে রমযানের রোযা রাখল তার পেছনের সম্পূর্ণ গুনাহ খাতা মাফ করে দেয়া হবে। *(বুখারী)*

২. রমযানের রোযা খুব গুরুত্বের সাথে রাখবে, কোন রোগ অথবা শারীরিক কোন ওযর ব্যতীত কখনো রোযা ছাড়বে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোগ অথবা শরয়ী কোন ওযর ব্যতীত রমযানের একটি রোযা ত্যাগ করে তার সারা জীবনের রোযাও ঐ এক রোযার ক্ষতিপূরণ হবে না। *(তিরমিযি)*

৩. রোযার রিয়া ও লোক দেখানো থেকে বাঁচার জন্যে পূর্বের মত হাসি-খুশি ও সক্রিয়ভাবে নিজের কাজে লেগে থাকবে, নিজের চাল-চলনে কখনও রোযার দুর্বলতা ও অলসতা প্রকাশ করবে না।

---

(১) এহতেসাব শব্দের অর্থ হলো হিসাব-নিকাশ এখানে এহতেসাব দ্বারা বুঝানো হচ্ছে রোযা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের পুরস্কারের উদ্দেশ্যে রাখবে এবং ফাহেশা কথা ও কার্য থেকে বিরত থাকবে যদ্বারা রোযা বিফলে না যায়।

৪. রোযার মাসে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। কেননা, রোযার উদ্দেশ্যই হলো জীবনকে পবিত্র করা। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "রোযা ঢাল স্বরূপ, যখন তোমরা রোযা রাখ মুখে কোন নির্লজ্জ কথা বলোনা এবং হাঙ্গামা করো না। কেউ যদি গালাগালি করে বা ঝগড়া মারামারি করতে উদ্যত হয় তাহলে ঐ রোযাদারের বলা উচিৎ, আমি তো রোযাদার (আমি কিভাবে গালির উত্তর দিতে পারি অথবা ঝগড়া ফ্যাসাদ মারামারি করতে পারি?)"

(বুখারী ,মুসলিম)

৫. হাদীসসমূহে রোযার যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার আকাঙ্খা করবে, বিশেষতঃ ইফতারের নিকটবর্তী সময়ে দোয়া করবে যে, আয় আল্লাহ! আমার রোযা কবুল কর, আমাকে ঐ সকল সওয়াব ও পুরস্কার দান করো যা তুমি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছো।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ রোযাদার বেহেশতে এক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে দরজার নাম হলো 'রাইয়্যান'[১]। রোযাদারদের প্রবেশ করা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ঐ দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর আর কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন রোযা রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে এবং বলবে, হে প্রতিপালক! আমি এ রোযাদারকে দিনের বেলায় পানাহার ও অন্যান্য স্বাদের জিনিস থেকে বিরত রেখেছি। আয়

আল্লাহ! তুমি তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করো। আর অমনি আল্লাহ তাআলা তার সুপারিশ কবুল করবে।" *(মেশকাত)*

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, রোযাদার ইফতারের সময় যে দোআ করে তা কবুল করা হয়, রদ করা হয় না। *(তিরমিযি)*

৬. রোযার কষ্টকে হাসি মনে সহ্য করবে, ক্ষুধা অথবা পিপাসার কষ্ট অথবা দুর্বলতার অভিযোগ করে রোযার মর্যাদা ক্ষুন্ন করবে না।

৭. সফরে অথবা কঠিন রোগের কারণে রোযা রাখা সম্ভব না হলে ছেড়ে দেবে এবং অন্য সময় অবশ্যই তার ক্বাযা করবে।

---

(১) 'রাইয়্যান শব্দের অর্থ অদ্র, সতেজ ইত্যাদি। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, রাইয়্যান দরজা দিয়ে প্রবেশকারীগণ কখনও পিপাসাক্ত তৃষ্ণার্ত হয় না। *(তিরমিযী)*

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

"যে রুগ্ন অথবা সফরে থাকবে সে অন্য সময় অবশ্যই রোযার সংখ্যা পূর্ণ করবে।" *(আল-বাক্বারাহ-১০৪)*

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আমরা যখন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সফরে থাকতাম তখন আমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক রোযা রাখত আর কিছু রোযা রাখতো না। তবুও রোযাদাররা রোযা না রাখা লোকদের উপর আপত্তি করত না এবং রোযা না রাখা লোকেরাও রোযাদারদের উপর কোন অভিযোগ করতো না।" *(বুখারী)*

৮. রোযার মধ্যে গীবত ও কু-দৃষ্টি থেকে বিশেষভাবে বিরত থাকবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "রোযা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গণ্য এবং যে পর্যন্ত পরনিন্দা গীবত না করে। আর যখন সে কারো গীবত করে বসে তখন তার রোযার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। *(আদ্দাইলামী)*

৯. আগ্রহের সাথে হালাল রুজি অন্বেষণের চেষ্টা করবে। হারাম রুজি দ্বারা লালিত শরীরের কোন ইবাদতই (আল্লাহর দরবারে) কবুল হয় না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "হারাম রুযি দ্বারা গঠিত শরীর জাহান্নামেরই উপযুক্ত।" *(বুখারী)*

১০. সাহরী অবশ্যই খাবে, রোযা রাখা সহজ হবে এবং দুর্বলতা ও অলসতা সৃষ্টি হবে না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সাহরী খাবে, কারণ, সাহরী খাওয়াতে বরকত আছে।" *(বুখারী)*

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ "সাহরী খাওয়াতে বরকত আছে। কিছু পাওয়া না গেলে কমপক্ষে কয় ঢোক পানি পান করবে। সাহরী খানেওয়ালাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার ফিরিশতাগণ সালাম প্রেরণ করেন। *(আহমদ)*

তিনি বলেছেন ঃ "দুপুরে কিছুক্ষণ আরাম করে রাত্রি জাগরণের সুযোগ অর্জন করো এবং সাহরী খেয়ে দিনে রোযা রাখার শক্তি অর্জন করো। *(ইবনু মাজাহ)*

ছহীহ মুসলিমে আছে, রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ আমাদের ও পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য শুধু সাহরী ।

১১. সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ইফতারে দেরী করবে না। কেননা রোযার মূল উদ্দেশ্য হলো আনুগত্যের অভ্যাস সৃষ্টি করা, ক্ষুধা নয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানগণ যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন ভাল অবস্থায় থাকবে। *(বুখারী)*

১২. ইফতারের সময় এ দোআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ مسلم

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার জন্যে রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।" *(মুসলিম)*

রোযাদার ইফতার করার সময় এ দোআ পড়বে।

ذَهَبَتِ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

"পিপাসা দূর হলো শিরাগুলো সতেজ হলো, আল্লাহ চাইলে সওয়াবও অবশ্যই পাওয়া যাবে। *(আবু দাউদ)*

১৩. কারো বাড়ীতে ইফতার করলে এ দোআ পাঠ করবে।

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ـ

"তোমাদের এখানে রোযাদাররা ইফতার করুক! তোমাদের খাদ্য নেক লোকেরা গ্রহণ করুক এবং ফিরিশতারা রহমতের দোআ করুক!

(আবু দাউদ)

১৪. অন্যদেরও ইফতার করবার চেষ্টা করবে, এতে অনেক সওয়াব। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করায় তার প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সম্পূর্ণ গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দেন। ইফতার করালে রোযাদারের সমতুল্য সওয়াব পাবে। এতে রোযাদারের সওয়াবেও কোন ঘাটতি হবে না।" সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এত সম্পদ কোথায় আছে যে, রোযাদারকে ইফতার করাবো ? আর তাকে আহার করাবো ? তিনি বললেন, একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি বা দুধ দিয়ে ইফতার করানো যথেষ্ট।*(ইবনু মাজাহ)*

১. আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু দান করবে তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য যুক্ত করে নিজের পবিত্র আমলকে নষ্ট করবে না। এমন আকাঙ্খা কখনো রাখবে না যে, যাদেরকে দান করেছো তারা দানকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করবে অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, মুমিনগণ নিজের আমলের প্রতিদান বা পুরস্কার শুধু আল্লাহর নিকটই চায়। পবিত্র কুরআনে মুমিনের মনের আবেগ এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

"আমরা তোমাদের একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই খাওয়াচ্ছি, এজন্য তোমাদের প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না।"

২. লৌকিকতা, বাগাড়ম্বর ও লোক দেখানো কাজে বিরত থাকবে, রিয়া ভাল আমলকেও ধ্বংস করে দেয়।

৩. যাকাত প্রকাশ্যভাবে দেবে। যেনো অন্যের মধ্যেও ফরয আদায়ের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে অন্যান্য (নফল) সদকা গোপনে দেবে। আল্লাহর নিকট ঐ আমলেরই মূল্য আছে যা একান্ত আন্তরিকতার সাথে করা হয়। কিয়ামতের মাঠে যখন কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ নিজের ঐ বান্দাহকে আরশের নিচে ছায়া দান করবেন। যে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে আল্লাহর পথে দান করেছে। এমনকি তার বাম হাতও জানেনি ডান হাতে কি খরচ করেছে। *(বুখারী)*

৪. আল্লাহর পথে দান করার পর উপকারের কথা বলে বেড়াবে না আর যাদেরকে দান করা হয়েছে তাদেরকে কষ্টও দেবে না। দান করার পর অভাবগ্রস্ত ও গরীবদের সাথে তুচ্ছ আচরণ করা, তাদের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত হানা, তাদেরকে উপকারের কথা বলে বলে তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়া, এটা চিন্তা করা যে, তারা তার উপকার স্বীকার করবে, এবং তার সামনে নত হয়ে থাকবে, এগুলো অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। মুমিনের অন্তর এ ধরনের হওয়া উচিত নয়।

এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"হে মুমিনগণ! উপকারের কথা বলে গরীব-দুঃখীদের অন্তরে কষ্ট দিয়ে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ধ্বংস হয়ো না যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে।"

৫. আল্লাহর পথে দান করার পর অহংকার ও গৌরব করবে না। লোকদের ওপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করবে না বরং একথা চিন্তা করে সংশয় পোষণ করবে যে, আল্লাহর দরবারে এ দান কবুল হলো কি হলো না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"তারা দান করে, যাই দান করে বস্তুতঃ কখনো তাদের অন্তর এ জন্য ভীত যে, তারা তার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।"

৬. দরিদ্র ও অভাগ্রস্তদের সাথে নম্র আচরণ করবে, কখনো তাদেরকে ধমক দেবে না, তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে না, তাদের হীনতা প্রকাশ করবে না, ভিক্ষুককে দেবার মত কিছু না থাকলেও নম্র ও ভদ্র ব্যবহার দ্বারা অপারগতা প্রকাশ করবে যেন সে কিছু না পেয়েও দোআ দিতে দিতে বিদায় হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, তোমরা যদি তাদের থেকে বিমুখ হতো বাধ্য হও, তোমার প্রতিপালকের দয়ার আশায় তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেছেন, "ভিক্ষুককে ধমক দিও না।"

৭. আল্লাহর পথে উন্মুক্ত মনে ও আগ্রহের সাথে খরচ করবে। সংকীর্ণমনা, বিষণ্ন মন, জবরদস্তি ও জরিমানা মনে করে খরচ করবে না। ভাগ্যবান ও সফলকাম তারাই হতে পারে যারা কৃপণতা, সংকীর্ণতা হীনমন্যতা থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখতে পারে।

৮. আল্লাহর পথে হালাল মাল খরচ করবে। আল্লাহ শুধু হালাল ও পবিত্র মালই কবুল করেন। যে মুমিন আল্লাহর পথে দান করার আকাঙ্খা রাখে তার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে যে, তার রুজির বা মালের মধ্যে হারামের মিশ্রণ থাকবে?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,

"হে মুমিনগণ! (আল্লাহর পথে) তোমাদের হালাল রুজি থেকে ব্যয় করো।"

৯. আল্লাহর পথে উত্তম মাল ব্যয় করবে। আল্লাহ বলেন,

"তোমরা কখনো নেকী অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের অতীব প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে।"

ছদকা দেয়া মাল পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে জমা হচ্ছে, একজন মুমিন কি করে চিন্তা করতে পারে যে, তার চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সে খারাপ ও অকেজো মাল সঞ্চয় করবে?

১০. যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার পর দেরী না করে তাড়াতাড়ি আদায় করার চেষ্টা করবে এবং ভাল করে হিসেব করে দেবে, আল্লাহ্ না করুন যেন কিছু বাকী থেকে না যায়।

১১. যাকাত সামাজিকভাবে আদায় করবে এবং ব্যয়ও সামাজিকভাবেই করবে। যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে মুসলমানদের সমিতিসমূহ 'বাইতুল মাল' প্রতিষ্ঠা করে তার সৎ ব্যবস্থা করবে।

হজ্বের নিয়ম ও ফজিলতসমূহ

১. হজ্ব আদায় করার ব্যাপারে দেরী ও গড়িমসি করবে না। আল্লাহ তাআলা যখনই এ পছন্দনীয় ফরয কার্য সমাধা করার সুযোগ দান করেন তখন প্রথম সুযোগেই রওয়ানা হয়ে যাবে। জীবনের কোন ভরসা নেই যে, এ বৎসর থেকে অন্য বৎসর পর্যন্ত দেরী করতে পারবে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে–

"মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার যে, যারা তাঁর ঘর (বাইতুল্লাহ) পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ রাখে সে যেন বাইতুল্লাহর হজ্ব করে, আর যে এ হুকুমকে অস্বীকার করে, (তাদের জেনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীদেরও মুখাপেক্ষী নন।"

হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি হজ্ব করার ইচ্ছা করে তাকে তাড়াতাড়ি হজ্ব করা উচিত। কেননা, সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, তার উটনী হারিয়ে যেতে পারে এবং তার এমন কোন জরুরত এসে যেতে পারে যে, তার হজ্ব করা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। *(ইবনু মাজাহ)*

অর্থাৎ সামর্থ্য হবার পর অনর্থক দুমনা করা উচিত নয়, একথা কারোর জানা নেই যে, আগামীতে এ সকল উপকরণ, সামর্থ্য ও সহজলভ্যতা থাকবে কি থাকবে না। আল্লাহ্ না করুন আবার বাইতুল্লাহর হজ্ব থেকে মাহরূমই থেকে যেতে হয়। আল্লাহ প্রত্যেক মুমিন বান্দাহকে মনস্থির করার সুযোগ দেন। রাসূল (সাঃ) এ জাতীয় লোকদেরকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সাবধান করে দিয়েছেন। হাদীছে আছে—

"যে ব্যক্তিকে কোন রোগে অথবা কোন আবশ্যক অথবা কোন জালীম শাসক বাধা দেয়নি অথচ সে এতদসত্ত্বেও হজ্ব করেনি তা হলে সে ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে মরুক সেটা তার ইচ্ছা।" *(সুনানে কুবরা–৪)*

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করেনি, আমার ইচ্ছা হয় যে, তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করি, কারণ সে মুসলমান নয়, সে মুসলমান নয়।

২. আল্লাহর ঘরের যিয়ারত ও হজ্ব শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করবে, অন্য কোন দুনিয়াদারির উদ্দেশ্যে পবিত্র উদ্দেশ্যকে মলিন করবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

"যারা তাদের প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মানিত ঘরের দিকে যাচ্ছে তাদেরকে বিরক্ত করো না।" *(আল-বাক্বারাহ)*

"শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হজ্ব ও ওমরাহ সম্পূর্ণ কর।" *(আল-বাক্বারাহ)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'হজ্বে মাবরুর'১-এর প্রতিদান বেহেশত থেকে কম নয়। (মুসলিম)

৩. হজ্বে যাওয়ার কথা প্রচার করবে না, চুপে চুপে চলে যাবে এবং আসবে। প্রচার প্রপাগাণ্ডা এবং লোক দেখানোমূলক সন্দেহযুক্ত রসম রেওয়াজ ও রীতিনীতি থেকে দূরে থাকবে, এমনিভাবে প্রতিটি আমল তো আমলে ছালেহ ও আমলে মকবুল হওয়ার জন্যে আমলের মধ্যে কোন প্রকার প্রবৃত্তির আকাঙ্খার মিশ্রণ ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া জরুরী। তাছাড়া বিশেষ করে হজ্ব-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী এ জন্য যে, ইহা আধ্যাত্মিক বিপ্লব, আত্মা ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির শেষ চিকিৎসা, যে আধ্যাত্মিক রোগী এর পরিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বারা আরোগ্য লাভ না করতে পারলো অন্য কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বারা আরোগ্য লাভ তার জন্য সহজ নয়।

৪. হজ্বে যাওয়ার সামর্থ্য না হলেও আল্লাহর ঘর যিয়ারতের আশা, রাসূল (সাঃ)-এর রওজা পাকে সালাম ও দরূপ পেশের আকাঙ্খা ও হজ্ব থেকে সৃষ্ট ইবরাহীম (আঃ)-এর আন্তরিক আবেগ এবং উদ্যম দ্বারা নিজের বক্ষকে উন্নত সমৃদ্ধ ও আলোকময় রাখবে।

হজ্ব ও ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ মেহমান, তারা আল্লাহর নিকট দোআ করলে তা আল্লাহ কবুল করেন এবং মাগফিরাতের দোআ করলে আল্লাহ মাফ করে দেন। *(তিবরানী)*

---

১. একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে হজ্বের সর্বপ্রকার নিয়ম-নীতি ও শর্তসমূহ পালন পূর্বক যে হজ্ব করা হয় তাকে 'হজ্বে মাবরুর' বলে।

৫. হজ্বের জন্যে উত্তম পাথেয় সাড়ম্বরে নিয়ে যাবে। উত্তম পাথেয় হলো তাক্বওয়া, এ পবিত্র সফরে আল্লাহর নাফরমানী থেকে রক্ষা পেতে এবং আল্লাহর দান ও বরকত দ্বারা ধন্য হতে পারবে সে সকল বান্দাহই যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মহব্বতের আবেগ রাখে। পবিত্র কুরআনে আছে-

"পাথেয় সংগ্রহ কর, উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি।"

৬. হজ্বের ইচ্ছা করা মাত্রই হজ্বের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দেবে। হজ্বের ইতিহাসকে স্মরণ করে পুরানো ইতিহাসকে নবরূপ দান করবে এবং হজ্বের এক একটি রুকন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করবে, আল্লাহর দীন এবং হজ্জের এ সকল আরকান দ্বারা মুমিন বান্দাহর অন্তরে যে সব আকর্ষণ সৃষ্টি করতে চায় ঐগুলো বুঝার চেষ্টা করবে। তারপর একজন বোধশক্তি সম্পন্ন মুমিন হিসেবে পূর্ণ একীনের সাথে হজ্বের রুকনসমূহ আদায় করে এ সকল মূলতত্ব অনুধাবন করা ও তদনুযায়ী নিজের জীবনে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করবে, যে কারণে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আল্লাহকে তেমনিভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্যে তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন এবং তোমরা তো এর পূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"

এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের ঐ সকল অংশ গভীর দৃষ্টিতে পাঠাভ্যাস করবে যে সকল অংশে হজ্বের মূলতত্ব, গুরুত্ব ও হজ্বের দ্বারা সৃষ্ট আকর্ষণসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে, এতদ উদ্দেশ্যে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ এবং ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করা যেগুলোতে হজ্বের ইতিহাস ও হজ্বের রুকনসমূহের মূলতত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৭. হজ্বের সময় পাঠের জন্যে হাদীসের কিতাবসমূহে যে সকল দোআ পাওয়া যায় ঐগুলো মুখস্ত করে নেবে এবং রাসূল (সাঃ)-এর ভাষায় আল্লাহর কাছে তাই চাইবে যা তিনি পূর্বেই চেয়েছিলেন।

৮. হজ্বের পরিপূর্ণ হেফাজত করবে এবং খেয়াল রাখবে যে, আমার হজ্ব ঐ সকল দুনিয়া পূজারীদের হজ্বের ন্যায় না হয়ে যায় যাদের জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। কেননা, তারা পরকাল থেকে চোখ বন্ধ করে

সবকিছু দুনিয়ার জন্যই চায়, তারা যখন বাইতুল্লাহে পৌঁছে তখন তারা এরূপ দোআ করে "আমাদের প্রতিপালক আমাদের যা দেবার দুনিয়াতেই তা দাও। আল্লাহ বলেনঃ আর তাদের জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই।"

হজ্বের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য ও সফলতা অন্বেষণ কর। আল্লাহর কাছে দোআ করো, আয় আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে এ জন্যে এসেছি যে, তুমি আমাকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে সফলকাম ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করো। আর সর্বদা এ দোআ পাঠ করতে থাক,

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ (البقرة)

"আয় আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়ায়ও উপকার করো এবং পরকালেও উপকার কর এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। *(আল-বাক্বারাহ)*

৯. হজ্বের সময় আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে এমন কাজ করবে না, কেননা হজ্বের সময় আল্লাহর ঘরে আল্লাহর মেহমান হিসেবে গিয়েছ। আল্লাহর সাথে ইবাদতের চুক্তিপত্র নবায়ন করতে গিয়েছ, হজ্বরে আসওয়াদে হাত রেখে তুমি যেন আল্লাহর হাতে হাত রেখে চুক্তি করছো আর উহাতে (হজ্বরে আসওয়াদে) চুমু খেয়ে যেন আল্লাহর আস্তানায় চুমু খাচ্ছো। বারবার তাকবীর ও তাহলীল সমৃদ্ধ আওয়াজে তুমি যেন প্রভু ভক্তির প্রকাশ করছো। এমতাবস্থায় চিন্তা কর। সাধারণ একটি পাপের ও ভুলের মিশ্রণও কত বড় মারাত্মক ও ন্যক্কারজনক কাজ। আল্লাহ নিজ দরবারে উপস্থিত প্রত্যাশী বান্দাহদেরকে হুঁশিয়ার করে বলছেন, 'ওয়ালা ফুসুফা' সাবধান! (এ দরবারে আসতে আল্লাহর) "নাফরমানী সুলভ কোন কথা বা কাজ করবে না।"

১০. হজ্বের সময় ঝগড়া ফ্যাসাদ ও লড়াই বিবাদের কথা ও কর্ম ত্যাগ করবে। সফরের সময় যখন স্থানে স্থানে ভীড় হয়, কষ্ট হয়, কদমে কদমে স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে, কদমে কদমে আবেগে আঘাত লাগে এমতাবস্থায় আল্লাহর মেহমানের কাজ হলো, সে উন্মুক্ত মনে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেবে এবং প্রত্যেকের সাথে ক্ষমা, মার্জনা ও দাতাসুলভ ব্যবহার করবে। এমনকি চাকরকেও ধমক দেবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ — হজ্বে লড়াই ঝগড়ার কথা হবে না।

১১. হজ্বের সময় কামোদ্দীপক কথাবার্তা বলবে না। সফরের সময় যখন আবেগে উত্তেজিত এবং দৃষ্টি এলোমেলো হবার বেশী আশংকা দেখা দেয় তখন অধিক সাবধান হয়ে যাও এবং দুষ্টাত্মা শয়তানের দুষ্টামী থেকে বাঁচার জন্যে চেষ্টা করবে। স্ত্রী যদি সাথে থাকে তা হলে তার সাথে শুধু বিশেষ সংশ্রব থেকেই বিরত থাকবে না এমনকি কামভাবের উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এরূপ আচার-আচরণ থেকেও বিরত থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে সাবধান করে বলেন,

"হজ্বের মাসসমূহ সকলেরই জানা, যে ব্যক্তি এ নির্ধারিত মাসসমূহে হজ্বের নিয়ত করেছে তাকে কামভাব উত্তেজনা আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।" *(আল বাক্বারাহ-১৯৭)*

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার এ ঘর যিয়ারত করতে এসেছে এবং নির্লজ্জতা ও কামভাব উত্তেজক কথাবার্তা থেকে বিরত রয়েছে এবং পাপাচার ও অন্যায় আচরণ করেনি সে এমন পাক পরিষ্কার হয়ে বাড়ী প্রত্যবর্তন করে যেমন সে মায়ের পেট থেকে পাক পরিষ্কার হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। *(বুখারী ,মুসলিম)*

১২. আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে পুরোপুরি সম্মান করবে। কোন আধ্যাত্মিক ও গোপনীয় মূলতত্ত্বকে অনুভব করার এবং স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে যা চিহ্ন হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাকে 'শায়ীরাহ' বলে। 'শাআ'য়ের' হলো তার বহুবচন। হজ্বের ধারায় প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন মূলতত্ত্বকে অনুভব করার জন্যে চিহ্ন হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ সকল বস্তুকে অবশ্যই সম্মান করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে এবং সম্মানিত মাস সমূহকে এবং কোরবানীর বস্তুকে, যে সকল জন্তুকে গলায় পট্টি বেঁধে কোরবানীর জন্যে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে সেগুলোকে, আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির ও মাহাত্ম্য লাভের অন্বেষায় বাইতুল হারাম বা খানায়ে কা'বা যিয়ারতের মনস্থ করেছে তাদেরকে অসম্মান করো না।" *(আল মায়েদাহ)*

সূরায়ে হজ্বে আছে–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করে সেটা নিশ্চয়ই তার অন্তরে আল্লাহ্ ভীতির পরিচয় বা নিদর্শন।"

১৩. হজ্বের রুকনসমূহ আদায়কালে অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা, নিঃসহায় ও নিঃসম্বলতা প্রকাশ করবে, আল্লাহর নিকট বান্দাহর বিনয়তা ও অসহায়তা বেশী পছন্দনীয়। রাসূল (সাঃ)-কে কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হাজী কে? তিনি উত্তরে বললেন, 'যার চুল বিক্ষিপ্ত ময়লা হয় এবং ধূলা মাটিতে ভরা হয়।"

১৪. ইহরাম বাঁধার পর, প্রত্যেক নামাযের পর, প্রত্যেক উঁচুস্থানে উঠার সময়, নিচের দিকে নামার সময়, প্রত্যেক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করার সময় প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে জেগে উচ্চঃস্বরে তালবীয়া পাঠ করবে। তালবীয়া এই–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ مشكوة ـ

"আমি উপস্থিত, আয় আল্লাহ! আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য এবং সকল নেয়ামত তোমারই, বাদশাহী তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।"

১৫. আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয়ে তওবা ও এস্তেগফার করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন-

"অতঃপর তোমরা (মক্কাবাসীগণ) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করো, সেখান থেকে অন্যান্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, আর আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

(আল বাক্বারাহ)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

আল্লাহ তাআলার নিকট আরাফাতের দিন সকল দিন থেকে উত্তম। এ দিন দুনিয়া ও আসমানের বিশেষভাবে তাওয়াজ্জুহ প্রকাশ করে ফিরিশতাদের সম্মুখে নিজের হাজী বান্দাহদের বিনয় ও নম্রতার উপর গৌরব করে ফিরিশতাদেরকে বলেন, ফিরিশতাগণ! তোমরা দেখ, আমার বান্দারা প্রচণ্ড খর রৌদ্রতাপে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, এরা বহু দূর থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, আমার রহমতের আশা তাদেরকে এখানে উপস্থিত করেছে, বস্তুতঃ তারা আমার আযাব দেখেনি' (আল্লাহ) এ গৌরব প্রকাশের লোকদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রেহাই দেয়ার হুকুম প্রদান করেন। আরাফাতের দিন এত লোককে মাফ করে দেন যে, এত লোককে আর কোন দিন মাফ করা হয় না। *(ইবনু হাব্বান)*

১৬. মিনায় পৌছে কোরবানী করবে, যেভাবে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম (আঃ) নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। কোরবানীর এ আবেগসমূহকে নিজের মন ও মস্তিষ্কের উপর এভাবে প্রভাবিত করবে যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরবানী পেশ করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে ও জীবন বস্তুতঃ এ চুক্তির বাস্তব উদাহরণ হয়ে যাবে যেঃ-

إِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্যে যিনি সারা জগতের প্রতিপালক, তাঁর কোন শরীক নেই।" (আল কুরআন)

১৭. হজ্জের দিনসমূহ সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকবে এবং অন্তরকে কখনো এ স্মরণ থেকে অমনোযোগী হতে দেবে না। আল্লাহকে স্মরণই প্রত্যেক ইবাদতের মূল বস্তু। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ "গণনার এ কয়েক দিন আল্লাহকে স্মরণ করো।" *(আল বাক্বারাহ)*

তিনি আরো বলেছেন-

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

"অতঃপর তোমরা যখন হজ্জের সব রুকন আদায় করলে তখন তোমরা পূর্বে এ সময় যেমন তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে এখন তদ্রূপ আল্লাহকে স্মরণ কর, আরো বেশী করে স্মরণ করো।"

হজ্জের রুকন সমূহের উদ্দেশ্যই হলো এ সকল দিনে নিয়মিত আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকা এবং সকল দিনে আল্লাহর স্মরণ এভাবে অন্তরে দাগ কেটে যায় যেন পুনরায় জীবনের আত্মগর্ব বা আত্ম-অহংকার ও টানাটানির মধ্যেও কোন বস্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করতে না পারে। অন্ধকার যুগে লোকেরা পূর্বের প্রথা অনুযায়ী হজ্জ আদায় করার পর মক্কায় একত্রিত হয় নিজেদের বাপ-দাদাদের গৌরব বর্ণনা করতো এবং অহংকার করতো। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন যে, এ সকল দিন আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করো এবং গৌরব বর্ণনা করো তাঁর যিনি প্রকৃতপক্ষে গৌরবময়।

১৮. আল্লাহর ঘরের ভক্তের মত তাওয়াফ করবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা উচিত।"

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন বান্দাহদের জন্যে ১২০টি রহমত নাযিল করেন, তন্মধ্যে তাওয়াফকারীদের জন্যে ৬০ রহমত, সালাত আদায়কারীদের জন্যে ৪০ রহমত এবং যারা শুধু বাইতুল্লাহর প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন তাদের জন্যে ২০ রহমত।" *(বায়হাকী)*

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন-

"যে ব্যক্তি ৫০ বার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেছে সে গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়েছে যে, যেনো তার মা তাকে আজই প্রসব করেছে।" *(তিরমিযি)*

সামাজিক সৌন্দর্যের বিধান

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার

১. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, এ উত্তম ব্যবহারের সুযোগ উভয় জাহানের জন্যে সৌভাগ্য মনে করবে, আল্লাহর পর মানুষের ওপর সব চাইতে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। মাতা-পিতার অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর অধিকারের সাথে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশের সাথে সাথে মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশও দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

"আর তোমার প্রতিপালক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" *(সূরায়ে বনী ইসরাইল)*

"হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন, একদা রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? রাসূল (সাঃ) বললেন, নামায সময় মত পড়া। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এর পর কোন কাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এর পর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত আবদুল্লাহ বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলা আরম্ভ করলো আমি আপনার সাথে হিজরত ও জিহাদের জন্যে বাইয়াত করছি। আর আল্লাহর নিকট এর সওয়াব চাই। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ কি জীবিত

আছেন? সে বলল, জ্বী, হ্যাঁ, তাদের উভয়ই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি সত্যি আল্লাহর নিকটে তোমার হিজরত ও জিহাদের পুরস্কার চাও? সে বলল, জ্বী, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার চাই। রাসূল (স্যাঃ) বল্লেন "যাও, তোমার মাতা-পিতার খেদমতে থেকে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।" *(মুসলিম)*

হযরত আবু উমামা বলেছেন, "এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার? তিনি বললেন, "তারাই তোমার বেহেশত এবং তারাই তোমার দোযখ।" *(ইবনু মাজাহ)*

অর্থাৎ তুমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে বেহেশতের অধিকারী হবে এবং তাদের অধিকারসমূহকে পদদলিত করে দোযখের ইন্ধনে পরিগণিত হবে।

২. মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ভদ্রতা প্রধান কর্তব্য এবং ইহা প্রকৃত সত্য যে, আমাদের অস্তিত্বের বাহ্যিক অনুভূতির কারণ হলো মাতা-পিতা। অতঃপর তাদের লালন-পালন থেকে আমরা লালিত-পালিত হয়ে বড় হই এবং বোধ জ্ঞান সম্পন্ন হই। তাঁরা যে অসাধারণ ত্যাগ, অনুপম চেষ্টা ও অত্যন্ত ভালবাসার সাথে আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তার দাবী হলো, আমাদের বক্ষস্থল তাঁদের আন্তরিক ভরসা মাহাত্ম্য ও ভালবাসায় মশগুল থাকবে এবং অন্তরের প্রতিটি তন্ত্রী তাদের কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা নিজের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ দিয়েছেন -

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَا لِدَيْكَ ـ

"আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং মাতা-পিতারও। *(লোকমান)*

৩. মাতা-পিতাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। তাদের ইচ্ছা ও মেজাজের বিপরীত এমন কোন কথা বলবে না যা দ্বারা তারা তাদের অন্তরে ব্যথা পায়। বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় যখন তাদের মেজাজ বা স্বভাব খিটখিটে হয়ে যায়, তখন মাতা-পিতা এমন কিছু দাবী করে বসে যে, যা অবাস্তব। এমতাবস্থায় তাদের প্রতিটি কথা সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করবে এবং তাদের কোন কথায় বিরক্ত হয়ে এমন বলবে না যা দ্বারা তাদের অন্তরে ব্যথা পায় এবং তাদের আবেগে আঘাত লাগে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন–

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ـ

"তাঁদের একজন বা উভয়জন যদি তোমার কাছে বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তখন তাদের আচরণে রাগ করে উহ্ করবে না এবং তাদেরকে ধমকও দেবে না।"

মূলতঃ এ বয়সে কথা সহ্য করার শক্তি থাকে না, দুর্বলতার কারণে নিজের গুরুত্ব প্রাধান্য পায়, এর ফলে সাধারণ কথাও কর্কশ অনুভূত হয়, সুতরাং এ নাজুক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নিজের কোন কথা বা কাজে মাতা-পিতাকে অসন্তুষ্টই হবার সুযোগ দেবে না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" *(তিরমিযি, ইবনে হাব্বান, হাকেম)*

অর্থাৎ—কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায় সে যেন পিতাকে সন্তুষ্ট করে, পিতাকে অসন্তুষ্ট করলে সে আল্লাহর গযব ও আযাব ডেকে আনে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মাতা-পিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে হিজরতের ওপর বাইয়াত করার জন্যে উপস্থিত হলো। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ যাও তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও, তাদেরকে তেমনিভাবে সন্তুষ্ট করে এসো যেমনিভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছিলে। *(আবু দাউদ)*

৪. মনে প্রাণে মাতা-পিতার খেদমত করবে। আল্লাহ যদি তোমাকে এ সুযোগ দিয়ে থাকেন তা হলে তোমাকে যেন এ তাওফীক দান করেছেন যে, তুমি নিজেকে বেহেশতের অধিকারী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী করতে পার। মাতা-পিতার খেদমত দ্বারাই ইহকাল ও পরকালের পুণ্য, সৌভাগ্য এবং মহত্ব অর্জিত হয় এবং উভয় জগতের বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার বয়স এবং জীবিকা বাড়াতে চায় সে যেন তার মাতা-পিতার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে।"

(আত্‌তারগীব ওয়াততারহীব,

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "সে ব্যক্তি অপমানিত হোক, আবার সে অপমানিত হোক এবং আবার সে অপমানিত হোক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে ব্যক্তি? তিনি উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথবা তাদের কোন একজনকে পেলো–তারপরও (তাদের খেদমত করে) বেহেশতে প্রবেশ করতে পারেনি।" *(মুসলিম)*

এক জায়গায় তো তিনি মাতা-পিতার খেদমতকে জিহাদের মত মহান ইবাদতের সাথেও স্থান দিয়েছেন এবং এক সাহাবীকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত করে মাতা-পিতার খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে জিহাদে শরীক হবার উদ্দেশ্য প্রকাশ করলো। রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছে? সে উত্তর দিল, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যাও আগে তাদের খেদমত করতে থাক, এটাই তোমার জিহাদ। *(বুখারী, মুসলিম)*

৫. মাতা-পিতাকে আদব এবং সম্মান করবে এবং এমন কোন কথা বা কাজ করবে না যার দ্বারা তাদের সম্মানের হানি হয়।

وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا "তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে।

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি চান যে, দোযখ থেকে দূরে থাকুন এবং বেহেশতে প্রবেশ করুন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই! হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) আবারও জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মাতা-পিতা কি জীবিত আছে? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, জ্বী, হ্যাঁ, আমার মাতা-পিতা জীবিত আছে। ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি যদি তাঁদের সাথে নম্র ব্যবহার করেন তাঁদের খোরপোষের দিকে খেয়াল রাখেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বেহেশতে প্রবেশ করবেন। তবে শর্ত হলো যে, কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে হবে।" *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

৬. মাতা-পিতার সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন– وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ "তাদের (মাতা-পিতার) সাথে বিনয় ও নম্রতাসুলভ আচরণ করবে।

বিনয় ও নম্র ব্যবহারের অর্থ হলো সব সময় তাঁদের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখবে, কখনো তাদের সামনে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করবে না এবং তাঁদের মর্যাদা হানিকর কোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।

৭. মাতা-পিতাকে ভালবাসবে এবং তাদেরকে নিজের সৌভাগ্য ও পরকালে পুরস্কার লাভের জন্য মনে করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

"যে নেক সন্তান মাতা-পিতার প্রতি একবার ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকাবে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদানে তাকে একটি মকবুল হজ্বের সওয়াব দান করবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। কেউ যদি দয়া ও ভালবাসার সাথে একদিনে একশতবার দেখে? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ, কেউ যদি একশতবার এরূপ করে তবুও। আল্লাহ তোমাদের ধারণা থেকে অনেক প্রশস্ত এবং সংকীর্ণতা থেকে পবিত্র।" *(মুসলিম)*

৮. মনে-প্রাণে মাতা-পিতার আনুগত্য করবে। এমনকি তারা যদি কিছুটা সীমালংঘনও করে তবুও সন্তুষ্টচিত্তে তাদের আনুগত্য করবে, তাদের মহান উপকারসমূহের কথা চিন্তা করে তাদের কোন দাবী যদি তোমার রুচি ও স্বভাব বিরোধী হয় তবুও তা সন্তুষ্টচিত্তে পূরণ করবে, তবে তা দীনি বিধানসম্মত হওয়া চাই।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়ামনের এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলো, রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামনে তোমার কেউ আছে ? লোকটি উত্তর দিল, আমার মাতা-পিতা আছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছে কি? সে বলল, না, তিনি বললেন, আচ্ছা, তা হলে তুমি ফিরে যাও এবং মাতা-পিতার কাছ থেকে অনুমতি নাও। তারা যদি অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে জিহাদে শরীক হবে নতুবা তাদের খেদমত করতে থাক। *(আবু দাউদ)*

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় ভোর করলো যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে মাতা-পিতা সম্পর্কে বর্ণিত নির্দেশগুলো ঠিক ঠিক পালন করেছে তা হলে সে এমন অবস্থায় ভোর করেছে যে, তার জন্যে বেহেশতের দু'টি দরজা খোলা হলো। আর মাতা-পিতার মধ্য থেকে একজন জীবিত থাকলে

খোলা হলো এক দরজা। আর যে ব্যক্তি এ অবস্থায় ভোর করলো যে, তার মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে এমন অবস্থায় ভোর করলো যে, তার জন্যে দোযখের দুটি দরজা খোলা এবং মাতা-পিতার মধ্য থেকে একজন জীবিত থাকলে দোযখের একটি দরজা খোলা হলো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আয় আল্লাহর রাসূল! মাতা-পিতা যদি তার সাথে সীমা অতিক্রম করে তবুও কি? আল্লাহর রাসূল বললেন, তবুও। যদি সীমা অতিক্রম করে তবুও। যদি সীমা অতিক্রম করে তবুও। *(মেশকাত)*

৯. মাতা-পিতাকে তোমার ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক মনে করবে এবং তাদের জন্যে খরচ করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

"লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কিসে খরচ করবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, যা খরচ করবে তার প্রথম হকদার হল মাতা-পিতা।" *(সূরা বাকারা)*

একবার রাসূল (সাঃ) এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে তার মাতা-পিতার সম্পর্কে ফরিয়াদ করলো যে, সে যখন ইচ্ছে তখনই আমার ধন-সম্পদ নিয়ে নেয়। রাসূল (সাঃ) তার পিতাকে ডেকে পাঠালো। এক বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। আল্লাহর রাসূল তাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে বলা শুরু করলো ঃ

"আয় আল্লাহর রাসূল! এমন এক সময় ছিল যখন এ ছেলে ছিল দুর্বল ও অসহায়, আমি ছিলাম শক্তিমান। আমি ছিলাম ধনী আর এ ছিল শূন্য হাত। আমি কখনও আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল আর এ শক্তিশালী। আমি শূন্য হাত আর এ ধনী। এখন সে তার সম্পদ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে।

বৃদ্ধের এ সকল কথা শুনে দয়াল নবী কেঁদে দিলেন আর বৃদ্ধের ছেলেকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি এবং তোমার ধন-সম্পদ সবই তোমার পিতার।"

১০. মাতা-পিতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের সম্মান সম্ভাষণ ও খেদমত করতে থাকবে। তবে সে যদি শির্ক ও গুনাহের নির্দেশ দেয় তাহলে তাদের আনুগত্য অস্বীকার করবে এবং তাদের কথা বা নির্দেশ পালন করবে না।

"মাতা-পিতা যদি কাউকে আমার সাথে শরীক করার জন্যে চাপ প্রয়োগ করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তাদের কথা কখনও মানবে না আর পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" *(সূরা লুকমান)*

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর জীবিতাবস্থায় আমার মাতা মুশরিক থাকা কালীন আমার নিকট আসে, আমি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে আরজ করলাম, "আমার মাতা আমার নিকট এসেছে অথচ সে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন। সে ইসলামকে ঘৃণা করে, এমতাবস্থায়ও কি আমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো? রাসূল (সাঃ) বললেন, অবশ্যই তুমি তোমার মায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে থাকো।" *(বুখারী)*

১১. মাতা-পিতার জন্যে নিয়মিত দোআ করতে থাকবে, তাদের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে দোআ করবে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আন্তরিক আবেগের সাথে তাদের দয়া ও ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবে।

আল্লাহ পাক বলেন–

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

"আর এ দোআ কর, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেমনি তারা আমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করেছিল।"

অর্থাৎ- হে প্রতিপালক! শৈশবকালে নিরুপায় অবস্থায় তারা যেভাবে আমাকে দয়া ও করুণা, চেষ্টা তদবীর, এবং মহব্বত ও ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছে এবং আমার জন্যে তাদের সুখ শান্তি পরিহার করেছে, আয় আল্লাহ! এখন তারা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও নিরুপায় হয়ে আমার থেকে বেশী দয়া ও করুণার মুখাপেক্ষী, আয় আল্লাহ! আমি তাদের প্রতিদান দিতে সক্ষম নই। তুমিই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করো এবং তাদের দুরাবস্থার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করো।

১২. মায়ের খেদমতের দিকে খেয়াল রাখবে বিশেষভাবে। মা স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল ও অনুভূতিশীল হয়ে থাকে। তিনি সেবা-যত্ন ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশী মুখাপেক্ষী, আবার তাঁর অনুগ্রহ ও ত্যাগ পিতার তুলনায় অনেক বেশী, অতএব ইসলাম মায়ের অধিকার বেশী দান করেছেন এবং মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

"আমি মানুষদেরকে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে পেটে ধারণ করেছে, প্রসবকালে কষ্ট করেছে, পেটে ধারণ এবং দুধ পানের এ সময় হলো ত্রিশ মাস।" *(সূরায়ে আহকাফ)*

পবিত্র কুরআনে মাতা এবং পিতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে বিশেষভাবে পর্যায়ক্রমে মায়ের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার চিত্রগুলো প্রভাব বিস্তারকারী দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানবিক দিক থেকে এ সত্য উদঘাটন করেছেন যে, প্রাণ উৎসর্গকারিণী মাতা, পিতা থেকে আমাদের খেদমত ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী অধিকারিণী আবার রাসূল আকরাম (সাঃ) এ সত্যকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সব থেকে বেশী অধিকারী কোন ব্যক্তি ? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মাতা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, তোমার মাতা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করলো আবার কে? হুযুর (সাঃ) বললেন, তোমার মাতা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত জাহেমাহ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ইচ্ছা যে আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবো, এখন এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য আপনার নিকট এসেছি বলুন কি নির্দেশ? রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা জীবিত আছেন? জাহেমাহ (রাঃ) বললেন, জ্বী, জীবিত আছেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, তাহলে ফিরে যাও, তার খেদমতে লেগে থাকো, কারণ বেহেশত তাঁর পায়ের নিচে। *(ইবনে মাজাহ, নাসায়ী)*

হযরত ওয়াইস্ ক্বরণী (রহঃ) রাসূল (সাঃ)-এর যুগে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষাত পেয়ে ধন্য হতে পারেন নি। তার এক বৃদ্ধা মাতা ছিলেন, রাতদিন তাঁর খেদমতে লেগে থাকতেন। তার নবী করীম (সাঃ)-কে দেখার বড়ই আকাংখা ছিল। সুতরাং হযরত ওয়াইস্ ক্বরণী (রহঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সাথে দেখা করতে আসতেও অনুমতি চেয়েছিল। রাসূল (সাঃ) নিষেধ করলেন। হজ্ব পালনেরও তার অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যতদিন তাঁর মা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁকে একাকী রেখে যাওয়ার চিন্তায় হজ্ব করেননি। তার মৃত্যুর পরই এ আগ্রহ পূরণ করেন।

১৩. দুধ মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাঁর খেদমত করবে এবং তাকে সমান মর্যাদা দান করবে।

হযরত আবু তোফাইল (রাঃ) বলেন, আমি জে'রানা নামক স্থানে দেখতে পেলাম যে, রাসূল (সাঃ) গোস্ত বন্টন করছেন। এমতাবস্থায় এক বৃদ্ধা এসে রাসূল (সাঃ)-এর একেবারে নিকটে চলে গেলেন। তিনি তার বসার জন্যে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন, তিনি তার ওপর বসে পড়লে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মহিলাটি কে?" লোকেরা উত্তর দিল যে, ইনি রাসূল (সাঃ)-এর দুধ মা। *(আবু দাউদ)*

১৪. মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও তাদেরকে মনে রাখবে এবং সদ্ব্যবহার করার জন্যে নিম্নের কথাগুলোর প্রতি সংকল্প থাকবে।

(i) মাতা-পিতার মাগফিরাতের জন্যে সর্বদা দোআ করবে। পবিত্র কুরআনে মুমিনদেরকে এ দোআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিন।"

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি যখন তার প্রাপ্ত মর্যাদা দেখতে পায় তখন আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কিভাবে হলো? আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দেয়া হয় যে, তোমার সন্তানেরা তোমার জন্যে সর্বদা আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ তা কবুল করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন- মানুষ মারা গেলে যখন তার আমলের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি এমন কাজ আছে যা মৃত্যুর পরও উপকারে আসে, (ক) ছদকায়ে জারিয়া,

অর্থাৎ এমন নেক কাজে দান করা যা মৃত্যুর পরও চলতে থাকে, (খ) তার ইলম যা হতে লোক দীনি উপকার পায়, (গ) সেই নেক্কার সন্তানেরা যারা তার জন্যে মাগফিরাতের দোআ করতে থাকে।

(ii) মাতা-পিতার কৃত ওয়াদা ও অছিয়ত পূরণ করবে। মাতা-পিতা জীবনে অনেক লোকের সাথে ওয়াদা করতে পারে, আল্লাহর সাথে কোন ওয়াদা করতে পারে, কোন মান্নত মানতে পারে, কাউকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করতে পারে, তাদের যিম্মায় ঋণ থাকতে পারে যা তারা আদায় করার সুযোগ পায়নি, মৃত্যুকালে কোন অছিয়ত করতে পারে, অবশ্যই সন্তান তার ক্ষমতানুযায়ী সেগুলো পূরণ করবে।

(iii) পিতামাতার বন্ধু বান্ধবের সাথেও সদ্ব্যবহার করবে। তাদের সম্মান করবে, তাদের সাথে পরামর্শ করবে এবং নিজে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সম্মানিত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করবে। তাদের মত ও পরামর্শকে মর্যাদা দেবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সব চাইতে বেশী ভাল ব্যবহার হলো, যে ব্যক্তি তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করবে।"

"একবার হযরত আবু দরদা (রাঃ) অসুখে পড়লেন এবং অসুখ বাড়তেই থাকলো। এমনকি তার বাঁচারও কোন আশা রইল না, তখন হযরত ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) অনেক দূর থেকে সফর করে তাকে দেখতে এলেন, হযরত আবু দরদা (রাঃ) তাকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? হযরত ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) জবাবে বললেন, "আমি এখানে শুধু আপনাকে দেখতেই এসেছি। কেননা আপনার সঙ্গে আমার পিতার বন্ধুত্বপূর্ণ গভীর সম্পর্ক ছিল।"

হযরত আবু দারদাহ (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায় আসার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) আমার নিকট এসে বলতে লাগলেন, আবু দারদাহ, তুমি কি জান আমি কেন তোমার নিকট এসেছি? আমি বললাম, আমি কি করে জানবো যে আপনি কেন এসেছেন? তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি কবরে তার পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে চায় সে যেনো তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও সদ্ব্যবহার করে।" তারপর বললেন, ভাই! আমার পিতা হযরত ওমর (রাঃ) ও আপনার পিতার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমি চাই যে, ঐ বন্ধুত্ব অটুট থাকুক এবং আমি তার হক আদায় করি।"

(ইবনে হাব্বান)

(১৪) মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সর্বদা ভাল আচরণ করবে এবং তাদের নিকটাত্মীয়দের প্রতিও অসদাচরণ করবে না। ঐ সকল আত্মীয়দের থেকে অমনোযোগী হওয়া মূলতঃ মাতা-পিতা থেকে অমনোযোগী হওয়ার তুল্য। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, বাপ-দাদা ও মাতা-পিতা থেকে অমনোযোগী হওয়া আল্লাহর অকৃতজ্ঞতার শামিল।"

১৫. আল্লাহ না করুন! মাতা-পিতার জীবিতাবস্থায় যদি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি হক আদায়ের ত্রুটি হয়েও থাকে তবুও আল্লাহর নিকট সদা সর্বদা তাদের জন্যে মাগফিরাতের দোআ করবে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তোমার ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে তার নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করে নেবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি মাতা-পিতার জীবিতাবস্থায় তাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে থাকে, এবং এমতাবস্থায় মাতা-পিতার কোন একজনের অথবা উভয়ের মৃত্যুবরণ হয়ে থাকে তাহলে এখন তার উচিৎ যে, সে যেন আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে, যেনো আল্লাহ তাকে তাঁর রহমতের দ্বারা তাঁর নেক বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

বৈবাহিক জীবনের আদবসমূহ

ইসলাম যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আশা করে তা তখনই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে যখন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পবিত্র শান্তিময় সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়। পবিত্র সমাজ গঠনের জন্যে আবশ্যক হচ্ছে যে, পারিবারিক ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনের যে সূচনা হয় তার সৌন্দর্য ও দৃঢ়তা। আর তখনই সম্ভব যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাদের বৈবাহিক জীবনের নীতি ও কর্তব্য সম্পর্কে সুন্দরভাবে অবহিত থাকে এবং ঐ সকল নীতি ও কর্তব্য পালনে উভয়ে সচেতন হলে তাদের জীবন সুখময় হয়।

স্বামীর সাথে সম্পর্কিত নীতি ও কর্তব্যসমূহ

১. স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণের অভ্যাস করবে। তার অধিকারসমূহ স্বতস্ফূর্তভাবে আদায় করবে এবং প্রত্যেক ব্যাপারে উপকার ও আত্মোৎসর্গের পন্থা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

"তোমরা স্বামীরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে।"

রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে বিপুল জনতাকে সম্বোধন করে বলেছেন শুন! নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করো, কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদীর মত আবদ্ধ, তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ পাওয়া ব্যতীত তাদের সাথে তোমাদের খারাপ আচরণ করার কোন অধিকার নেই। তারা যদি কোন অপরাধ করেই ফেলে তাহলে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও আর তাদেরকে যদি মারতেই হয় তাহলে এমনভাবে মারবে না যাতে তারা মারাত্মক আঘাত পায়–অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথামত চলতে আরম্ভ করে তখন তাদের ব্যাপারে অনর্থক অজুহাত খুঁজবে না।

তোমাদের কিছু অধিকার তোমাদের স্ত্রীদের ওপর আছে, তাহলো তারা তোমাদের বিছানাকে ঐ সকল লোকদের দ্বারা পদদলিত করবে না যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো আর তোমাদের ঘরে এমন লোকদের কখনো প্রবেশ করতে দেবে না যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো। শুন! তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদেরকে যথাসাধ্য ভাল খানা খাওয়াবে এবং উত্তম কাপড় পরিধান করাবে। (*রিয়াদুস সালেহীন*)

অর্থাৎ খানাপিনার এমন ব্যবস্থা করবে যাতে স্বামী-স্ত্রীর অনুপম নৈকট্য আন্তরিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের যথোপযুক্ত নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়।

২. যথাসম্ভব স্ত্রীর প্রতি সুধারণা পোষণ করবে। তার সাথে জীবন-যাপনে ধৈর্য্য, সহ্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দেবে। যদি তার আকৃতি অথবা অভ্যাস ও চরিত্র অথবা আচার-ব্যবহার এবং জ্ঞান বুদ্ধিতে কোন ক্রটিও থাকে তাহলে ধৈর্য্যের সাথে তা মেনে নিবে আর তার মধ্যে যেসব গুণ আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে উদারতা, ক্ষমা, ত্যাগ এবং আপোষমূলক আচরণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওয়াছলুহু খায়রুন' 'আপোষকামিতা বড়ই উত্তম।'

মুমিনদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন–

"অতঃপর কোন স্ত্রী যদি তোমাদের অপছন্দ হয় তাহলে সম্ভবতঃ তার মাত্র একটি বিষয় তোমাদের অপছন্দ অথচ আল্লাহ তার মধ্যে (তোমাদের জন্যে) অনেক ভাল জিনিস রেখে দিয়েছেন।" *(সূরায়ে নিসা–১৯)*

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখায় রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

"কোন মুমিন তার ঈমানদার স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না, যদি স্ত্রীর কোন এক অভ্যাস তার অপছন্দও হয় তবে সম্ভবতঃ তার অন্য স্বভাব পছন্দনীয় হবে।"

মূলকথা হলো, প্রত্যেক মহিলার মধ্যে কোন না কোন ত্রুটি অবশ্যই থাকবে। যদি স্বামী তার কোন একটি দোষ দেখেই তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এবং মন খারাপ করে ফেলে তাহলে কোন পরিবারেই পারিবারিক সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে না। উত্তম পন্থা হলো এই যে, স্ত্রীদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে স্ত্রীর সাথে সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা ঐ স্ত্রীর মাধ্যমে এমন কিছু উত্তম বস্তু দান করতে পারেন যা পুরুষের দুর্বল দৃষ্টি শক্তির অনেক ঊর্ধ্বে। যেমন ঃ হয়তো স্ত্রীর মধ্যে দীন, ঈমান, স্বভাব ও চরিত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট আছে যার জন্য সে পূর্ণ পরিবারের জন্য রহমত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে অথবা তার থেকে এমন একটি সু-সন্তান জন্মলাভ করতে পারে যার দ্বারা সমগ্র পৃথিবী উপকৃত হবে এবং সে সারা জীবন পিতার জন্যে সাদক্বায়ে জারিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে। অথবা স্ত্রী স্বামীর চরিত্র সংশোধনের কারণ হবে এবং স্বামীকে জান্নাতের নিকটস্থ করতে সাহায্যকারী হিসেবে পরিগণিত হবে অথবা তার সৌভাগ্যের কারণে আল্লাহ তাআলা ঐ পুরুষকে দুনিয়াতে রুজি রোজগার ও স্বচ্ছলতা দান করবেন। যা হোক স্ত্রীর কোন দোষ দেখে অবিবেচকের মত বৈবাহিক সম্পর্ককে ছিন্ন করবে না বরং উত্তম পন্থায় ধীরে ধীরে ঘরের পরিবেশকে সুন্দর করতে চেষ্টা করবে।

৩. বিবেচকের পন্থা অবলম্বন করবে। স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি, অজ্ঞতা ও অবাধ্যতা সুলভ আচরণসমূহকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। মহিলারা স্বভাবতঃ জ্ঞান-বুদ্ধিতে একটু বেশী দুর্বল ও আবেগ প্রবণ হয়, সুতরাং ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও ভালবাসা এবং আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে এবং ধৈর্য্য ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জীবন-যাপন করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

"মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও কোন কোন সন্তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের থেকে দূরে থাক, যদি তোমরা ক্ষমা, দয়া, মার্জনা ও উপেক্ষা করো তাহলে নিশ্চিত আল্লাহ মহান ক্ষমাপ্রদানকারী ও দয়াবান। *(সূরা তাগাবুন-১৪)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

"নারীদের সাথে সদাচরণ কর। নারীগণ পাঁজড়ের হাড্ডি দ্বারা সৃষ্ট এবং পাঁজড়ের হাড় এর উপরের অংশ সব চাইতে বেশী বাঁকা, তাকে সোজা করার চেষ্টা করলে ভেঙ্গে যাবে, যদি ঐভাবেই ছেড়ে দাও তা হলে বাঁকাই থেকে যাবে, সুতরাং নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।" *(বুখারী ,মুসলিম)*

৪. স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং প্রেম ও ভালবাসাসুলভ আচরণ করবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে পূর্ণ মুমিন আর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বাধিক উত্তম।" *(তিরমিযি)*

উত্তম চরিত্র ও নম্র স্বভাবের পরীক্ষা ক্ষেত্র হলো পারিবারিক জীবন। পরিবারের লোকদের সাথে সব সময় সুসম্পর্ক থাকে। আর ঘরের অকৃত্রিম জীবনেই স্বভাব ও চরিত্রের প্রতিটি দিক ফুটে উঠে। আর এটাই মূল কথা যে, ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ মুমিন যে পরিবারের লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার, হাসি খুশী ও দয়া সুলভ ব্যবহার করে। পরিবারের লোকদের অন্তর আকর্ষণ করবে এবং স্নেহ ও ভালবাসা প্রদান করবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম, আমার সাথীরাও আমার সাথে খেলা করতো, যখন রাসূল (সাঃ) আসতেন তখন সকলে এদিক ওদিক লুকিয়ে যেতো, তিনি তাদেরকে খোঁজ করে প্রত্যেককে আমার সাথে খেলা করতে পাঠিয়ে দিতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

৫. অত্যন্ত প্রাণখোলাভাবে জীবন সঙ্গিনীর আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে দেবে এবং খরচের বেলায় খুব বেশী সংকোচ করবে না। নিজের পরিশ্রমের রুজি পরিবারের লোকদের জন্য খরচ করে মানসিক শান্তি ও খুশী অনুভব করবে। খাদ্য ও বস্ত্র স্ত্রীর অধিকার আর এ অধিকারকে খুশী ও প্রশস্ততার সাথে আদায় করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা ও

তদবীর করা স্বামীর কর্তব্য, খোলা অন্তরে এ কর্তব্য সম্পাদনে শুধু এ পার্থিব জগতেই বৈবাহিক জীবনের সুফল লাভ হয় তা নয় বরং মুমিন ব্যক্তি আখিরাতেও পুরস্কার ও নেয়ামতের অধিকারী হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

এক দীনার যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছো, যা তুমি কোন গোলামকে আযাদ করতে ব্যয় করেছো, যা তুমি ভিক্ষুককে দান করেছো এবং যা তুমি পরিবারের লোকদের জন্যে ব্যয় করেছো, এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পুরস্কার ও সওয়াবের অধিকারী ঐ দীনার যা তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্যে ব্যয় করেছ। *(মুসলিম)*

৬. স্ত্রীকে দীনি বিধি-বিধান সংস্কৃতি বা আচার-আচরণে শিক্ষিত করে তুলবে। দীনি শিক্ষা দান করবে। ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান করে সাজিয়ে তুলবে এবং তার প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের জন্যে সম্ভাব্য চেষ্টা চালাবে যেনো সে একজন উত্তম স্ত্রী, উত্তম মাতা এবং আল্লাহর নেক বান্দি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার ওপর নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ সুন্দর ও সঠিকভাবে আদায় করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন

"মুমিনগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

রাসূল (সাঃ) বাইরে যেমন দাওয়াত ও শিক্ষাদানের কাজে ব্যস্ত থাকতেন তেমনি ঘরেও উক্ত কর্তব্যসমূহ সুচারুরূপে সম্পাদন করতেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআন নবী পত্নীগণকে সম্বোধন করেছে।

"তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে সকল আয়াত পাঠ করা হয় এবং বিজ্ঞান সম্মত কথাবার্তা আলোচনা করা হয় এগুলো স্মরণ রেখো।"

পবিত্র কুরআনে রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে সকল মুমিনকে হেদায়াত করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

"আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের নির্দেশ দিন এবং আপনি নিজেও তার ওপর কায়েম থাকুন।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"যখন কোন পুরুষ রাতে নিজ স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দুজনে দু' রাকাত (নফল) নামায আদায় করে তখন স্বামীর নাম যিকিরকারীদের মধ্যে এবং স্ত্রীর নাম যিকিকারিণীদের মধ্যে লিখে নেয়া হয়।" *(আবু দাউদ)*

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) রাতে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন এবং শেষ রাতে জীবন সঙ্গিনীকে ঘুম থেকে জাগাতেন এবং বলতেন, উঠো, নামায পড়ো। অতঃপর কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন।

৭. যদি একাধিক স্ত্রী হয় তবে সকলের সাথে সমান ব্যবহার করবে। রাসূল (সাঃ) বিবিদের সাথে সমান আচরণ করতে চেষ্টা করতেন। সফরে যাবার সময় বিবিগণের নামে লটারী দেয়া হতো। লটারীতে যার নাম আসতো তাঁকে সফর সঙ্গিনী করে নিতেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"কোন ব্যক্তির যদি দু'জন স্ত্রী হয় আর সে তাদের মধ্যে ইনছাফ ভিত্তিক সমান ব্যবহার না করে তা হলে সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার অর্ধেক শরীর অচল। *(তিরমিযি)*

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে অর্ধেক শরীরে উত্থিত হবে।

ইনসাফ ও সম্মানের আসল মর্ম হলো, লেন-দেন ও আচরণে সমতা রক্ষা করা। কোন এক স্ত্রীর প্রতি অন্তরের টান ও প্রেমের জন্যে আল্লাহর নিকট কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

স্ত্রী সম্পর্কিত আদব ও কর্তব্যসমূহ

১. অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে নিজ স্বামীর আনুগত্য করবে এবং এ আনুগত্যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ অনুভব করবে, কেননা এটা আল্লাহর নির্দেশ। যে মহিলা আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। পবিত্র কুরআনে বলা আছে, "ফাসসালিহাতু কানিতাতু" নেককার মহিলাগণ (তাদের স্বামীদের) আনুগত্যকারিণী হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

"কোন মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে না।

(আবু দাউদ)

স্বামীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধার গুরুত্ব প্রকাশ করে রাসূল (সাঃ) নারীদেরকে সতর্ক করেছেন এভাবে-

দু' প্রকারের লোক আছে যাদের নামায তাদের মাথা থেকে উপরে উঠে না-(১) সেই গোলামের নামায, যে গোলাম নিজের মনিব থেকে পলায়ন করে চলে যায় অর্থাৎ পলাতক গোলাম, এবং যে পর্যন্ত (সে মনিবের নিকট) ফিরে না আসে। (২) সেই মহিলার নামায যে স্বামীর নাফরমানী থেকে বিরত না হয়। *(অত্‌তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব)*

২. নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষার পূর্ণ চেষ্টা করবে এবং এমন কথাবার্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকবে যার দ্বারা সতীত্বের ওপর কালিমা লেপনের সন্দেহও না হয়, আল্লাহর হেদায়াতের উদ্দেশ্যও তাই এবং বৈবাহিক জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করে নেয়ার জন্যেও ইহা অত্যন্ত জরুরী। স্বামীর অন্তরে যদি এ ধরনের কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা হলে স্ত্রীর কোন খেদমত, আনুগত্য এবং কোন নেক কাজ তাকে (স্বামীকে) নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতার দ্বারাও স্বামীর অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করতে শয়তান কামিয়াব হয়ে যায়। সুতরাং মানবিক দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে খুব সাবধানতা অবলম্বন করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

"স্ত্রীগণ যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, নিজের ইজ্জত রক্ষা করে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করে তা হলে সে বেহেশতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। *(আত্‌তারগীব ওয়াততারহীব)*

৩. স্বামীর অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত ঘরের বাহির হবে না, স্বামী যে সকল বাড়ীতে যেতে অপছন্দ করে সে সকল বাড়ীতে যাবে না এবং স্বামী যে সকল লোকদের ঘরে আসা পছন্দ করে না তাদেরকে ঘরে আসতে অনুমতি দেবে না।

হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেন–

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কোন মহিলার পক্ষে এমনটি জায়েয নয় যে, সে এমন লোককে স্বামীর ঘরে আসতে অনুমতি দেবে যার আসা স্বামী পছন্দ করে না। স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্বামীর ঘর থেকে বের হবে আর স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে অন্য কারো কথা মানবে না। *(তারগীব ও তারহীব)*

অর্থাৎ স্বামীর ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছা ও চোখের ইশারা অনুযায়ীই কাজ স্ত্রী করবে, এর বিপরীত অন্যের যুক্তি পরামর্শ কখনো গ্রহণ করবে না।

৪. সর্বদা নিজের কথা ও কাজ, চাল-চলন ও রীতি-নীতির দ্বারা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সফল বৈবাহিক জীবনের কর্তব্যও এটা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে প্রবেশের পথও এটা।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

"যে মহিলা স্বামীকে খুশী রেখে মৃত্যুবরণ করলো সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন—

যখন কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে মানবিক প্রয়োজনে কাছে ডাকে আর সে তার ডাকে সাড়া না দেয় এবং এ কারণে স্বামী সারা রাত তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে এমতাবস্থা ফিরিশতা ভোর পর্যন্ত তার ওপর অভিশাপ করতে থাকে।" *(বুখারী ,মুসলিম)*

৫. নিজের স্বামীকে ভালবাসবে এবং তার ভালবাসার মর্যাদা দেবে। এটা জীবনের সৌন্দর্য্যের উপকরণ এবং জীবন পথের মহান সহায়। আল্লাহ তাআলার এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে এবং এ নেয়ামতেরও মর্যাদা দেবে।

রাসূল (সাঃ) একস্থানে বলেছেন–

"দু'জন নারী পুরুষের ভালবাসা স্থাপনকারীর জন্যে বিবাহ থেকে উত্তম আর কোন বস্তু পাওয়া যায়নি।"

হযরত ছুফিয়া (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে অনেক ভালবাসতেন। রাসূল (সাঃ) যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন, "তাঁর স্থলে যদি আমি অসুস্থ হতাম!" রাসূল (সাঃ)-এর অন্যান্য বিবিগণ এরূপ ভালবাসা প্রকাশের কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, "লোক দেখানো নয়, বরং সত্যই বলছে।"

৬. স্বামীর উপকার স্বীকার করবে তার শুকরিয়া আদায় করবে। তোমার স্বামীই তো তোমার সর্বাধিক উপকারী যিনি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে সর্বতোভাবে ব্যস্ত থাকেন, তোমার প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূরণ করে দেন এবং তোমাকে সকল প্রকার সুখ প্রদান করেন।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেছেন যে, একবার আমি আমার প্রতিবেশী বান্ধবীর সাথে অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদেরকে সালাম দিয়ে বললেন, "তোমরা যাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছো তাদের নাফরমানী থেকে দূরে থাক, যদি তোমাদের কোন একজন দীর্ঘদিন যাবত মাতা-পিতার নিকট অবিবাহিতা অবস্থায় বসে থাক, অতঃপর আল্লাহ তাআলা (দয়া করে) তাকে স্বামী দান করেন, তারপর আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেন, (এতসব উপকার সত্বেও) যদি কোন কারণে স্বামীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড় তখন বলে ফেল, "আমি কখনো তোমার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্ট ছাড়া কোন সৌজন্যমূলক আচরণ দেখিনি।" *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

অকৃতজ্ঞ ও উপকার ভুলে যাওয়া মহিলাদেরকে সতর্ক করে রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"আল্লাহ তাআলা কাল কিয়ামতের দিন স্বামীর প্রতি অকৃজ্ঞ স্ত্রীর দিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। প্রকৃতপক্ষে মহিলাগণ কোন সময়ও স্বামীর থেকে মুক্তি পাবে না।" *(নাসায়ী)*

৭. স্বামীর খেদমত করে আনন্দ অনুভব করবে আর যথাসম্ভব নিজে কষ্ট সহ্য করে স্বামীকে শান্তি দান করার চেষ্টা করবে এবং সর্বতোভাবে তার খেদমত করে তার অন্তর নিজের আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ হাতে রাসূল (সাঃ)-এর কাপড় ধুতেন, মাথায় তৈল লাগাতেন, চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াতেন, সুগন্ধী লাগাতেন এবং অন্য মহিলা সাহাবীগণও এরূপ করতেন।

একবার রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"কোন এক ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তিকে সেজদা করা জায়েয নেই, যদি থাকত তা হলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সেজদা করার আদেশ দেয়া হতো। নিজের স্ত্রীর ওপর স্বামীর বিরাট অধিকার, যদি স্বামীর সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয় আর স্ত্রী যদি স্বামীর ক্ষত-বিক্ষত শরীর জিহ্বা দ্বারা চাটে তবুও স্বামীর অধিকার শেষ হতে পারে না। *(মুসনাদে আহমদ)*

৮. স্বামীর ঘর-সংসার ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করবে স্বামীর ঘরকেই নিজের ঘর মনে করবে এবং স্বামীর ধন-সম্পদকে, স্বামীর ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, স্বামীর সম্মান সৃষ্টি ও তার সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে মিতব্যয়িতা অনুসরণ করবে, স্বামীর উন্নতি ও স্বচ্ছলতাকে নিজের উন্নতি ও সচ্ছলতা মনে করবে। কোরাইশী মহিলাদের প্রশংসা করতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"কোরাইশী মহিলাগণ কতইনা উত্তম মহিলা। তারা সন্তান-সন্ততির ওপর অত্যন্ত দয়ালু এবং স্বামীর ঘর সংসারের উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। *(বুখারী)*

রাসূল (সাঃ) নেককার স্ত্রীর গুণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

"মুমিনের জন্য সর্বাধিক উপকারী এবং উত্তম নেয়ামত হলো তার নেককার স্ত্রী, সে যদি তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় তা হলে সে তা আন্তরিকতার সাথে সুসম্পন্ন করে আর যদি তার প্রতি দৃষ্টি দেয় তা হলে সে তাকে সন্তুষ্ট করে এবং সে যদি তার ভরসায় শপথ করে বসে তা হলে সে তার শপথ পূরণ করে দেয়, যখন সে কোথাও চলে যায় বা তার অনুপস্থিতিতে সে নিজের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করে এবং স্বামীর ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণে স্বামীর হিতৈষী ও বিশ্বাসী থাকে। *(ইবনু মাজাহ)*

৯. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আচার-আচরণ রীতি, সাজ-সজ্জা এবং শোভা সৌন্দর্য্যকরারও পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। ঘরকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, প্রত্যেক জিনিসকে সুন্দরভাবে সাজাবে এবং উত্তম ব্যবহার করবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর, নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী সাজান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কক্ষসমূহ, ঘরের কাম-কাজে নিয়ম-পদ্ধতি ও সৌন্দর্য বিধান, সুসজ্জিত বিবির পবিত্র মুচকি হাসি দ্বারা শুধুমাত্র সংসার জীবনই প্রেম-ভালবাসা

এবং নিরাপত্তা ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয় না বরং একজন নেক স্ত্রীর জন্যে পরকালের প্রস্তুতি ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করারও অছিলা হয়।

একবার ওসমান বিন মাজউন (রাঃ)-এর স্ত্রীর সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি দেখতে পেলেন যে, বেগম ওসমান অত্যন্ত সাদাসিধা পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা বিহীন অবস্থায় আছেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"বিবি! ওসমান কি বাইরে কোথাও গিয়েছেন?" এ আশ্চার্যান্বিত হওয়া থেকে অনুমান করা যায় যে, আদরীনী স্ত্রীদের নিজ নিজ স্বামীর জন্যে সাজসজ্জা করা কত পছন্দনীয় কাজ।

একবার এক মহিলা সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে স্বর্ণের কঙ্কন বা বালা পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হলেন, তিনি "তাকে (অহংকারের উদ্রেককারী) ইহা পরিধান করতে নিষেধ করলে সে বললো ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহিলা যদি স্বামীর জন্যে সাজ-সজ্জা না করে তা হলে সে স্বামীর দৃষ্টি থেকে বিচ্যুত হবে।" *(নাসায়ী)*

সন্তান প্রতিপালনের নিয়ম-কানুন

১. সন্তানকে আল্লাহ তাআলার পুরস্কার মনে করবে, তাদের জন্মে আনন্দ প্রকাশ করবে। একে অন্যকে ধন্যবাদ জানাবে। উত্তম দোআসহ অভ্যর্থনা জানাবে এবং আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তোমাকে তাঁর (আল্লাহর) এক বান্দাহকে লালন-পালনের সৌভাগ্য দান করেছেন। আর তোমাকে এ সুযোগ দান করেছেন যে, তুমি তোমার পেছনে দীন ও দুনিয়ায় একজন স্থলাভিষিক্ত রেখে যেতে পারছো।

২. তোমার যদি কোন সন্তান না থাকে তা হলে হযরত যাকারিয়া (আঃ) যেমন সুসন্তান লাভের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন তুমি অদ্রূপ আল্লাহর নিকট সু-সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা কর।

তিনি দোআ করেছিলেন–

"হে, আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট থেকে একটি পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোআ শ্রবণকারী। *(সূরা মরিয়ম)*

৩. সন্তানের জন্মগ্রহণে কখনো মনে কষ্ট পাবে না। জীবিকার কষ্ট অথবা স্বাস্থ্যের অবনতি অথবা অন্য কোন কারণে সন্তানের জন্ম গ্রহণে দুঃখিত হওয়া অথবা তাকে একটি বিপদ ধারণা করা থেকে বিরত থাকবে।

৪. সন্তানকে কখনো নষ্ট করবে না, জন্মগ্রহণের পূর্বে অথবা জন্ম গ্রহণের পরে সন্তান নষ্ট করা নিকৃষ্টতম পাষণ্ডতা, ভয়ানক এবং অত্যন্ত অমার্জনীয় অপরাধ, কাপুরুষতা দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস ডেকে আনে।

পবিত্র কালামে পাকে রয়েছে-

"যারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার কারণে সন্তান হত্যা করলো তারা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্থ হলো।"

আল্লাহ্ তাআলা মানবিক অদূরদর্শিতার জবাব দিয়ে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছেন যে, নিজ সন্তানকে হত্যা কর না।

"তোমরা তোমাদের সন্তানকে অভাব-অনটনের ভয়ে হত্যা কর না, আমিই তাদেরকে রিযিক (জীবিকা) দান করবো আর তোমাদেরকেও আমিই রিযিক দিচ্ছি, নিশ্চিত তাদের হত্যা করা জঘণ্য অপরাধ।

(সূরা বনী ইসরাইল)

"একবার এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাধিক বড় গুনাহ কি? আল্লাহর রাসূল বললেন, শির্ক! অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা। জিজ্ঞেস করা হলো, এর পর কি? তিনি বললেন, মাতা-পিতার নাফরমানী (অবাধ্যতা), আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এর পর? তিনি বললেন, তোমাদের সাথে খাদ্যে ভাগ বসাবে এ ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা।

৫. প্রসবকালে প্রসবকারিণী মহিলার নিকট বসে আয়তুল কুরসী ও সূরায়ে আ'রাফের ৫৪ ও ৫৫ নং আয়াত দুটি তেলাওয়াত করবে এবং সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস পাঠ করে করে ফুঁক দেবে।

৬. জন্মগ্রহণের পর গোসল দিয়ে পরিষ্কার করে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দেবে। হযরত হোসাইন (রাঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন রাসূল (সাঃ) তার কানে আযান ও ইক্বামত দিয়েছিলেন। *(তিবরানী)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, যার ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করলো আর সে তার ডানে কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দিলো, সে বাচ্চা মৃগী রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। *(আবু ইয়া'লা ইবনে সুন্নী)*

জন্মগ্রহণের সাথে সাথে সন্তানের কানে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাম পৌঁছিয়ে দেয়ার মধ্যে বড় ধরনের রহস্য রয়েছে, আল্লামা ইবনে কাইউম তার 'তোহফাতুল ওয়াদুদ' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

ইহার উদ্দেশ্য হলো মানুষের কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আওয়াজ পৌঁছুক। যে শাহাদাতকে সে বুদ্ধি অনুয়ায়ী আদায় করে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করবে তার শিক্ষা জন্মগ্রহণের দিন থেকেই শুরু করা যাক। যেমন মৃত্যুর সময়ও কালেমায়ে তাওহীদের তালক্বীন করা হয়। আযান ও ইক্বামতের দ্বিতীয় উপকার এই যে, শয়তান গোপনে ওঁৎ পেতে বসে আছে যে, সন্তান জন্মগ্রহণের পরই তাকে শয়তানের দাওয়াতের আগেই ইসলাম বা ইবাদতে এলাহীর দাওয়াত তার কানে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

৭. আযান ও ইক্বামতের পর কোন নেককার পুরুষ অথবা মেয়েলোকের দ্বারা খেজুর চিবিয়ে সন্তানের মাথার তালুতে লাগিয়ে দেবে এবং সন্তানের জন্যে পূর্ণ প্রাচুর্যের (বরকতের) দোআ করাবে।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন যোবাইর জন্মগ্রহণ করলে আমি রাসূল (সাঃ)-এর কোলে দিলাম। তিনি খোরমা আনিয়ে তা চিবিয়ে বরকতময় থু থু আবদুল্লাহ বিন যোবাইয়েরের মুখে লাগিয়ে দিলেন এবং খোরমা তার মাথার তালুতে মালিশ করে খায়ের বরকতের দোআ করলেন।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সদ্য প্রসূত বাচ্চাদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হতো। তিনি 'তাহ্নীক'(১) করতেন এবং তাদের জন্য খায়ের ও বরকতের দোআ করতেন। *(মুসলিম)*

হযরত আহমাদ বিন হাম্বলের স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে তিনি ঘরে রাখা মক্কার খেজুর আনলেন এবং উম্মে আলী (রহঃ) নামাযী একজন মহিলার নিকট তাহ্নীকের জন্য আবেদন করলেন।

৮. বাচ্চার জন্য উত্তম নাম নির্বাচন করবে, যা হবে কোন নবীর নাম অথবা আল্লাহর নামের পূর্বে 'আবদ' শব্দের সংযোগে যেমনঃ–আব্দুল্লাহ আবদুর রহমান ইত্যাদি।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে স্ব-স্ব নামে ডাকা হবে সুতরাং উত্তম নাম রাখো।

(১) খেজুর চিবিয়ে বাচ্চার মুখে ও মাথার তালুতে লাগিয়ে দেয়াকে তাহনীক বলে।

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন যে, আল্লাহর নিকট তোমাদের নামসমূহ থেকে আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান নাম বেশী পছন্দনীয়। তিনি আরো বলেছেন যে, তোমরা নবীদের নামে নাম রাখো।

বুখারী শরীফে আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার উপনামে নয়।

৯. অজ্ঞতাবশতঃ কখনো যদি ভুল নাম রেখে দেয়া হয় তাহলে তা পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখবে। রাসূল (সাঃ) ভুল নাম পরিবর্তন করে দিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) এর এক কন্যার নাম 'আছিয়া' ছিল, তিনি উহাকে পরিবর্তন করে 'জামিলা' রাখলেন। *(মুসলিম)*

হযরত যয়নব (রাঃ) এর (হযরত আবু সালমা (রাঃ) এর কন্যার) নাম ছিল 'বাররাহ'। বাররাহ শব্দের অর্থ হল পবিত্রতা, রাসূল (সাঃ) ইহা শুনে বললেন, নিজেই নিজের পবিত্রতার বাহাদুরী করছো ? সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি নাম রাখা যায় ? তিনি বললেন, তার নাম রাখ 'যয়নাব'। *(আবু দাউদ)*

১০. সপ্তম দিন আকীকা করবে। ছেলের পক্ষ থেকে ২টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি ছাগল দেবে। তবে ছেলের পক্ষ থেকে ২টি ছাগল জরুরী নয়, ১টি ছাগলও দেয়া যেতে পারে। শিশুর মাথা মুণ্ডন করিয়ে চুল সমান স্বর্ণ অথবা রূপা দান করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সপ্তম দিন শিশুর নাম ঠিক করবে এবং তার চুল মুণ্ডন করিয়ে তার পক্ষ থেকে আকীকা করবে।" *(তিরমিযী)*

১১. সপ্তম দিনে খাতনাও করিয়ে দেবে। কোন কারণবশতঃ না পারলে ৭ বৎসর বয়সের মধ্যে অবশ্যই করিয়ে ফেলবে। খাতনা ইসলামী রীতি।

১২. শিশু যখন কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে কলমায়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শিক্ষা দাও। তারপর কখন মরবে সে চিন্তা কর না, যখন দুধের দাঁত পড়ে যাবে তখন নামায পড়ার নির্দেশ দাও।

হাদীসে ইহাও উল্লেখ আছে যে, হুযুর (সাঃ)-এর পরিবারের শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করতো তখন তিনি তাকে সূরা আল-ফুরকানের দ্বিতীয় আয়াত শিক্ষা দিতেন, যাতে তাওহীদের পূর্ণ শিক্ষাকে একত্রিত করা হয়েছে।

১৩. শিশুকে নিজের দুধ পান করানো মায়ের ওপর শিশুর অধিকার। পবিত্র কুরআনে সন্তান-সন্ততিকে মায়ের এ উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। মায়ের কর্তব্য হলো, সে দুধের প্রতিটি ফোঁটার সাথে তাওহীদের পাঠ, রাসূলের প্রেম এবং দীনের ভালবাসাও পান করাবে এবং তার মন ও প্রাণে স্থায়ী করার চেষ্টা করবে। লালন-পালনের দায়িত্ব পিতার ওপর দিয়ে নিজের বোঝা হাল্কা করবে না বরং এ আনন্দময় দীনি কর্তব্য নিজে সম্পাদন করে আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ অনুভব করবে।

১৪. শিশুকে ভয় দেখানো ঠিক নয়। শিশুকালের এ ভয় সারাজীবন তার মন ও মস্তিষ্কে ছেয়ে থাকে আর এরূপ শিশুরা সাধারণতঃ জীবনে কোন বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারে না।

১৫. সন্তানদের কথায় কথায় তিরষ্কার করা, ধমক দেয়া ও মন্দ বলা থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের ত্রুটিসমূহের কারণে অসন্তুষ্টি ও ঘৃণা প্রকাশ করার স্থলে উত্তমপন্থায় ও হৃদয়ে আবেগ নিয়ে তার সংশোধনের চেষ্টা করবে। সর্বদা শিশুদের মনে এ ভয় জাগরুক রাখবে যেন, তারা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না করে।

১৬. সন্তানদের সাথে সর্বদা দয়া, মায়া ও নম্রতাসুলভ ব্যবহার করবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালনের আবেগে উদ্বুদ্ধ করবে।

একবার হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আহনাফ বিন কায়েস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন! সন্তানদের বেলায় কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? তখন আহনাফ বিন কায়েস বললেন ঃ

আমিরুল মুমেনীন! সন্তানগণ আমাদের অন্তরের ফসল, এবং কোমরের খুঁটি বা অবলম্বন, আমাদের মর্যাদা ও যোগ্যতা তাদের জন্য জমি সমতুল্য। যা অত্যন্ত নরম ও নির্দোষ এবং আমাদের অস্তিত্ব তাদের জন্য ছায়াদাতা আকাশ সমতুল্য, আমরা তাদের দ্বারাই বড় বড় কাজ সমাধা করতে সাহস করি। তারা যদি আপনার নিকট কিছু দাবী করে তাহলে তা পূরণ করে দেবেন এবং তারা যদি অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হয় তাহলে তাদের অন্তরের দুঃখ দূর করে দেবেন। তারা আপনাকে ভালবাসবে, আপনার পিতৃসুলভ আচরণকে শ্রদ্ধা করবে। এরূপ ব্যবস্থা করবে না যার জন্য তারা আপনার প্রতি বিরক্ত হয়ে আপনার মৃত্যু কামনা করবে, আর আপনার নিকট থেকে পলায়ন করবে।

আহনাফ! আল্লাহর শপথ! আপনি যে সময় আমার নিকট এসে বসলেন, ঐ সময় তিনি ইয়াযীদের ওপর রাগে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন।

অতঃপর হযরত আহনাফ (রাঃ) চলে গেলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর রাগ পড়ে গেল এবং ইয়াযীদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে ইয়াযীদের নিকট দু' শত দিরহাম ও দু' শত জোড়া কাপড় পাঠিয়ে দিলেন। ইয়াযীদের নিকট যখন এ উপহার সামগ্রী পৌঁছলো তখন ইয়াযীদ এ উপহার সামগ্রীকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে একশত দিরহাম ও একশত জোড়া (কাপড়) হযরত আহনাফ বিন কায়েস (রাঃ)এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

১৭. ছোট শিশুদের মাথার ওপর স্নেহপূর্ণ হাত বুলাবে শিশুদেরকে কোলে নেবে, আদর করবে এবং তাদের সাথে সর্বদা হাসিমাখা ব্যবহার করবে। সর্বদা বদমেজাজ ও কঠোর হয়ে থাকবে না, আচরণ দ্বারা শিশুদের অন্তরে মাতা-পিতার জন্য ভালবাসার আবেগও সৃষ্টি হয়, তাদের আত্মবিশ্বাসও সৃষ্টি হয়, এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনের প্রভাব পড়ে।

একদা হযরত আক্বরা বিন হারেস (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে আসলেন। হুযুর (সাঃ) ঐ সময় হযরত হাসান (রাঃ)-কে আদর করছিলেন। আক্বরা (রাঃ) দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনিও কি শিশুদেরকে আদর করেন? আমারতো দশ সন্তান আছে কিন্তু আমিতো তাদের কাউকে কোন সময় আদর করিনি। রাসূল (সাঃ) আক্বরা (রাঃ)-এর দিকে চেয়ে বললেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া ও স্নেহ দূর করে দিয়ে থাকেন তাহলে আমি কি করতে পারি?

ফারুকে আযম (হযরত ওমর) (রাঃ) এর খেলাফত আমলে হযরত আমের (রাঃ) বিশেষ একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একবার হযরত ওমর (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বিছানায় শুয়ে আছেন আর একটি শিশু তার বুকে চড়ে খেলা করছে–

হযরত আমেরের নিকট এ ঘটনা পছন্দ হলো না। আমিরুল মুমেনীন তার কপাল উঠা নামার অবস্থা দেখে তার অপছন্দের ব্যাপার বুঝে ফেললেন এবং হযরত আমের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আপনার নিজের সন্তানদের সাথে আপনার কিরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে।

হযরত আমের (রাঃ) বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আমি যখন ঘরে প্রবেশ করি পরিবারের লোকজন নীরব হয়ে যায়। সকলে নিজ নিজ স্থানে শ্বাসবন্ধ করে চুপ হয়ে থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন,

আমের! আপনি উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ)-এর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আপনি এটা জানেন না যে, একজন মুসলমানকে তার পরিবার-পরিজনের সাথে কিরূপ নম্রতা ও ভালবাসার আচরণ করা উচিত।

১৮. সন্তানদেরকে পবিত্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে নিজের সার্বিক চেষ্টা ওয়াকফ করে দেবে এবং এ পথে সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতেও পিছু হঠবে না। এটা দীনি দায়িত্ব।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, পিতা নিজের সন্তানদেরকে যা কিছু দিতে পারে তার মধ্যে সর্বোত্তম দান হলো সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা দেওয়া। *(মিশকাত)*

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন যে, মানুষ মারা গেলে তার আমল শেষ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমল এমন যার পুরস্কার ও সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকে। (১) সদক্বায়ে জারিয়ার কাজ করে গেলে, (২) এমন ইল্‌ম যার দ্বারা লোকেরা তার মৃত্যুর পরও উপকৃত হয়, (৩) নেক সন্তান, যারা পিতার জন্যে দোআ করতে থাকে। *(মুসলিম)*

প্রকৃতপক্ষে সন্তানরাই আপনার পরে আপনার চারিত্রিক বর্ণনা, দীনি শিক্ষা ও তাওহীদের বার্তাকে জীবিত রাখার যথার্থ মাধ্যম আর মুমিন ব্যক্তি সন্তানের আকাংখা এ জন্যই করে যেনো সে তার পরে তার কর্মকাণ্ডকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

১৯. শিশুদের বয়স যখন ৭ বৎসর হয় তখন তাদেরকে নামায পড়ার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেবে। নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে গিয়ে উৎসাহ দান করবে আর তাদের বয়স যখন ১০ বছর হয়ে যাবে এবং নামাযে ত্রুটি করবে তখন দরকার হলে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তিও দেবে। তাঁদের নিকট তোমার কথা ও কাজের দ্বারা প্রকাশ করে দেবে যে, নামাযের ত্রুটিকে তুমি সহ্য করবেনা।

২০. শিশুদের বয়স যখন ১০ বছর হবে, তখন তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে শুতে দেবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন ৭ বছর হয়ে যাবে তখন তাদেরকে নামায পড়ার শিক্ষা দাও আর তাদের বয়স যখন ১০ বছর হয়ে যাবে তখন তাদের নামাযের জন্য শাস্তি দাও। এ বয়স হওয়ার পর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"

২১. শিশুদের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। তাদের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও গোসলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, কাপড় পরিষ্কার রাখবে, তবে অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা ও লোক দেখানো প্রদর্শনী থেকে বিরত থাকবে। মেয়েদের কাপড়ও অত্যন্ত সাদাসিধা রাখবে এবং জাঁকজমকের পোশাক পরিধান করিয়ে শিশুদের মন মেজাজ নষ্ট করবে না।

২২. অপরের সামনে শিশুদের দোষ বর্ণনা করবে না। এবং কারো সামনে তাদের লজ্জা ও তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দেয়া থেকেও বিরত থাকবে।

২৩. শিশুদের সামনে কখনো শিশুদেরকে সংশোধনের বিষয়ে নৈরাশ্য প্রকাশ করবে না বরং তাদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য তাদের সাধারণ ভাল কাজেরও প্রাণ খুলে প্রশংসা করবে। তাদের সাহস বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ সৃষ্টির চেষ্টা করবে সে যেনো এ জীবনের কর্মক্ষেত্রে উচ্চতম স্থান লাভ করতে পারে।

২৪. নবীদের কাহিনী, নেককার লোকদের জীবনী এবং সাহাবায়ে কেরামের মুজাহিদ সুলভ ইতিহাস তাদেরকে শুনাতে থাকবে। প্রশিক্ষণ ও সংস্কার, চরিত্র গঠন এবং দীনি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্যে এটা অত্যন্ত জরুরী মনে করবে এবং হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও এর জন্যে সময় বের করে নেবে। সর্বাধিক ও অধিকাংশ সময় তাদেরকে সুন্দর স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাবে ও সুযোগ মত রাসূল (সাঃ)এর প্রভাবশীল বাণীসমূহ শিক্ষা দেবে আর প্রাথমিক বয়স থেকেই তাদের অন্তরে রাসূল প্রেমের আবেগ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে।

২৫. কখনো কখনো শিশুদের হাত দ্বারা গরীবদেরকে কিছু খাদ্য অথবা পয়সা ইত্যাদি দেওয়াবে যেনো তাদের মধ্যে গরীবদের সাথে সদ্ব্যবহার ও দান-খয়রাতের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো এ সুযোগও গ্রহণ করবে যে, তাদের হাতে বোন-ভাইদের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় বন্টন করাবে যেনো তাদের মধ্যে অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুভূতি এবং ইনসাফের অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

২৬. কর্কশ স্বরে কথা বলা ও গলা ফাটিয়ে চীৎকার ও চেঁচামেচি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে এবং তাদেরকেও নির্দেশ দেবে যে, মধ্যম স্বরে ও নম্রতার সাথে কথাবার্তা বলবে এবং আপোষে একে অন্যের ওপর হৈ হুল্লোড় ও চেঁচামেচি পরিত্যাগ করবে।

২৮. শিশুরা নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক কাজেই চাকরের সাহায্য নেবে না, এর দ্বারা শিশুরা দুর্বল, অলস ও পঙ্গু হয়ে যায়। শিশুদেরকে উদ্যমশীল, পরিশ্রমী হিসেবে গঠন করবে।

২৯. শিশুদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বেঁধে গেলে অন্যায়ভাবে নিজের শিশুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না, এ ধারণা রাখবে যে, তোমার শিশুর জন্য তোমার অন্তরে যে আবেগ বিরাজ করছে ঐরূপ অন্যদের অন্তরেও তাদের শিশুদের জন্যও করছে। তুমি সর্বদা তোমার শিশুর ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং প্রত্যেক অপছন্দনীয় ঘটনায় নিজের শিশুর ভুল-ত্রুটি খোঁজ করে বিচক্ষণতা ও মনোযোগের সাথে তা সংশোধন করার আন্তরিক চেষ্টা করবে।

৩০. সন্তানদের সাথে সখ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং এ ব্যাপারে বিবেকবানের ভূমিকা পালন করবে। স্বাভাবিকভাবে যদি কোন সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগ হয় তা ক্ষমাযোগ্য কিন্তু আচার ব্যবহারে লেন-দেনে সর্বদা ইনসাফ ও সমতার দৃষ্টি রাখবে এবং কখনো কোন এক সন্তানের প্রতি এরূপ এক পাক্ষিক ব্যবহার করবে না যা অন্যান্য সন্তানরা বুঝতে পারে।

একদা হযরত নোমান (রাঃ)-এর পিতা হযরত বশীর (রাঃ) নিজের ছেলেকে সাথে নিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর সামনে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট একটি গোলাম ছিল, তাকে আমি আমার এ ছেলেকে দান করেছি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এক একটি গোলাম দান করেছো? বশীর (রাঃ) বললেন, না। হুযুর (সাঃ) তখন বললেন, "এ গোলামটি তুমি ফেরৎ নিয়ে নাও।" আরও বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের সাথে সমান ও সমতার ব্যবহার করো। অতঃপর হযরত বশীর (রাঃ) ঘরে ফিরে এসে নোমান (রাঃ) থেকে নিজের দেয়া গোলাম ফেরৎ নিয়ে নিলেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তিনি বলেছেন, "তুমি আবার গুনাহের উপর আমাকে সাক্ষী কর না, আমি অত্যাচারের সাক্ষী হবো না। অন্য এক বর্ণনায় এরূপ আছে যে, হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেছেন, "তুমি কি ইহা চাও যে, তোমার সকল ছেলে তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করুক?" হযরত বশীর (রাঃ) বলেলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন নয়? রাসূল (সাঃ) বললেন, "তা হলে এরূপ কাজ করো না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৩১. শিশুদের সামনে সর্বদা উত্তম উদাহরণ পেশ করবে। তোমার চারিত্রিক গুণাবলী তোমার শিশুদের জন্য সার্বক্ষণিক শিক্ষক, যার থেকে শিশুরা সব সময় পড়তে ও শিখতে থাকে। শিশুদের সামনে কখনো ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলবে না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) নিজের এক কাহিনী বর্ণনা করলেন যে, একদা হুযুর (সাঃ) আমাদের ঘরে উপস্থিত ছিলেন, আমার মাতা আমাকে ডেকে বললেন, "এখানে এসো, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো।" হুযুর (সাঃ) দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি শিশুকে কি দিতে চেয়েছো?" আমার মা বললেন, "আমি তাকে খেজুর দিতে চেয়েছি।" তিনি আমার মাকে বললেন, "তুমি যদি দেয়ার ভান করে ডাকতে আর শিশু আসার পর কিছু না দিতে, তাহলে তোমার আমলনামায় এ মিথ্যা লিখে দেয়া হতো। *(আবু দাউদ)*

৩২. কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় ঐরকম আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করবে যেরূপ ছেলে জন্মগ্রহণের পর করা হয়। মেয়ে হোক অথবা ছেলে উভয়ই আল্লাহর দান। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন বান্দার জন্যে মেয়ে ভাল না ছেলে ভাল। কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করা, মন ভাঙ্গা প্রকৃত মুমিনের পক্ষে কখনো শোভা পায় না। এটা না শোকরীও বটে এবং মহান জ্ঞানী ও মহান দাতা আল্লাহর মর্যাদা হানিও বটে।

হাদীসে আছে যে, "কারো ঘরে যখন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন আল্লাহ তাআলা তার ঘরে একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন এবং তিনি এসে বলেন, হে ঘরের অধিবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তিনি কন্যা সন্তানটিকে নিজের পাখার নিচে নিয়ে নেন এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, ইহা একটি দুর্বল প্রাণ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি এ কন্যা সন্তানটির লালন-পালন করবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার ওপর জারী থাকবে। *(তিবরানী)*

৩৩. কন্যাদের প্রশিক্ষণ ও লালন-পালন অত্যন্ত সন্তুষ্টিচিত্তে, আন্তরিক শান্তি এবং দীনি অনুভূতির সাথে করবে। এর বিনিময়ে উপহার স্বরূপ সর্বোচ্চ বেহেশতের আকাংখা করবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিনটি বোনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদেরকে

দীনি ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছে এবং তারা স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে দয়া সুলভ ব্যবহার করেছে এমন ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তাআলা বেহেশত ওয়াজিব করে দেন। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, যদি দু'জন হয়? রাসূল (সাঃ) বললেন, তার জন্যেও এ পুরস্কার। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, লোকেরা যদি একটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি একটির লালন-পালন সম্পর্কেও একই সু-সংবাদ দিতেন। *(মেশকাত)*

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন, একদিন এক মহিলা তার দুই কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে ভিক্ষা চাইল, ঐ সময় আমার নিকট শুধু একটি খেজুর ছিল। আমি তাই তার হাতে দিয়ে দিলাম, মহিলা খেজুরটিকে দু' টুকরা করে দু'কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল অথচ নিজে কিছুই খেল না। এরপর মহিলা চলে গেল। এ সময় রাসূল (সাঃ) ঘরে আসলেন। আমি এ ঘটনা তাঁকে শুনালাম। তিনি শুনে বললেন, যে ব্যক্তিকে এই কন্যা সন্তানের জন্মের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তা হলে এ কন্যারা তার জন্যে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার অন্যতম কারণ হয়ে যাবে। *(মিশকাত)*

৩৪. কন্যা সন্তানকে তুচ্ছ মনে করবে না, ছেলে সন্তানদেরকে কন্যাদের ওপর কোন ব্যাপারেই প্রাধান্য দেবে না। উভয়ের সাথে একই ধরনের ভালবাসা প্রকাশ করবে এবং একই প্রকার ব্যবহার করবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং অন্ধকার যুগের ন্যায় জীবিত কবর দেয়নি, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেনি, ছেলে সন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য দেয়নি এবং বেশী যোগ্য মনে করেনি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। *(আবু দাউদ)*

৩৫. সম্পত্তিতে কন্যাদের নির্ধারিত অংশ সম্মানের সাথে দিয়ে দেবে। এটা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ এতে কম ও বেশী করার কারো কোন ক্ষমতা নেই। কন্যার অংশ দেবার বেলায় কুট কৌশল অবলম্বন করা অথবা নিজের মন মত কিছু দিয়ে দেয়ায় নিরাপদ হয়ে যাওয়া প্রকৃত মুমিনের কাজ নয়। এরূপ করা খেয়ানতও বটে এবং আল্লাহ তাআলার দীনের খেয়ানত।

৩৬. এ সকল চেষ্টার সাথে সাথে অত্যন্ত আবেগ-অনুভূতির সাথে সন্তানদের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোআও করতে থাকবে। তাহলে মহান আল্লাহর নিকট আশা করা যায় যে, মাতা-পিতার গভীর আন্তরিক আবেগময় দোআসমূহ নষ্ট করবেন না।

১. বন্ধুদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং বন্ধুদের জন্য বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে থাকবে। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যাকে তার বন্ধুবান্ধব ভালবাসে এবং সেও বন্ধু-বান্ধবকে ভালবাসে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবান সে যার প্রতি লোকেরা অসন্তুষ্ট এবং সেও লোকদের থেকে দূরে থাকে। যার ধন-সম্পদ নেই সে নিঃস্ব বরং প্রকৃত নিঃস্ব হলো ঐ ব্যক্তি যার কোন বন্ধু নেই, বন্ধুর জীবন সৌন্দর্য জীবন-যাত্রার সহায়ক এবং আল্লাহর নেয়ামত। বন্ধু তৈরী করুন এবং বন্ধু হয়ে থাকুন।

পবিত্র কুরআনে আছে–

"মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পর একে অন্যের বন্ধু ও সাহায্যকারী।"

(সূরা তওবাহ)

রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং প্রত্যেকেই অনুভব করত যে রাসূল (সাঃ) তাকেই সকলের থেকে বেশী ভালবাসেন।

হযরত আমর বিন আছ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) আমার সাথে এরূপ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে আলাপ করতেন এবং খেয়াল রাখতেন যে, আমার মনে হতে লাগলো আমিই আমার কওমের সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি। একদিন আমি রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে বসলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সর্বাধিক উত্তম না আবু বকর (রাঃ)? রাসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন, আবু বকর। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমি উত্তম না কি ওমর (রাঃ)? তিনি উত্তর দিলেন, ওমর (রাঃ)। আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উত্তম না ওসমান (রাঃ) ? তিনি বললেন ওসমান (রাঃ)। অতঃপর আমি রাসূল (সাঃ) থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে মূল তথ্য জানলাম, তিনি পক্ষপাতহীনভাবে পরীক্ষার কথা বলেছিলেন। তখন আমি আমার এ অশোভনীয় পদক্ষেপে অত্যন্ত লজ্জিত হলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম যে, এরূপ কথা জিজ্ঞেস করার আমার কি এমন প্রয়োজন ছিল!

২. বন্ধুদের সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে জীবন-যাপন করবে এবং অকৃত্রিম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে মুসলমান লোকদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের পক্ষ থেকে আগত কষ্ট মেনে নেয় সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে কতইনা উত্তম যে ব্যক্তি লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং তাদের পক্ষ থেকে আগত কষ্টে অধৈর্য্য ও অস্থির হয়ে পড়ে। *(তিরমিযী)*

৩. সর্বদা সৎ ও নেককার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং বন্ধু নির্বাচনে এ কথার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে, যাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বাড়াচ্ছ তারা দীন ও চারিত্রিক দিক থেকে তোমার জন্য কতটুকু উপকারী হতে পারে? "কারো চারিত্রিক অবস্থা জানতে হলে তার বন্ধুদের চারিত্রিক অবস্থা জেনে নাও।" রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "মানুষ তার বন্ধুর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা করা দরকার, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" *(মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)*

বন্ধুর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ এই যে, সে যখন বন্ধুর সাহচর্যে আসবে তখন তার মধ্যে ঐ আবেগ ও চিন্তাধারা আর ঐ আস্বাদন ক্ষমতা ও প্রবণতাই সৃষ্টি হবে যা তার বন্ধুর মধ্যে বিদ্যমান। আর পছন্দ অপছন্দের নিরিখ তাই-ই হবে যা তার বন্ধুর আছে। সুতরাং মানুষের বন্ধু নির্বাচনে অত্যন্ত গভীর চিন্তা ও বিবেচনা করা উচিত আর এমন ব্যক্তির সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত যার চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা এবং চেষ্টা-তদবীর দীন ও ঈমানের শর্ত অনুযায়ী হয়। রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, "মুমিন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক মজবুত কর। তার সাথেই পানাহার করো।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "মুমিনের সাহচর্যে থাকো আর যেন তোমাদের দস্তরখানে পরহেজগার লোকেরাই আগে খানা খায়।"

এক দস্তরখানে বসে পানাহার করা আন্তরিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী আর এ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্বরূপ মুমিনদের সাথেই হওয়া উচিত যে আল্লাহকে ভয় করে। অমনোযোগী, দায়িত্বহীন, বে-আমল ও চরিত্রহীন লোকদের নিকট থেকে সর্বদা দূরে থাক। রাসূল (সাঃ) ভাল ও মন্দ বন্ধুর সাথে সম্পর্কের অবস্থাকে একটি সুন্দর উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করেছেন ঃ

ভাল এবং মন্দ বন্ধুর উদাহরণ কস্তুরি (মেশক) বিক্রেতা ও কামারের চিমনী বিক্রেতা। কস্তুরি বিক্রেতার সাহচর্যে তুমি কোন উপকার পেতে পার হয়তো কস্তুরি খরিদ করবে অথবা তার সুগন্ধ পাবে, কিন্তু কামারের চিমনী তোমার বাড়ী ঘর অথবা কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তোমার মস্তিষ্কে দুর্গন্ধ পৌছবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

আবু দাউদ শরীফের হাদীসের শব্দসমূহ এরূপ আছে ঃ

নেককার (সৎ) বন্ধুর উদাহরণ এরূপ তার যেমন কস্তুরী বিক্রেতা বন্ধুর দোকান থেকে আর কোন উপকার না পেলেও সুগন্ধিতো অবশ্যই আসবে আর অসৎ বন্ধুর উদাহরণ এরূপ যেমন, কামারের চিমনী থেকে আগুন না লাগলেও তার ধুঁয়াতে কাপড় তো অবশ্যই কালো হয়ে যাবে।"

৪. বন্ধুদের সাথে শুধু আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব করবে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাহগণ তারা যারা আল্লাহর দীনের জন্য একত্রিত হয় এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অন্তরের সাথে অন্তর মিলিয়ে আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা ও কর্তব্য সম্পাদন করে যে, তাদেরকে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত মনে হয়।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। *(সূরায়ে ছফ-৪)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, ঐ সব লোকেরা কোথায়? যারা শুধু আমার জন্যই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতো। আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় স্থান দেবো।" *(মুসলিম)*

কিয়ামতের দিন যাদের গৌরবময় জাঁকজমকপূর্ণ মর্যাদা লাভ হবে তাদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

আল্লাহর বান্দাহদের মধ্য থেকে সেই সকল বান্দাহ এমন সৌভাগ্যবান যারা নবীও নন শহীদও নন কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন মর্যাদায় সমাসীন করবেন যে, নবী ও শহীদগণও তাদের মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কারা? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা শুধু আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে একে অন্যকে ভালবাসতো, তারা পরস্পর আত্মীয়-স্বজনও ছিল না এবং তাদের মধ্যে কোন অর্থ সম্পদের লেন-দেনও ছিল না। আল্লাহর শপথ কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা নূরে ঝকঝক করতে থাকবে, তাদের আপাদমস্তক শুধু নূর হবে আর সমস্ত লোক যখন ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপতে থাকবে তখন তাদের কোন ভয়ই হবে না এবং সকল লোক যখন দুঃখে পতিত হবে তখন তাদের কোন দুঃখই হবে না। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ *(আবু দাউদ)*

"সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুগণের কোন ভয় নেই আর তাঁরা চিন্তিতও হবে না।"

হযরত আবু দরদা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

কিয়ামতের দিন কিছু লোক তাদের কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠবেন যে, তাদের মুখমণ্ডল নূরে ঝকঝক করতে থাকবে। তাদেরকে মুক্তা খচিত মিম্বরে বসানো হবে এবং লোকেরা এদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবে, অথচ এরা নবীও নন এবং শহীদও নন, এক বেদুঈন জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অথচ এরা কোন লোক? আমাদেরকে এদের পরিচয় দিন। তিনি উত্তর দিলেন, এরা তারা যারা পরস্পর আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করতো।" *(তিবরানী)*

৫. সৎ লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাকে পরকালের মুক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় মনে করবে এবং আল্লাহর নিকট দোআ করবে যে, আয় আল্লাহ্! আমাকে সৎ লোকদের বন্ধুত্ব দান করুন এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন নেক লোকের সাথে তার নেকীর কারণে বন্ধুত্ব করে, কিন্তু সে নিজেই ঐ ব্যক্তির মত নেক কাজ করে না। আল্লাহর নবী বললেন, কোন ক্ষতি নেই, মানুষ কিয়ামতের দিন তার সাথেই হবে যাকে সে ভালবাসবে। *(বুখারী)*

একরাতে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর দীদার লাভ করলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাঃ) কে বললেন, কিছু দোয়া করুন। তখন রাসূল (সাঃ) এই দো'আ করলেন ঃ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নেক কাজ করার তাওফীক চাই। খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে চাই। মিসকিনদের ভালবাসা চাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো,আমার প্রতি দয়া করো। কোন জাতিকে আযাব দেবার মনস্থ করলে আমাকে তার আগে উঠিয়ে নিও। আমি তোমার নিকট তোমার বন্ধুত্বের কামনা করি, আর তার বন্ধুত্ব কামনা করি, যে তোমার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আর যে আমল দ্বারা বন্ধুত্বের নিকটবর্তী হওয়া যায় সেরূপ আমল করার তাওফীক প্রার্থনা করি।" *(মুসনাদে আহমদ)*

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ বলেন, আমার উচিত যে, আমি তাদেরকে ভালবাসব যারা আমার জন্য পরস্পর ভালবাসা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে, যারা আমার আলোচনায় একত্রিত হয়, যারা আমার বন্ধুত্বের কারণে পরস্পর সাক্ষাত করে আর আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর সদ্ব্যবহার করে।" *(আহমদ তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) দু' বন্ধুর সাক্ষাতের এক উত্তম চিত্র তুলে ধরে বলেছেন ঃ

"এক ব্যক্তি অন্যস্থানে তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে রওয়ানা হলো। আল্লাহ তার পেছনে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করলেন। ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছো? সে উত্তর দিল, ঐ মহল্লায় আমার এক বন্ধু থাকে তার সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। ফিরিশতা বলেন, তোমার কি তার নিকট কিছু পাওনা আছে যা তুমি আদায় করতে যাচ্ছ? সে বলে, না, আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। অতঃপর ফিরিশতা বলেন, তাহলে শুন! আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন এবং এ সংবাদ দান করেছেন যে তিনি (আল্লাহ) তোমার সাথে ঐরকম বন্ধুত্ব রাখেন যেমন তুমি তোমার বন্ধুর সাথে আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব রাখছো।" *(মুসলিম)*

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের উপযুক্ত লোকদের সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। অতঃপর সারা জীবন ঐ বন্ধুত্ব অটুট রাখার জন্য চেষ্টাও করবে। বন্ধুত্বের জন্যে যেমন সৎ লোক নির্বাচন করা প্রয়োজন তদ্রূপ উক্ত বন্ধুত্বকে অটুট ও স্থায়ী রাখাও প্রয়োজন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তখন সাত প্রকারের লোক আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে। তার মধ্যে এক প্রকারের লোক হলো যারা দু'জন একে অন্যকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালবাসতো। আল্লাহর মহব্বত তাদেরকে পরস্পরের সংযোগ করেছে এবং এ ভিত্তির উপরই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে। অর্থাৎ তাদের বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্যই হবে আর তারা জীবনভর এ বন্ধুত্বকেও অটুট রাখতে চেষ্টা করবে। আর যখন এদের মধ্যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করবে তখন বন্ধুত্বের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে।

৭. বন্ধুদের ওপর বিশ্বাস রাখবে, তাদের সঙ্গে হাসি-খুশি থাকবে। নিরুৎসাহ থাকতে এবং বন্ধুদেরকে নিরুৎসাহ করা থেকে বিরত থাকবে,

বন্ধুদের সাহচর্যে আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদেরও প্রফুল্ল সহচর হতে চেষ্টা করবে। তাদের সাহচর্যে বিরক্ত না হয়ে বরং আনন্দময় জীবন ও আকর্ষণ অনুভব করবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন হারেস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর চেয়ে বেশী মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি। *(তিরমিযি)*

হযরত জাবের বিন সামুর (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) এর সাহচর্যে আমি এক শতেরও অধিক মজলিসে বসেছি, এ সকল মজলিসে সাহাবায়ে কেরামগণ কবিতা পাঠ করতেন এবং জাহেলী যুগের কিচ্ছা-কাহিনীও শুনাতেন। রাসূল (সাঃ) চুপ থেকে এসব শুনতেন এবং কখনো তিনি তাদের সাথে হাসিতেও অংশ গ্রহণ করতেন। *(তিরমিযি)*

হযরত শারীদ (রাঃ) বলেন যে, আমি একবার রাসূল (সাঃ)-এর সওয়ারীর উপর তাঁর পেছনে বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। সওয়ারীর উপর বসে বসে আমি রাসূল (সাঃ)-কে উমাই বিন ছালাহর একশত কবিতা শুনালাম। প্রত্যেক কবিতার পর তিনি বলতেন, আরো কিছু শুনাও আর আমি শুনাতাম।

রাসূল (সাঃ) তাঁর মজলিসে নিজেও কিচ্ছা-কাহিনী শুনাতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে, একবার তিনি পরিবারএর লোকদেরকে একটি কাহিনী শুনালেন। এক মহিলা বলে উঠলেন, এ বিস্ময়কর অদ্ভুত কাহিনী তো মনে হয় একেবারে খোরাফার কাহিনীর মত। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি কি খোরাফার কাহিনী জান? অতঃপর তিনি খোরাফার মূল কাহিনী বিস্তৃতভাবে শুনালেন। এরূপ একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এগার রমণীর এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনালেন।

হযরত বকর বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর আনন্দ-স্ফূর্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হাসি ও আনন্দ-স্ফূর্তির আবেগে একে অন্যের প্রতি তরমুজের খোসা পর্যন্ত নিক্ষেপ করতেন। সে লড়াই প্রতিরোধ করার দায়িত্বশীলও হতেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

হযরত মোহাম্মদ বিন যিয়াদ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি পূর্ববর্তী নেককার লোকদেরকে দেখেছি যে, কয়েক পরিবার একই বাড়ীতে বসবাস করত। অনেক সময় এরূপ হতো যে, কারো ঘরে মেহমান এবং অন্য কারো ঘরের

চুলায় হাঁড়ি চড়ানো থাকতো। তখন মেহমানওয়ালা তার মেহমানদের জন্য বন্ধুর হাঁড়ি নামিয়ে নিয়ে যেতো, পরে হাঁড়ির মালিক হাঁড়ির খোঁজ করে ফিরত এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করত যে, আমার হাঁড়ি কে নিয়ে গিয়েছে? ঐ মেজবান বন্ধু তখন বলতো যে, ভাই। আমার মেহমানের জন্য আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। ঐ সময় হাঁড়ির মালিক বলতো, আল্লাহ্ তোমার জন্য বরকত দিক। মোহাম্মদ বিন যিয়াদ (রহঃ) বলেছেন যে, তারা যখন রুটি বানাতো তখনও প্রায়ই এ অবস্থা হতো। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "কখনও কখনও অন্তরকে স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত কর। আনন্দদায়ক রসিকতারও চিন্তা করো। কেননা শরীরের মত অন্তরও ক্লান্ত হয়ে যায়।

৮. রুক্ষ স্বভাব ও মনমরা হয়ে থাকবে না। আনন্দ ও হাসি-খুশি থাকবে। কিন্তু এ বিষয়ে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবে যে, নিজের আনন্দিত হওয়া যেনো সীমাহীন না হয়। সীমালংঘন না করে। প্রফুল্লতা ও আমোদ-প্রমোদের সাথে সাথে দীনি গাম্ভীর্য, মর্যাদাবোধ, লজ্জাবোধ এবং সমতা ও মিথ্যাচারের প্রতিও সতর্ক লক্ষ্য রাখবে। (তিরমিযি)

রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবী হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণ কখনো রুক্ষ স্বভাবের ছিলেন না এবং মরার মতও চলতেন না। তারা তাদের মজলিসে কবিতাও পাঠ করতেন এবং জাহেলী যুগের কিচ্ছা-কাহিনীও বর্ণনা করতেন। কিন্তু কোন ব্যাপারে যখন তাদের নিকট থেকে সত্যের বিপরীত কোন কথার দাবী উঠতো তখন তাদের চেহারা জ্বীনে ধরা ব্যক্তির ন্যায় বিবর্ণ হয়ে যেত।
(আল আদাবুল মুফরাদ)

প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ (মশহুর মুহাদ্দিস) হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনার নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হাসি-ঠাট্টা কি এক প্রকার বিপদ? তিনি উত্তর দিলেন, না বরং সুন্নাত কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত আছে এবং উত্তম ঠাট্টা করতে পারে।
(শরহে শামায়েলে তিরমিযি)

৯. তুমি যে ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব কর তার নিকট তোমার বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করবে। তাতে তার মানসিক প্রভাব এমন হবে যে, তার মধ্যে নৈকট্যের ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। উভয়পক্ষের আকর্ষণ ও অনুভূতির বিনিময়ে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর বন্ধুত্ব শুধু এক আন্তরিক

অবস্থা থাকবে না বরং তার দাবী কর্মজীবনের উপর প্রভাবশীল হবে আর এভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপারে মনোযোগ দিতে ও একে অন্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী হবার সুযোগ পাবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তির অন্তরে তার দীনি ভাইদের জন্য বন্ধুত্বের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তখন তার উচিত তার বন্ধুকে এ বিষয়ে অবহিত করা যে, সে তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে। *(আবু দাউদ)*

একবার রাসূল (সাঃ)এর সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, ঐ সময় কিছু লোক তার সম্মুখে বসা ছিল। তন্মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তির সাথে আমার শুধু আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব আছে। শুনে রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে একথা জানিয়ে দিয়েছো? সে বলল, না। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, যাও, তার নিকট প্রকাশ করে দাও যে, তুমি আল্লাহর জন্যে তার সাথে বন্ধুত্ব করেছো। সে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি গিয়ে পথে ঐ ব্যক্তির নিকট নিজের আবেগের কথা প্রকাশ করলো। তার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললো, তোমার সাথে তিনি বন্ধুত্ব করুন যার.জন্যে তুমি আমার সাথে বন্ধুত্ব করেছো।
(তিরমিযি, আবু দাউদ)

বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সর্বাধিক মজবুত এবং ফলপ্রসূ করা ও বন্ধুদের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো, বন্ধুদের ব্যক্তিগত ও অন্যান্য ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দনীয় সীমারেখা পর্যন্ত মনোযোগ দেবে এবং তাদের সাথে নৈকট্য ও বিশেষ সম্পর্কের কথা অবলীলায় প্রকাশ করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"একজন মানুষ যখন অন্য মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সংযোগ স্থাপন করে তখন তার কাছ থেকে তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার পারিবারিক অবস্থার কথা জেনে নেবে, এতে করে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন মজবুত ও দৃঢ় হয়। *(তিরমিযি)*

১০. বন্ধুত্বের প্রকাশ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, এরূপ নিরুত্তাপ ভাব প্রদর্শন করবে না, যাতে নিজের বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ সন্দেহজনকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় আর বন্ধুত্বের আবেগে এতটুকু অগ্রসর হবে না যে, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা উন্মাদনার আকার ধারণ করে। যদি কোন সময় অনুশোচনা করতে হয়, সমতাও মধ্যম পন্থার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখবে এবং স্থির মস্তিষ্কে এরূপ ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করবে যা সব সময় সম্পাদন করতে পারবে।

হযরত আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের বন্ধুত্বের মাঝে যেনো উন্মাদনা প্রকাশ না পায় আর তোমাদের শত্রুতা যেনো কষ্টদায়ক না হয়। আমি বললাম হযরত কিভাবে? তিনি বললেন, যখন তোমরা বন্ধুত্ব করতে আরম্ভ করো তখন শিশুদের মত জড়িয়ে ধরো এবং আবেগে শিশু সুলভ আচরণ করতে আরম্ভ করো। আর কারো সাথে যদি মনোমালিন্য হয় তা হলে তার প্রাণ ও ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়ে যাও। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত ওবাইদ কিন্দী (রহঃ) বলেন "আমি হযরত আলী (রাঃ) নিকট থেকে শুনেছি, তোমার বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বে নম্রতা ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, কেননা সে কোন সময় তোমার শত্রুও হয়ে যেতে পারে। তদ্রূপ শত্রুর সাথে শত্রুতায় নম্রতা ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো সম্ভবতঃ সে কোন সময় তোমার বন্ধুও হয়ে যেতে পারে।" *(আল আদাবুল মুফ্রাদ)*

১১. বন্ধুদের সাথে বিশ্বস্ততা ও শুভাকাংখী সুলভ ব্যবহার করবে। বন্ধুর সাথে সর্বাধিক মঙ্গল কামনা কর যে, তাকে চারিত্রিক দিক থেকে সর্বাধিক উপরে উঠাতে চেষ্টা করবে আর তার পার্থিব উন্নতি থেকে পরকালীন উন্নতির অধিক চিন্তা কর। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "দীন সম্পূর্ণটাই মঙ্গল কামনা।" মঙ্গল কামনার মূল এই যে, যা তুমি বন্ধুর জন্যে পছন্দ কর তা তুমি তোমার জন্যে পছন্দ করবে। কেননা মানুষ কখনো নিজের মন্দ কামনা করে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "সেই সত্তার শপথ আমার প্রাণ যার হস্তে। কোন ব্যক্তি খাঁটি মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ না করে যা সে নিজের জন্য করে।"

এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ছয়টি অধিকারের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "সে তার ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করবে, সে অনুপস্থিত বা উপস্থিত থাকুক।" তিনি আরো বলেছেন ঃ নিশ্চিত আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির ওপর জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব ও বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন যে শপথ করে কোন মুসলমানের অধিকারে আঘাত করেছে (সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন) যদি উহা কোন সাধারণ বস্তু হয়? হুযুর (সাঃ) বললেন, উহা পিলুর সাধারণ ডালও হোকনা কেন (পিলু এক প্রকার লতা জাতীয় গাছ যার দ্বারা মেসওয়াক তৈরি করা হয়।)

১২. বন্ধুদের দুঃখে-কষ্টে এবং আনন্দে ও খুশীতে অংশ গ্রহণ করবে। তাদের শোকে শরীক হয়ে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করবে, তাদের আনন্দ স্ফূর্তিতে অংশ গ্রহণ করে তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে। প্রত্যেক বন্ধুই তার খাঁটি বন্ধুদের থেকে স্বাভাবিকভাবেই এ আশা পোষণ করে যে, তারা বিপদের সময় তার সাথে থাকবে এবং প্রয়োজনের সময়ও তার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। অনুরূপ সে এও আশা করে যে, বন্ধু তার আনন্দ-স্ফূর্তি বৃদ্ধি করবে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করে অনুষ্ঠানের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য ইমারত স্বরূপ। যেমন ইমারতের এক ইট অন্য ইটের শক্তি ও সহায়তা যোগায়। এরপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে প্রবেশ করালেন। (আর মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ও ঘনিষ্ঠতাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন।) *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন ঃ "তোমরা মুসলমানদের পরস্পরে দয়াদ্র হৃদয় বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং পরস্পর কষ্টের অনুভূতিতে এমন হবে যেমন এক শরীর, যদি তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয় তা হলে সারা শরীর অসুস্থ হয়ে থাকে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

১৩. বন্ধুদের সাথে সন্তুষ্টি, নম্র স্বভাব, আনন্দ প্রফুল্লতা ও অকৃত্রিমভাবে মিশবে আর অত্যন্ত মনোযোগ ও হাসিমুখে তার অভ্যর্থনা করবে। বেপরোয়াভাব ও রুক্ষতা থেকে দূরে থাকবে। এসব অন্তর বিদীর্ণকারী কুস্বভাব। সাক্ষাতের সময় সর্বদা আনন্দ উল্লাস, শান্তি এবং শুকরিয়া ও হামদ এর শব্দসমূহ ব্যবহার করবে। দুঃখ-কষ্ট ও মনে ব্যথা পায় এমন কথা কখনো মুখে আনবে না। সাক্ষাতের সময় এরূপ চালচলন করবে যে, বন্ধু আনন্দ অনুভব করে। এমন নির্জীব ভাবে তাকে অভ্যর্থনা করবে না যে, তার মন দুর্বল হয়ে যায় এবং সে তার সাক্ষাতকে নিজের জন্য আযাব মনে করে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "নেকসমূহের মধ্য থেকে কোন নেককে তুচ্ছ মনে করবে না তা এমনই হোক না যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হচ্ছ।" *(মুসলিম)*

অন্য একস্থানে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমার আপন ভাইকে দেখে হাসি দেওয়াও সদক্বাহ।" *((তিরমিযি)*

নম্র স্বভাব এবং উত্তম চরিত্রের দ্বারাই অন্তরে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় আর এসব গুণের কারণে সুন্দর সমাজ সৃষ্টি হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি তোমাদেরকে ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিচ্ছি যার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম এবং জাহান্নামের আগুনের ওপরও সে হারাম, এ ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যে নম্র প্রকৃতি, নম্র স্বভাব ও নম্র চরিত্রের।" *(তিরমিযি)*

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (সাঃ) সাক্ষাতের সময় যখন কারো দিকে নিবিষ্ট হতেন তখন সম্পূর্ণ শরীর তার দিকে ফিরাতেন আর যখন কেউ তাঁর সাথে আলাপ করত তখন তিনি পূর্ণ মনোযোগী হয়ে তার কথা শুনতেন।

একবার তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন লোক আসায় তিনি শরীরকে নাড়া দিয়ে একটু সংকোচিত হলেন, লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জায়গা তো আছে। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "মুসলমান এমন হবে যে, তার ভাই যখন তাকে আসতে দেখে তখন সে তার জন্যে নিজের শরীরকে একটু নাড়া দেবে।" *(বায়হাকী)*

মুমিনদের প্রশংসায় পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "তারা মুমিনদের জন্য অত্যন্ত নরম স্বভাবের।"

রাসূল (সাঃ) এর মূল তত্ত্বকে এভাবে প্রকাশ করেছেন।

"মুমিন ঐ উটের ন্যায় সহনশীল ও নরম স্বভাবের হবে যার নাকে দড়ি লাগান হয়েছে, তাকে টানলে চলে আবার পাথরের ওপর বসালেও সে বসে যায়।" *(তিরমিযী)*

১৪. কখনো যদি কোন কথায় মতভেদ হয় তা হলে সত্বর আপোষ করে নেবে। সর্বদা ক্ষমা চাইতে ও নিজের অন্যায় স্বীকার করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

১৫. বন্ধুদের কোন কথা যদি তোমার স্বভাব ও রুচির বিরুদ্ধ হয় তা হলে তুমি তোমার মুখের জবানকে সংযত রাখবে আর উত্তরে কখনো কর্কশ কথা অথবা মুখ খারাপ করবে না বরং বিজ্ঞতা ও নম্রতার সাথে কথা পরিহার করে যাবে! ক্ষমা করে দেবে।

রাসূল (রাঃ) বলেছেন–

"হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আয় আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? আল্লাহ জবাব দিলেন, যে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেবে।

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন–

"মুমিনের পাল্লায় কিয়ামতের দিন সর্বাধিক ওজনীয় যে বস্তু রাখা যাবে তা হলো তার উত্তম চরিত্র। যে নির্লজ্জ মুখে কথা বলে এবং গালি দেয় আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অত্যন্ত ঘৃণিত।"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহ) সচ্চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন তিনটি বাক্য দ্বারাঃ

১. যখন মানুষ কারো সাথে সাক্ষাৎ করে তখন হাসি মুখে সাক্ষাৎ করে।'

২. অভাব গ্রস্ত ও কপর্দকহীন বান্দাদের জন্য খরচ করে।

৩. কাউকে কষ্ট দেয় না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তালার দৃষ্টিতে সর্বাধিক খারাপ লোক হলো সেই ব্যক্তি যার গালি ও কর্কশ কথার কারণে মানুষ তার নিকটে আসা ছেড়ে দিয়েছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

১৬. তুমি বন্ধুদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ কাজে কখনো অলসতা করবে না, আর নিজের বন্ধুদের মধ্যে এমন রোগ সৃষ্টি হতে কখনো দেবেনা যা সংশোধন বা প্রশিক্ষণের পথে সর্বাধিক প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ আত্মার সন্তুষ্টি ও অহংকার। বন্ধুদেরকে সর্বদা উৎসাহ দান করতে থাকবে, তারা যেনো তাদের ভুলত্রুটিসমূহ স্বীকার করে। নিজেদের ভুল স্বীকার করতে যেনো বীরত্ব প্রদর্শন করে। এ মূলতত্ত্বকে সর্বদা নজরে রাখবে যে, নিজের ভুল স্বীকার না করা এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য হঠকারিতার আশ্রয় নেয়ার দ্বারা প্রবৃত্তি ও আত্মা অত্যন্ত খারাপ খোরাক পায়।

প্রকৃতপক্ষে লোক দেখানো বিনয় ও মিনতি প্রকাশ করা, নিজেকে তুচ্ছ বলা, চলাফেরা ও চালচলনে বিনয় ও মিনতি প্রকাশ করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু নিজের মানসিকতার উপর আঘাত সহ্য করা, নিজের ক্রটিসমূহ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে শুনা এবং স্বীকার করে নেয়া এবং নিজের মানসিকতার বিপরীত বন্ধুদের সমালোচনা সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তিনিই প্রকৃত বন্ধু যিনি সচেতন মস্তিষ্কে একে অন্যের প্রতি খেয়াল রাখেন।

রাসূল (রাঃ) বলেছেন–

তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে দেয়ঃ

১. এমন সব আকাংখা যা মানুষকে অনুগত ও দাস করে রাখে।

২. এমন লোভ যাকে পরিচালক মেনে মানুষ তার অনুসরণ করতে থাকে।

৩. আত্ম-সন্তুষ্টি -এ রোগ তিনটির মধ্যে সর্বাধিক ভয়ংকর।

সমালোচনা ও হিসাব-নিকাশ এমন এক অমোঘ অস্ত্রোপচার যা চারিত্রিক দেহের ক্ষতিকর পদার্থগুলোকে সমূলে বের করে দেয়। চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় যথার্থ পরিবর্ধন করে ব্যক্তিগত ও সামাজিকতায় নব জীবন দান করে। বন্ধুদের হিসাব-নিকাশ ও সমালোচনায় অসন্তুষ্ট হওয়া, ভ্রু কুঁচকানো আর নিজেকে তার থেকে বেপরোয়া মনে করাও ধ্বংস বা ক্ষতিকর এবং এ পছন্দনীয় কর্তব্য সম্পাদনে ক্রটি করাও ধ্বংস বা ক্ষতিকর। বন্ধুদের আঁচলে ঘৃণ্য দাগ দৃষ্টিগোচর হলে অস্থিরতা অনুভব করবে, এবং সেগুলো দূর করার জন্য বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। অনুরূপ নিজেও খোলা মন ও বিনয়ের সাথে বন্ধুদেরকে সব সময় এ সুযোগ দিবে, তারা যেনো তোমার দাগ-কলঙ্ককে তোমার নিকট তুলে ধরে। রাসূল (সাঃ) বন্ধুত্বের এ অবস্থাকে এক উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

“তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভাইয়ের আয়না।

সুতরাং সে যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোন খারাপ কিছু দেখে তা হলে তার থেকে দূর করে দেবে।” (তিরমিযি)

এ উদাহরণে পাঁচটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যাকে সামনে রেখে তুমি তোমার বন্ধুত্বকে প্রকৃত বন্ধুত্বে রূপদান করতে পার।

(১) আয়না তোমার দাগ ও কলংক তখনই প্রকাশ করে যখন তুমি তোমার দাগ, কলংক দেখার উদ্দেশ্যে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, আর তুমি যখন তার সম্মুখ থেকে সরে যাও তখন সেও পরিপূর্ণ নীরবতা পালন করে।

অনুরূপভাবে তুমি তোমার বন্ধুর দোষসমূহ তখনই প্রকাশ করবে যখন সে নিজেকে সমালোচনার জন্য তোমার সামনে পেশ করে এবং খোলা মনে সমালোচনা ও হিসাব নিকাশের সুযোগ দেয় আর তুমিও

অনুভব কর যে, এ সময় বোধশক্তি সমালোচনা শুনার জন্য এবং অন্তরে সংশোধন কবুল করার জন্য প্রস্তুত আছে, তুমি যদি এ অবস্থা না পাও তাহলে বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজের কথাকে অন্য কোন সুযোগের অপেক্ষায় রাখবে এবং নীরবতা অবলম্বন করবে। তার অনুপস্থিতিতে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করবে যে তোমার মুখে যেন এমন কোন শব্দও না আসে যার দ্বারা তার কোন দোষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, কেননা ইহা হলো গীবত (পরোক্ষ নিন্দা) আর গীবতের দ্বারা অন্তরের মিলন হয় না বরং বিচ্ছেদ হয়।

(২) আয়না মুখমণ্ডলের সেসব দাগ ও কলঙ্কের সঠিক চিত্র তুলে ধরে বা পেশ করে যা প্রকৃতপক্ষে মুখমণ্ডলে বর্তমান আছে সে কমও বলেনা এবং তার সংখ্যা বাড়িয়েও পেশ করেনা। আবার সে মুখমণ্ডলের সেসব দোষগুলোকেই প্রকাশ করে যা তার মুখে থাকে। সে গুপ্ত দোষসমূহের অনুসন্ধান করে না এবং তন্ন তন্ন করে দোষসমূহের কোন কল্পনাপ্রসূত চিত্র প্রকাশ করে না। অনুরূপভাবে তুমি ও তোমার বন্ধুর দোষসমূহ কম বর্ণনা কর। অনর্থক খোশামোদে পড়ে দোষ গোপন করবে না আবার নিজের ভাষণ বাগ্মীতার জোরে তার কোন বৃদ্ধিও করবে না। আবার শুধু ঐ সকল দোষই বর্ণনা করবে না যা সাধারণ জীবন ধারায় তোমার সামনে এসেছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা ও ছিদ্রান্বেষণে অবতীর্ণ হবে না। গোপন দোষ খোঁজ করা চারিত্রিক খেদমত নয় বরং এক ধ্বংসাত্মক ও চরিত্র বিধ্বংসী অস্ত্র।

রাসূল (সাঃ) একবার মিম্বরে আরোহণ করে অত্যন্ত উচ্চস্বরে উপস্থিত জনতাকে সাবধান করে বললেন ঃ

"মুসলমানদের দোষ ত্রুটির পিছে পড়বে না। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইদের দোষ ত্রুটির পিছে লাগে তখন আল্লাহ তার দোষসমূহ প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং স্বয়ং আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করতে মনস্থ করেন তাকে তিনি অপদস্ত করেই ছাড়েন। যতই সে ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে থাকুক না কেন"। *(তিরমিযি)*

(৩) আয়না প্রত্যেক উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র হয়ে নিরপেক্ষভাবে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে। আর যে ব্যক্তিই তার সামনে নিজের চেহারা পেশ করে সে কোন উদ্দেশ্য ব্যতীতই সঠিক চিত্র সামনে তুলে ধরে। সে কারো সাথে হিংসা বিদ্বেষ রাখেনা এবং কারো থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করেনা। তুমিও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য, প্রতিশোধ, হিংসা বিদ্বেষ এবং সর্বপ্রকার অসদুদ্দেশ্যে নিজেকে পরিপাটি করে নিতে পারো যেমন আয়না দেখে মানুষ নিজেকে পরিপাটি ও সজ্জিত করে নেয়।

(৪) আয়নায় নিজের সঠিক চিত্র দেখে কেউ অসন্তুষ্ট হয় না আর রাগে অস্থির হয়ে আয়না ভেঙ্গে দেয়ার মত নির্বুদ্ধিতাও কেউ করোনা। বরং তাড়াতাড়ি নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়ার কাজে লেগে যায় এবং আয়নায় মর্যাদা ও মূল্য অনুভব করে মনে মনে তার শুকরিয়া আদায় করে এবং ভাবে সত্যি আয়না আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়ার জন্য বড় সাহায্য করেছে ও তার স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছে। অতঃপর তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর যে, সে বন্ধুত্বের হক আদায় করেছে এবং শুধু মুখে নয় বরং আন্তরিকতার সাথে সাথে তার শুকরিয়াও আদায় করে এ মুহূর্ত থেকেই নিজের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের জন্য উদ্বেগাকুল হয়ে যায় এবং অত্যন্ত প্রশান্ত অন্তরে ও উপকার স্বীকারের সাথে বন্ধুর নিকট আবেদন কর যে ভবিষ্যতেও সে যেন তার মূল্যবান পরামর্শ দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে।

(৫) সর্বশেষ ইঙ্গিত এই যে, "মুসলমানদের প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়না" ভাই ভাইয়ের জন্য বন্ধুত্বের প্রতিচ্ছবি, বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্খী এবং ব্যথাতুর হয়। ভাইকে বিপদে দেখে অস্থির হয়ে উঠে এবং সন্তুষ্ট দেখে খুশী হয়ে যায়। সুতরাং ভাই এবং বন্ধু যে সমালোচনা করবে তাতে তোমার উপকার হবে। বন্ধুত্বসূলভ এমনি সমালোচনা দ্বারা বন্ধুত্ব লাভ ও জীবন গঠনের আশা করা যেতে পারে।

১৭. বন্ধুদের সাথেও ভালবাসা প্রকাশ করা এবং বন্ধুত্ব আরো বৃদ্ধি করার জন্য হাদিয়া-তোহফার লেনদেন করবে। হাদিয়ার লেন-দেনে ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"একে অন্যকে হাদিয়া আদান প্রদান করলে পরস্পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে আর অন্তরে বিষন্নতা দূর হয়ে যাবে। *(মেশকাত)*

রাসূল (সাঃ) নিজেও তাঁর আসহাবকে হাদিয়া দিতেন। তাঁর সাহাবাগণও পরস্পর হাদিয়া দিতেন ও নিতেন। হাদিয়া মূল্যবান না হওয়ার কারণে বন্ধুর হাদিয়াকেও কখনো তুচ্ছ মনে করবে না। তার আন্তরিকতা ও ভালবাসার প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"কেউ যদি আমাকে তোহফা স্বরূপ ছাগলের একটি পাও প্রদান করে তা হলে অবশ্যই তা গ্রহণ করবো। কেউ যদি আমাকে দাওয়াত করে একটি পাও খাওয়ায় তা হলে আমি অবশ্যই ঐ দাওয়াতে যাব। *(তিরমিযী)*

হাদিয়ার পরিবর্তে হাদিয়া অবশ্যই দেবে। রাসূল (সাঃ) এর গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয় তোহফা ছিল সুগন্ধিদ্রব্যের তোহফা। তুমিও এ তোহফাকে পসন্দনীয় মনে করবে। বর্তমান কালে দীনি কিতাবও উত্তম তোহফা।

কখনো কখনো এক সাথে বসে খানা পিনার ব্যবস্থা করবে। বন্ধুদেরকে তোমার ঘরে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিবে। বন্ধু-বান্ধবদের কেউ দাওয়াত দিলে অত্যন্ত খুশী মনে তা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা বন্ধুত্বের আবেগ বৃদ্ধি ও দৃঢ় হয়। বরং এ ধরণের স্থানসমূহে অসাধরণ লৌকিকতা প্রদর্শন এবং পানাহারের সাজ সরঞ্জামে প্রাচুর্য দেখানোর স্থলে তুমি অকৃত্রিমতা ও বন্ধুত্বের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধির প্রতি অধিক মনোযোগ দিবে।

১৮. বন্ধুদের খোঁজ-খবর নেবে। প্রয়োজনে তাদের উপকার করবে। জান ও মাল দ্বারা তাদের সাহায্য করবে। ইবনে হানী (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে আবদুল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কে? তিনি উত্তর দিলেনঃ

"মানুষের মধ্যে অধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি যে মানুষের বেশী উপকার করে আর আমলের মধ্যে অধিক প্রিয় আমল হলো কোন মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা এবং এটা এভাবে যে, তুমি তার বিপদ ও অসুবিধা দূর করে দেবে। অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করে দেবে আর কোন ভাইয়ের সাথে তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজনও পূরণ করতে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের বিপদসমূহ থেকে যে কোন একটি বিপদ তার দূর করে দেবেন।" *(বুখারী ,মুসলিম)*

তিনি এও বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করার পুরস্কার ও সওয়াব এর পরিমাণ দশ বৎসরের ইতেকাফ থেকেও বেশী।" (তিরমানী)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের নিকট খুশী ও আনন্দের কথা পৌছে দেয় এবং তাকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করে দেবেন।" *(তিবরানী)*

১৯. উত্তম বিশ্বস্ত বন্ধু হও। বিশ্বাস করে তোমার নিকট মনের কথা বলে দিলে তার হেফাজত করবে। কখনো বন্ধুর বিশ্বাসে আঘাত দেবেনা। নিজের বক্ষকে গুপ্ত রহস্যের ভান্ডার হিসেবে তৈরী কর যেনো বন্ধু নিঃসংশয়ে তার প্রত্যেক ব্যাপারে পরামর্শ নিতে পারে আর তুমি বন্ধুকে সৎপরামর্শ দিতে পার ও সহযোগিতা করতে পারো।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাফসা (রাঃ) যখন বিধবা হলেন তখন আমি হযরত ওসমান (রাঃ) কে বললাম যে তুমি যদি ইচ্ছা করো তা হলে হাফসা (রাঃ)-এর বিয়ে তোমার সাথে দিই, ওসমান (রাঃ) জবাবে বললেন, এ ব্যাপারে আমি চিন্তা করে জানাবো। আমি কয়েক রাত পর্যন্ত তার অপেক্ষা করলাম, অতঃপর ওসমান (রাঃ) বললেন আমার বিয়ে করার খেয়াল নেই। আমি আবার আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে হাফসা (রাঃ)কে আপনার বিবাহাধীনে নিতে পারেন। তিনি চুপ রইলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। তার চুপ থাকাটা আমার নিকট অত্যন্ত ভারী মনে হলো, ওসমানের চেয়েও ভারি মনে হলো। এ ভাবে কয়েক দিন চলে গেলো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) হাফসা (রাঃ)কে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন, তখন আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হাফসা (রাঃ)-এর বিবাহ দিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর (রাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, তুমি আমার নিকট হাফসা (রাঃ)-এর কথা আলোচনা করেছিলে কিন্তু আমি চুপ ছিলাম। হতে পারে আমার এ চুপ থাকার দ্বারা তোমার মনোঃকষ্ট হয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ কষ্ট হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি জানতাম যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এরূপ চিন্তা করছেন। এটা ছিল তাঁর একটি গুপ্ত রহস্য যা আমি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। রাসূল (সাঃ) যদি হাফসা (রাঃ)-এর কথা আলোচনা না করতেন তা হলে আমি অবশ্যই তা কবুল করে নিতাম।

হযরত আনাস (রাঃ) ছেলেদের সাথে খেলা করছিলেন। এমন সময় রাসূল (সাঃ) তাশরীফ আনলেন এবং আমাদেরকে সালাম করলেন। অতঃপর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলে আমাকে পাঠালেন। আমার কাজ সেরে আসতে একটু দেরী হলো। কাজ শেষ করে আমি যখন ঘরে গেলাম তখন মা জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ কোথায় কাটালে? আমি বললাম, রাসূল (রাঃ) এক প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন কি প্রয়োজন ছিল? আমি বললাম, গোপন কথা। মা বললেন, সাবধান, রাসূল (সাঃ)-এর গোপন কথা ঘুর্ণাক্ষরেও কাউকে বলবে না।

বন্ধুত্ব মূলতঃ তখনই ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হতে পারে যখন কেউ সামাজিক চরিত্রে নমনীয়তা এবং অসাধারণ ধৈর্য ও সহশীলতা সৃষ্টি করবে আর বন্ধু সম্পর্কে উদারতা, ক্ষমা ও মার্জনা, দানশীলতা এবং একে অন্যের আবেগের প্রতি লক্ষ্য ও মনোযোগ দেবে। রাসূল (সাঃ)এর কয়েকটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, তিনি কত উন্নত প্রশস্ত অন্তর, ধৈর্য্য সহ্য ও উদারতার সাথে মানুষের স্বভাবিক প্রয়োজন ও দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

✵ রাসূল (সাঃ) বলেছেন যখন আমি নামাযের জন্য আসি তখন মন চায় যে, নামাযকে দীর্ঘ করি। যখন কোন শিশুর কান্না শোনা যায় তখন নামায সংক্ষেপ করে দিই কেননা আমার নিকট অত্যন্ত কষ্টকর যে আমি নামাযকে দীর্ঘ করে শিশুর মাকে কষ্টে নিপতিত করছি।

✵ হযরত মালেক বিন হুয়াইবিস বলেন যে, আমরা কয়েকজন সমবয়স্ক যুবক দীনী জ্ঞানার্জনের জন্য রাসূল (সাঃ) -এর মজলিসে উপস্থিত হলাম। ২০ দিন পর্যন্ত হুজুরের দরবারে ছিলাম। রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র ছিলেন। যখন ২০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ী ফিরে যেতে আগ্রহী। তখন তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের ঘরে কাকে রেখে এসেছো ? আমরা বাড়ীর অবস্থা জানালে তিনি বললেন, যাও তোমাদের স্ত্রী-বাচ্চাদের নিকট ফিরে যাও? আর তোমরা যা শিখেছ তা তাদেরকে শিখাও। তাদেরকে ভাল কাজ করার উপদেশ দাও। অমুক নামায অমুক সময় পড়, নামাযের সময় হলে তোমাদের একজনে আযান দেবে এবং তোমাদের ইলম ও চরিত্রে যে উন্নত সে নামায পড়াবে। *(বুখারী মুসলিম)*

✵ হযরত মুআবিয়া বিন সুলামী (রাঃ) নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম, এর মধ্যে এক

ব্যক্তির হাঁচি আসলে নামাযরত অবস্থায়ই আমার মুখ থেকে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বের হয়ে গেল, লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তিতে রাখুক। তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? অতঃপর আমি যখন দেখতে পেলাম যে, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূল (সাঃ) যখন নামায থেকে অবসর হলেন আমার মাতা-পিতা রাসূল (সা)-এর উপর কোরবান হোক! আমি রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাতা পূর্বেও দেখিনি এবং পরেও না। তিনি আমাকে ধমক দেননি, মারেন নি এবং ভাল-মন্দ কিছুই বলেন নি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, নামাযে কথা-বার্তা বলা ঠিক নয়। নামায হল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার, মহত্ত্ব বর্ণনা করার এবং কোরআন পাঠ করার জন্য। *(মুসলিম)*

২০. দোআর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবে। নিজে ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য দোআ করবে এবং তাদের নিকট দোআর আবেদন করবে। দোআ বন্ধুদের সামনে করবে এবং তাদের অনুপস্থিতেও। অনুপস্থিতিতে বন্ধুদের নাম নিয়েও দোআ করবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, "আমি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট ওমরা করার জন্য অনুমতি চাইলাম," তিনি অনুমতি দেয়ার সময় বললেন, " হে ওমর দোআ করার সময় আমাদের কথাও মনে রেখ।" হযরত ওমর (রাঃ) বলেন "আমার নিকট এ কথা এত আনন্দদায়ক বোধ হয়েছে যে এর পরিবর্তে আমাকে সারা দুনিয়া দিয়ে দিলেও এত খুশী হতাম না।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, কোন মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য গায়েবানা দোআ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার দোআ কবুল করে নেন আর দোআকারীর মাথার উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, সে ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের জন্য নেক দোআ করে তখন ফেরেশতা আমীন বলেন আর বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য যা চেয়েছ তোমার জন্যও ঐসব কিছু বরাদ্দ আছে। *(সহীহ মুসলিম)*

নিজের দোআসমূহে আল্লাহর নিকট অকপটে এ আবেদন করতে থাকবে যে, আয় আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে হিংসা বিদ্বেষ এবং পঙ্কিলতার ময়লা থেকে ধুয়ে দিন! আমাদের চক্ষুকে অকৃত্রিম ভালবাসা দ্বারা জুড়ে দিন! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে একতা ও বন্ধুত্বের দ্বারা সুন্দর করে দিন।

পবিত্র কোরআন বুঝে বুঝে পড়বে এবং কোরআনে বর্ণিত এ দোয়ারও গুরুত্ব প্রদান করবে।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ (الحشر-١٠)

"আয় আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের অন্তর থেকে মুমিনদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দিন। হে আমাদের প্রতিপালক আপনি নিশ্চয়ই দয়াবান ও দয়ালু। *(সূরায়ে হাশর-১০)*

আতিথেয়তার আদবসমূহ

১. মেহমান আসলে আনন্দ ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে আর অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে, সংকীর্ণমনা, অবহেলা, অন্যমনস্কতা ও বিষন্নতা প্রকাশ করবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা যেন তাদের মেহমানের আতিথেয়তা যথোপযুক্তভাবে সম্পন্ন করে। *(বুখারী ,মুসলিম)*

❋ রাসূল (সাঃ)-এর নিকট যখন কোন সম্মানিত মেহমান আসতেন তখন তিনি নিজেই তার আতিথেয়তা করতেন।

❋ রাসূল (সাঃ) যখন মেহমানকে নিজের দস্তরখানে খাবার খাওয়াতেন তখন বারবার বলতেন, "আরো খান, আরো খান"। মেহমান যখন পরিতৃপ্ত হয়ে যেতেন এবং আর খেতে অস্বীকার করতেন কেবল তখনই তিনি বিরত হতেন।

২. মেহমান আসার পর সর্বপ্রথম সালাম ও দোআ করবে এবং কুশলাদি জেনে নেবে।

পবিত্র কোরআনে আছে-

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا ط قَالَ سَلَامٌ ج

"আপনার নিকট কি ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে? তারা যখন তাঁর নিকট আসল তখন আসা মাত্রই সালাম দিল, ইবরাহীম (আঃ) সালামের উত্তর দিলেন।"

৩. অন্তর খুলে মেহমানের আতিথেয়তা করবে আর যথাসাধ্য উত্তম বস্তু পরিবেশন করবে। হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর মেহমান আসলে ইবরাহিম (আঃ) সত্ত্বর তাদের পানাহারের বন্দোবস্তে লেগে যেতেন এবং ভাল ভাল খাদ্য মেহমানদের সামনে পরিবেশন করতেন।

পবিত্র কোরআনে আছে-

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ -
(الذاريات)

তখন ঘরে গিয়ে এক মোটা তাজা গোশাবক (যবেহ্ করে ভাজি করে) তাদের সামনে পেশ করলেন। *(সূরা যারিয়াহ)*

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ -

এর অর্থ ইহাও যে, তিনি গোপনে ঘরে মেহমানদের আতিথেয়তার ব্যবস্থার জন্য চলে গেলেন, কেননা, মেহমানদের দেখিয়ে ও সংবাদ দিয়ে এদের পানাহার ও আতিথেয়তার জন্য পরিশ্রম করলে তা লজ্জা ও মেজবানের কষ্টের কারণে নিষেধ করবেন এবং পছন্দ করবেন না যে, মেজবান তাদের কারণে অসাধারণ কষ্ট করবে। অতঃপর মেজবানের জন্য ইচ্ছামত আতিথেয়তা করার সুযোগ হবেনা।

রাসূল (সাঃ) মেহমানের আতিথেয়তার ব্যাপারে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন তার চিত্র তুলে ধরে হযরত আবু শোরাহই (রাঃ) বলেছেন-

"আমার এ দুটি চোখ দেখেছে আর এ দুটি কান শুনেছে যখন রাসূল (সাঃ) এ হেদায়েত দিচ্ছিলেন "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, তাদের উচিত নিজেদের মেহমানদের আতিথেয়তা করা। মেহমানের পুরষ্কারের সুযোগ হলো প্রথম দিন ও রাত। *(বুখারী মুসলিম)*

প্রথম দিন রাতের আতিথেয়তাকে পুরস্কারের সাথে তুলনা করার অর্থ এই যে, পুরস্কার দাতা যে ভাবে বন্ধুত্বের সাথে পুরস্কার দিতে গিয়ে আত্মিক

আনন্দ অনুভব করে, ঠিক এমনি অবস্থা প্রথম রাত ও দিনে মেজবানের হওয়া উচিৎ। আর যেভাবে পুরস্কার গ্রহীতা খুশীতে আবেগ বিহবল হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করে ঠিক মেহমানকেও প্রথম দিন ও রাত তদ্রূপ অবস্থা দেখানো উচিৎ এবং নিজের অধিকার মনে করে আনন্দ ও নৈকট্যের আবেগের সাথে মেজবানের দেওয়া হাদিয়া নিঃসংকোচে গ্রহণ করা উচিৎ।

৪. মেহমান আসা মাত্রই তার প্রয়োজনীতার প্রতি লক্ষ্য করবে, পায়খানা-প্রস্রাবের জরুরত আছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। মুখ-হাত ধৌত করার ব্যবস্থা করে দেবে, প্রয়োজনে গোসলের ব্যবস্থাও করে দেবে, পানাহারের সময় না হলেও অত্যন্ত সুন্দর নিয়মে (যেভাবে মেহমান লজ্জা না পায় সেভাবে) পনাহারের কথা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। যে কামরায় মেহমানের শোয়া ও অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা মেহমানকে জানিয়ে দেবে।

৫. সব সময় মেহমানের কাছে বসে থাকবে না। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট যখন মেহমান আসতো তখন তিনি তাদের পনাহারের ব্যবস্থা করার জন্য মেহমানদের কাছ থেকে কিছুক্ষণ দূরে সরে যেতেন।

৬. মেহমানদের পানাহারে আনন্দ অনুভব করবে, মনোকষ্ট ও দুঃখ অনুভব করবে না। মেহমান দুঃখ-কষ্ট নয়, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ভাল ও প্রাচুর্যের উপকরণ। আল্লাহ যাকে মেহমান হিসেবে আপনার নিকট প্রেরণ করেন তার রিযিকও পঠিয়ে দেন। সে তোমার ভাগ্যের অংশ খায় না বরং তার ভাগ্যের অংশই সে খায়। সে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়।

৭. মেহমানের মান-সম্মাননের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। তার মান সম্মানকে নিজের মান-সম্মান মনে করবে। কেউ মেহমানের মান-সম্মান এর ব্যঘাত ঘটালে তাকে তোমার মর্যাদা ও লজ্জাবোধের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করবে।

পবিত্র কোরআনে আছে-

قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ـ

(الحجر)

"লূত (আঃ) বলেছেন, ভাইসব! এ সব লোক আমার মেহমান সুতরাং তোমরা আমাকে অপমান করোনা। আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অসম্মান করা থেকে বিরত থাক।" *(সূরায়ে আল হাজ্বার)*

৮. অন্তত তিন দিন পর্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে আতিথেয়তা করবে। তিন দিন পর্যন্ত আতিথেয়তা মেহমানের হক আর এ হক আদায়ে মুমিনের অত্যন্ত প্রশস্ত অন্তর হওয়া উচিৎ। প্রথম দিন বিশেষ আতিথেয়তার দিন। সুতরাং এদিন আতিথেয়তার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করবে। পরবর্তী দুদিন অসাধারণ ব্যবস্থা না করতে পারলেও কোন ক্ষতি নেই। রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَلَهُ صَدَقَةٌ۔

(بخارى- مسلم)

আতিথেয়তা হলো তিন দিন, তার পর যা কিছু করবে তা হবে তার জন্য সদকাহ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৯. মেহমানের খেদমতকে নিজের চারিত্রিক কর্তব্য মনে করবে এবং মেহমানকে কর্মচারী ও শিশুদের স্থলে নিজেই তার খেদমত ও আরামের ব্যবস্থা করে দেবে। রাসূল (সাঃ) মেহমানদের অতিথেয়তা নিজে নিজেই করতেন। হযরত ইমাম সাফেয়ী (রহ.) যখন হযরত ইমাম মালেক (রহ.)-এর ঘরে মেহমান হিসেবে গেলেন তখন তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে এক কামরায় শোয়ালেন। সাহরীর সময় ইমাম শাফেয়ী (রহ.) শুনতে পেলেন যে কেউ দরজা খটখটায়ে অত্যন্ত স্নেহমাখা সুরে বলছেন, "আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! নামাযের সময় হয়ে গেছে"। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাড়াতাড়ি উঠে দেখলেন যে, ইমাম মালেক (রহ.) লোটা হাতে দাঁড়িয়ে! ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কিছুটা লজ্জা পেলেন। ইমাম মালেক এটা বুঝে মহব্বতের সাথে বললেন, ভাই ! তুমি কিছু মনে করবে না। মেহমানের খেদমত করা উচিৎ।

১০. মেহমানকে বসার ব্যবস্থা করার পর পায়খানা দেখিয়ে দেবে। পানির লোটা এগিয়ে দেবে এবং কেবলার দিক দেখিয়ে দেবে। নামাযের স্থান ও মোছল্লা ইত্যাদি সরবরাহ করবে। ইমাম শাফেয়ীকে ইমাম মালেকের খাদেম এক কামরায় অবস্থান করানোর পর বিনয়ীভাবে বলল, "হযরত! কেবলা এদিকে, পানির পাত্র এখানে রাখা আছে, পায়খানা ঐদিকে।"

১১. খাওয়ার জন্য যখন হাত ধোয়াবে তখন প্রথমে নিজে হাত ধুয়ে দস্তর খানে পৌঁছবে তারপর মেহমানের হাত ধোয়াবে। ইমাম মালেক (রহ.) যখন এ কাজ করলেন তখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, খাওয়ার আগে প্রথমে মেজবানের হাত ধোয়া উচিৎ এবং দস্তরখানে এসে মেহমানকে স্বাগত জানান উচিৎ। খাবার পর মেহমানদের হাত ধোয়ান তারপর মেজবানকে হাত ধুতে হবে কারণ খাবার থেকে উঠার সময় কেউ এসে পড়তে পারে।

১২. দস্তরখানায় খাবার ও পাত্র মেহমানদের সংখ্যা থেকে কিছু বেশী রাখবে। হতে পারে যে, খাবার সময় আরো কোন ব্যক্তি এসে পড়বে, আবার তাদের জন্য ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হতে হবে। এমতাবস্থায় পাত্র ও সাজসরঞ্জাম যদি আগে থেকে প্রস্তুত থাকে তা হলে আগন্তুক ব্যক্তিও অপমানের স্থলে আনন্দ ও সম্মান অনুভব করবে।

১৩. মেহমানের জন্য প্রয়োজনবোধে নিজে কষ্ট করে তাকে আরাম দেবে। একবার রাসূল (সাঃ)এর দরবারে এক লোক এসে বলল, হুজুর ! আমি ক্ষুধায় অস্থির! তিনি তার কোন এক বিবির ঘরে বলে পাঠালেন, খাবার যা কিছু আছে পাঠিয়ে দাও! উত্তর আসল, সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, এখানে পানি ব্যতীত আর কিছু নেই। আবার অন্য এক বিবির ঘরে পাঠালেন ওখান থেকে এই জবাবই আসলো, এমনকি তিনি এক এক করে সকল বিবির ঘরে বলে পাঠালেন এবং সকল বিবির ঘর থেকেই এক জবাব আসলো। তখন তিনি নিজের সাহাবীদের দিকে মনোযোগী হলেন এবং বললেন, আজ রাতের জন্য এ মেহমানকে কে কবুল করতে পার ? এক আনসারী সাহাবী বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কবুল করতে পারি!

আনছারী মেহমানকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে বিবিকে বললেন, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক মেহমান আছে, তার আতিথেয়তা কর। বিবি বলল, "আমার নিকট শুধু শিশুদের উপযোগী সামান্য খাদ্য আছে।" সাহাবী বললেন শিশুদেরকে কোন রকম ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে চেরাগ নিভিয়ে দেবে এবং মেহমানদের সাথে খেতে বসে যাবে সে যেন বুঝতে পারে যে, আমরাও তার সাথে খাবারে শরীক আছি।

এভাবে মেহমান পেট ভরে খেয়ে নিলেন আর পরিবারের লোকেরা সারা রাত উপবাসে কাটালেন। ভোরে এ সাহাবী যখন রাসূল-এর দরবারে হাযির হলেন এবং তিনি দেখেই বললেন, তোমরা উভয়েই রাতের বেলায় তোমাদের মেহমানের সাথে যে সৎ ব্যবহার করছো তা আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। *(বুখারী, মুসলিম)*

১৪. তোমার মেহমান যদি কখনো তোমার সাথে অমানবিক ও রুক্ষতা সুলভ ব্যবহার করে তবুও তুমি তার সাথে অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়, বুদ্ধিমত্তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

হযরত আবুল আহওয়াস জাশমী (রাঃ)-তার পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, কারো নিকট যদি আমি অতিথি হই আর সে যদি আতিথেয়তার হক আদায় না করে এবং আবার কিছুদিন পর আমার কাছে আসে তা হলে আমি কি তার আতিথেয়তার হক আদায় করব? নাকি তার অমানবিকতা ও অমনযোগিতার প্রতিশোধ নেবো? রাসূল (সাঃ) বললেন, না বরং যে ভাবেই হোক তার আতিথেয়তার হক আদায় করবে। *(মেশকাত)*

১৫. মেহমানের খায়ের ও বরকতের জন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন বসর (রাঃ) বলেছেন যে, একদা রাসূল (সাঃ) আমার পিতার নিকট মেহমান হলেন, এবং আমরা তার সামনে খাদ্য হিসেবে হারিসা পরিবেশন করলাম, তিনি সামান্য কিছু গ্রহণ করলেন, তারপর আমরা খেজুর পরিবেশন করলাম। তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন তারপর কিছু পানীয় পেশ করা হলো, তিনি পান করলেন এবং তার ডানে বসা ব্যক্তির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি যখন চলে যেতে উদ্যত হলেন তখন সম্মানিত পিতা তার সওয়ারীর লাগাম ধরে আবেদন করলেন যে, হুযুর! আমাদের জন্য দোয়া করুন! রাসূল (সাঃ) দোআ করলেন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ـ (ترمذى)

"আয় আল্লাহ ! আপনি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তাতে প্রাচুর্য ও বরকত দান করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহমত করুন!

মেহমানের আদবসমূহ

১. কারো বাড়ীতে মেহমান হিসেবে যেতে হলে মেজবানের মর্যাদানুযায়ী মেজবানের শিশুদের জন্য কিছু হাদিয়া তোহ্ফা নিয়ে যাবে। তোহফায় মেজবানের রুচি ও পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। হাদিয়া তোহফার লেনদেনে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের অনুভূতি বৃদ্ধি পায়।

২. যার বাড়ীতেই মেহমান হিসেবে যাওয়া হোক না কেন তিন দিনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান না করার চেষ্টা করবে কিন্তু অবস্থা বিশেষে মেজবানের কঠোর একাগ্রতায় ভিন্ন কথা।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

মেহমানের জন্য মেজবান পেরেশানিতে পড়ে এমন সময় পর্যন্ত মেজবানের বাড়ীতে অবস্থান করা ঠিক নয়। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে যে, মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের বাড়ীতে তাকে গুনাহ্গার করে দেয়া পর্যন্ত অবস্থান করা ঠিক নয়। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিভাবে গুনাহ্গার করবে? তিনি বললেন, " সেভাবে যে, সে তার নিকট অবস্থান করবে অথচ, মেজবানের নিকট আতিথ্যের কিছু থাকবে না।"

৪. শুধু অপরের মেহমানই হবে না, অন্যদেরকেও নিজের ঘরে আসার দাওয়াত দেবে এবং প্রাণ খুলে আতিথেয়তা করবে।

৫. কোথাও মেহমান হিসাবে যেতে চাইলেও মওসুম বা ঋতুর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও বিছানাপত্র ইত্যাদি সাথে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে শীতকালে বিছানা-পত্র ছাড়া যাবে না নতুবা মেজবানের কষ্ট হবে এবং এটাও ঠিক নয় যে, মেহমান মেজবানের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৬. মেজবানের কর্মব্যস্ততা ও দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বিশেষকরে লক্ষ্য রাখবে যে, তোমার কারণে মেজবানের কর্ম ব্যস্ততায় যেন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে এবং দায়িত্বে ব্যাঘাত না ঘটে।

৭. মেজবানের নিকট কিছু দাবী করবে না। সে মেহমানের সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় যে ব্যবস্থা করে তার উপরই মেজবানের শুকরিয়া আদায় করবে আর তাকে অনর্থক কষ্টে ফেলবে না।

৮. যদি মেজবানের মহিলাদের শরয়ী গায়র মুহরিম হোন তা হলে বিনা করণে মেজবানের অনুপস্থিতিতে কথা-বার্তা বলবে না বা কারো কথাবার্তাও কান লাগিয়ে শুনবে না। এ নিয়মে থাকবে যে তোমার কথা বার্তা ও চালচলনে যেন তাদের কোন পেরেশানি না হয় এবং কোন ব্যাঘাতও না ঘটে।

৯. তুমি যদি কোন কারণে মেজবানের সাথে খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর অথবা রোযাদার হও তাহলে অত্যন্ত নম্রভাবে ওযর পেশ করবে। আর মেজবানের সম্পদ বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য দোআ করবে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্মানিত মেহমানদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করলেন আর তারা হাত গুটাতেই রইলেন তখন হযরত আবেদন করলেন ঃ

"আপনারা খাচ্ছেন না কেন"? উত্তরে ফিরিশতাগণ হযরতকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আপনি মনোকষ্ট নেবেন না। মূলতঃ আমরা খেতে পারিনা, আমরা তো আপনাকে শুধুমাত্র একজন যোগ্য ছেলের জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ দান করতে এসেছি।"

১০. কারো বাড়ীতে যখন দাওয়াতে যাবে পানাহারের পর মেজবানের সম্পদ বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির মাগফিরাত ও রহমতের জন্য দোআ করবে। হযরত আবুল হাইসুম বিন তাইহান (রাঃ) রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণকে দাওয়াত দিলেন। তারা যখন খাবার শেষ করলো তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমাদের ভাইকে প্রতিদান দাও। সাহাবাগণ আরজ করলেন কি প্রতিদান দেবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ? মানুষ যখন তার ভাইয়ের বাড়ী যায় এবং খাওয়া দাওয়া করে তখন তার জন্য ধন-সম্পদে প্রাচুর্যের দোআ করবে। এটাই হলো তার প্রতিদান।" *(আবু দাউদ)*

রাসূল (সাঃ) একবার সায়াদ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-এর বাড়ী গেলেন, হযরত সায়াদ (রাঃ) রুটি ও জলপাই পেশ করলেন, তিনি তা খেয়ে এ দোয়া করলেনঃ

اَفْطَرَعِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. (ابوداؤد)

"তোমাদের নিকট রোযাদারগণ ইফতার করুক! সৎলোকেরা তোমাদের খাদ্য খাক! আর ফিরিশতাগণ তোমাদের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোআ করুক!

মজলিসের আদবসমূহ

১. মজলিসের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে।

২. মজলিসে আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করা এবং মাথা নিচু করে বসে থাকা, অহংকারের চিহ্ন। মজলিসে সাহাবায়ে কেরাম যে আলোচনা করতেন রাসূল (সাঃ)ও সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। মজলিসে চিন্তান্বিত ও মনমরা হয়ে বসে থাকবে না। অত্যন্ত আনন্দ ফূর্তির সাথে বসবে।

৩. তোমার কোন মজলিস যেন আল্লাহ ও পরকালের আলোচনা থেকে দূরে না থাকে সে চেষ্টা করবে। তুমি যখন অনুভব করবে যে, উপস্থিত ব্যক্তিগণ দীনি আলোচনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করছে না তখন আলোচনার ধারা কোন পার্থিব বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেবে অতঃপর যখন উপযুক্ত সুযোগ পাবে তখন অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে আলোচনার ধারা দীনি বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

৪. মজলিসে যেখানে স্থান পাওয়া যায় সেখানেই বসে পড়বে। সমবেত জনতাকে ছিন্ন করে লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে আগে যাবার চেষ্টা করবে না। এরূপ করলে আগে আসা এবং বসা লোকদেরও কষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তিদের অন্তরেও নিজের অহংকার ও গৌরব সৃষ্টি হয়।

৫. মজলিসে বসা ব্যক্তিদের কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে নিজে বসার চেষ্টা করবে না, ইহা একটি বদঅভ্যাস। এর দ্বারা অন্যদের মনে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয় আর নিজেকে বড় মনে করা এবং গুরুত্ব দেয়া বুঝায়।

৬. মজলিসে যদি লোকেরা গোল হয়ে বসে তা হলে তাদের মধ্যখানে বসবে না। এটাও একটা বেয়াদবী। রাসূল (সাঃ) এমন ব্যক্তির উপর অভিশম্পাত করেছেন।

৭. মজলিসে বসা ব্যক্তিদের কেউ যদি কোন প্রয়োজনে উঠে চলে যায় তা হলে তার স্থান দখল করে নেবে না। বরং তার স্থান সংরক্ষিত রাখবে। হ্যাঁ, একথা যদি জানা যায় যে, ঐ ব্যক্তি এখন আর ফিরে আসবে না তা হলে বসা যায়।

৮. মজলিসে যদি দু'ব্যক্তি একত্রে বসে থাকে। তাহলে তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদেরকে পৃথক করবে না, পরস্পরের বন্ধুত্ব অথবা অন্য

কোন যুক্তিযুক্ত কারণে হয়তো তারা একত্রে বসেছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে পৃথক পৃথক করে দিলে তাদের মনে দুঃখ হবে।

৯. মজলিসে কোন স্বতন্ত্র সম্মানিত স্থানে বসা থেকে বিরত থাকবে। কারো কাছে গেলে তার সম্মানিত স্থানে বসার চেষ্টা করবে না! তবে সে যদি বার বার অনুরোধ করে তা হলে বসতে কোন দোষ নেই। মজলিসে সর্বদা আদবের সাথে বসবে এবং পা লম্বা করে অথবা পায়ের গোছা খুলে বসবে না।

১০. সর্ববাস্থায় সভাপতির নিকটে বসার চেষ্টা করবে না বরং যেখানে স্থান পাওয়া যায় সেখানেই বসে পড়বে আর এমনভাবে বসবে যে, পরে আসা ব্যক্তিদের স্থান পেতে এবং বসতে যেন কোন কষ্ট না হয়। মানুষ যখন বেশী এসে যায় তখন সংকুচিত হয়ে বসবে এবং আগন্তুকদেরকে খুশী মনে স্থান দিয়ে দিবে।

১১. মজলিশে সম্মান প্রদর্শনের এ নিয়ম ইসলামী মেজাজ বিরোধী কারো সামনে অথবা আশে-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ নয়।

১২. মজলিসে দু'ব্যক্তি পরস্পর চুপে চুপে কথা বলবে না। এ দ্বারা অন্যেরা মনে করতে পারে যে, তারা আমাদেরকে তাদের গোপন কথা শোনার উপযুক্ত মনে করে নি। আর এ কুধারণাও হয় যে, সম্ভবতঃ আমাদের সম্পর্কেই কোন কথা বলছে।

১৩. মজলিসে কোন কথা বলতে হলে মজলিসের সভাপতির অনুমতি নিতে হবে, আর আলোচনা অথবা সওয়াল জবাবে এমন ভাব দেখাবে না যে, আপনাকেই মজলিসের সভাপতি মনে হয়।

১৪. এক সময় এক ব্যক্তিরই কথা বলা উচিৎ আর প্রত্যেক ব্যক্তির কথা মনোযোগের সাথে শোনা উচিত। নিজের কথা বলার জন্যে এরূপ অস্থির হওয়া উচিৎ নয় যে সব কথা এক সময়েই বলা আরম্ভ করবে এবং মজলিসে হৈ চৈ আরম্ভ করবে।

১৫. মজলিসের গোপনীয় কথা সকল স্থানে বলা উচিৎ নয়। মজলিসের গোপন কথাসমূহের হেফাজত করা উচিত।

১৬. মজলিসে যে বিষয় আলোচনা চলছে, সে বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অন্য বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করবে না, এবং অন্যের কথার মাঝখানে নিজের কথা আরম্ভ করবে না। কখনো যদি এমন

কোন প্রয়োজন এসে পড়ে যে, এখনই বলা জরুরী তা হলে কথা বলা ব্যক্তির থেকে অনুমতি নিয়ে নেবে। মজলিসের সভাপতিকে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে হলে সকল লোকের দিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখা উচিৎ। ডানে বামে প্রত্যেক দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলা উচিৎ এবং সকলকে স্বাধীন ভাবে মনোভাব প্রকাশের সুযোগ দেয়া উচিৎ।

১৭. মজলিস মুলতবী হওয়ার পূর্বে এ দোআ পাঠ করবে ।

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ـ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ـ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْ عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ـ (ترمذى)

"আয় আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার এমন ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক নসীব কর যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে বিরাট বাধা হয়ে যায়, আর এমন আনুগত্য দান কর যা আমাদেরকে তোমার বেহেশতে পৌছিয়ে দেয়, আর আমাদেরকে এমন মজবুত বিশ্বাস দান কর যার ফলে পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি মূল্যহীন মনে হয়। আয় আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যতদিন জীবিত রাখো, আমাদের এবং শারীরিক শক্তি ও সামর্থ দ্বারা উপকার গ্রহণের সুযোগ দাও আর ইহাকে আমাদের পরেও স্থায়ী রাখো, আর যে ব্যক্তি আমাদের উপর অত্যাচার করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর, আর যে আমাদের সাথে শত্রুতা করে তার উপর আমাদেরকে বিজয়ী করে দাও। আমাদেরকে দীনের পরীক্ষায় জড়িত করো না! দুনিয়াকে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য করো না! আর আমাদের উপর এমন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিও না যে আমাদের প্রতি রহম প্রদর্শন করবে না।

সালামের নিয়ম-কানুন

১. কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে যখন সাক্ষাৎ হবে তখন নিজের সম্পর্ক ও সৌহার্দ প্রকাশের জন্য "আসসালামু আলাইকুম" বলবে।

পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ -
(الانعام ٥٤)

"হে নবী, আমাদের আয়াতের উপর ঈমান রাখে এমন লোকেরা যখন আসে তখন আপনি তাদেরকে "সালামুন আলাইকুম" বলুন।"

(সূরায়ে আন-আনআম)

এ আয়াতে রাসূল (সাঃ)সম্বোধন করে উম্মতকে এ মৌলিক শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করবে তখন উভয়েই বন্ধুত্ব ও আনন্দ আবেগ প্রকাশ করবে এবং পরস্পর একে অন্যের জন্য শান্তি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য দোআ করবে। একজন "আসসালামু আলাইকুম" বলবে তখন অপর ব্যক্তি তার উত্তরে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বলবে। সালাম পরস্পরিক স্নেহ-মমতা বন্ধুত্ব বৃদ্ধি ও (দৃঢ়) মজবুত করার উপকরণ।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

তোমরা বেহেশতে যেতে পারবেনা যে পর্যন্ত তোমরা মুসলমান না হও। আর তোমরা মুসলমান হতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত তোমরা অন্য মুসলমানকে ভাল না বাস। আমি তোমাদেরকে সে পদ্ধতি কেন শিক্ষা দেব না, যা অবলম্বন করে তোমরা একে অন্যকে ভালবাস, তাহলো পরস্পর সালাম পৌছে দেবে। *(মেশকাত)*

২. সর্বদা ইসলামী নিয়মে সালাম করবে। পরস্পর কথোপকথনের কারণে বা চিঠিপত্র লিখনে সর্বদা কুরআন ও হাদীসের শব্দগুলোই ব্যবহার করবে। ইসলামী পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে সমাজের প্রবর্তিত শব্দ ও পদ্ধতি গ্রহণ করবে না। ইসলামের শিক্ষা দেওয়া এই সম্বোধন পদ্ধতি অত্যন্ত সরল, অর্থবোধক ও পূর্ণ ক্রিয়াশীল ও শান্তি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিপূর্ণ।

তুমি যখন নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় "আসসালামু আলাইকুম" বল, তখন তার অর্থ হলো আল্লাহ আপনার প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ করুন! ঘর সংসার নিরাপদ রাখুন! পরিবার-পরিজনকে শান্তি দান করুন! দীন ও ঈমান এবং পরকালকেও নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ আপনাকে সেই সকল শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন যা আমার জানা নেই। আপনি আমার পক্ষ থেকে কোন ভয়-ভীতির আশঙ্কা করবেন না। আমার কার্যক্রম দ্বারা অবশ্যই আপনার কোন দুঃখ হবে না। 'সালাম' শব্দের আগে 'আলিফ ও লাম' এনে আসসালামু আলাইকুম" বলে আপনি সম্বোধিত ব্যক্তির শান্তি ও সুস্বাস্থ্যের জন্যে দোআ করে নিন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

"আস সালাম" আল্লাহ তাআলার নামসমূহের মধ্য থেকে একটি নাম যাকে আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের জন্য রেখে দিয়েছেন। সুতরাং 'আসসালাম' কে জড়িয়ে দাও। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে ফিরিশতাদের একটি দলের নিকট প্রেরণ করার সময় নির্দেশ দিলেন যে, যাও, ফিরিশতাদেরকে সালাম করো। আর সালামের জবাবে তারা যে দোআ করবে তা শুনবে আর তা মুখস্তও করবে, কেননা ইহাই তোমার ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির দোআ হবে। সুতরাং হযরত আদম (আঃ) ফিরিশতাদের নিকট পৌছে "আসসালামু আলাইকুম" বললেন এবং ফিরিশতাগণ তার উত্তরে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" অর্থাৎ ওয়া রাহমাতুল্লাহ বেশী বলে উত্তর দিলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

পবিত্র কুরআনে আছে যে, ফিরিশতাগণ যখন মুমিনের রূহ কবয করতে আসে তখন " সালামুন আলাইকা" বলেন।

كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

(النحل ٣١-٣٢)

"আল্লাহ তাআলা পুণ্যবানদেরকে (মুত্তাকীগণকে) এরূপ পুরস্কার দেন যাদের রূহ পবিত্রাবস্থায় ফিরিশতাগণ কবজ করেন, তারা বলবে, "সালামুন আলাইকুম" (তোমাদের উপর শান্তি) তোমরা যে নেক আমল করতে তার বিনিময়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। *(আননাহল ৩১-৩২)*

এ মুত্তাকী লোকেরা বেহেশতের দরজায় যখন পৌঁছবে তখন জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ তাদেরকে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ـ (الزمر ٣٧)

"আর যারা পবিত্রতা ও আল্লাহ ভীতির উপর জীবন যাপন করে তাদের দলকে অবশ্যই বেহেশতের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেয়া হবে। তারা জান্নাতের নিকটবর্তী হলে বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং বেহেশতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ বলবেন, "সালামুন আলাইকুম" (তোমাদের উপর শান্তি) সুতরাং তোমরা অনন্ত কালের জন্য এখানে প্রবেশ কর"। *(সূরায়ে যুমার ৭৩)*

এ সকল লোক যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন ফিরিশতাগণ বেহেশতের প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে বলবে, "আসসালামু আলাইকুম"।

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ *

আর ফিরিশতাগণ তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রত্যেক দরজা দিয়ে আসবেন আর তাদেরকে বলবেন, "সালামুন আলাইকুম"। আপনারা যে ধৈর্য্যধারণ করেছেন তার বিনিময়ে পুরস্কার পরকালের ঘর কতই না সুন্দর।

বেহেশতবাসীগণ নিজেরাও একে অন্যকে এ শব্দগুলো দ্বারা অভিবাদন জানাবেন-

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ *

তাদের মুখে এ দোআও হবে, "আয় আল্লাহ! আপনি মহা পবিত্র আর সেখানে অভিবাদন হবে সালাম।"

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেও বেহেশতবাসীদেরকে সালাম জানানো হবে।

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ـ (يس ٥٥-٥٨)

"জান্নাতবাসীগণ সেদিন আরাম ও আয়েশে মত্ত থাকবে। তারা ও তাদের বিবিগণ ছায়া ঘন সুসজ্জিত খাটে হেলান দিয়ে থাকবে। তাদের জন্য বেহেশতে সর্বপ্রকার ফল মূল এবং তারা যা চাইবে তাই পাবে। মহান দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে "সালাম' বলা হবে"।

(সূরায়ে ইয়াসীন-৫৫-৫৮)

মোটকথা এই যে, জান্নাতে মু'মিনদের জন্য চতুর্দিক থেকে শুধু সালামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا * (الواقعة ٢٥-٢٦)

"তারা সেখানে অনর্থক বাজে কথা ও গুনাহের কথা শুনবেনা। চতুর্দ্দিক থেকে শুধু 'সালাম' হবে।" *(ওয়াকেআহ ঃ ২৫-২৬)*

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এ সকল উজ্জ্বল হেদায়েত ও সাক্ষ্য থাকার পরও মুমিনের পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি ছেড়ে বন্ধুত্ব ও আনন্দ প্রকাশের জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয নয়।

৩. প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করবে তার সাথে পূর্ব থেকে পরিচয় ও সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক। সম্পর্ক ও পরিচিতির জন্য এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে সে আপনার মুসলমান ভাই আর মুসলমানের জন্য মুসলমানের অন্তরে বন্ধুত্ব একাগ্রতা এবং বিশ্বস্ততার আবেগ থাকাই উচিৎ।

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের মধ্যে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, "গরীবদেরকে আহার করানো, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করা, তার সাথে জানা শোনা থাকুক বা না থাকুক"।

(বুখারী, মুসলিম)

৪. আপনি যখন আপনার ঘরে প্রবেশ করবেন তখন পরিবারস্থ লোকদেরকে সালাম করবেন।

পবিত্র কোরআনে আছে—

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ـ (النور ٦١)

তোমরা যখন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের পরিবারস্থগণকে সালাম প্রদান করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া সালাম উত্তম অভিবাদন বরকতময় ও পবিত্র।"

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "রাসূল (সাঃ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি যখন তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখন প্রথমে ঘরের লোকদের সালাম করবে। কেননা ইহা তোমার ও তোমাদের পরিবারস্থ লোকদের জন্য শুভ ফল ও প্রাচুর্যের উপায়।" *(তিরমিযী)*

অনুরূপ তুমি অন্যের ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে সালাম করবে, সালাম করা ব্যতীত ঘরের ভেতর যাবে না।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ (النور ٢٧)

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে তাদের অধিবাসীদের অনুমতি ছাড়া এবং সালাম করা ব্যতীত প্রবেশ করবে না।

(সূরা আন নূর ঃ ২৭)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরিশতাগণ যখন সম্মানিত মেহমান হিসেবে আসলেন তখন তাঁরা এসে সালাম করলেন আর ইব্রাহীম (আঃ) সালামের জবাবে তাদেরকে সালাম করলেন।

৫. ছোট শিশুদেরকেও সালাম করবে। শিশুদেরকে সালাম শিক্ষা দেয়ার উত্তম তরীকাও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত। হযরত আনাস (রাঃ) শিশুদের নিকট দিয়ে যাবার সময় সালাম করলেন এবং বললেন, রাসূল (সাঃ) এরূপই করতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) চিঠিতেও শিশুদেরকে সালাম দিতেন। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

৬. মহিলারা পুরুষদেরকে সালাম করতে পারে, আর পুরুষ ও মহিলাদেরকেও সালাম করতে পারে। হযরত আসমা আনসারীয়া (রাঃ) বলেছেন যে, আমি আমার সাথীদের সাথে বসা ছিলাম, রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এমতাবস্থায় তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হলাম, তিনি ঐ সময় গোসল করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, উম্মেহানী! তিনি বললেন, শুভাগমন!

৭. বেশী বেশী সালাম করার অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং সালাম করার ব্যাপারে কখনো কৃপণতা করবে না। পরস্পর বেশী বেশী সালাম করবে । কেননা সালাম করার দ্বারা বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

আমি তোমাদেরকে এমন এক পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছি যা অবলম্বন করলে তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা মজবুত হবে, পরস্পর একে অন্যকে সালাম কর। *(মুসলিম)*

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন যে, সালামকে খুব বিস্তৃত কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তিতে রাখবেন"।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণ অনেক বেশী সালাম করতেন। অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁদের কোন সাথী যদি গাছের আড়াল হয়ে যেতেন অতঃপর আবার সামনে আসলে তাঁকে সালাম করতেন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে সে যেন তাকে অবশ্যই সালাম করে। আর যদি গাছ অথবা দেয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়ে যায় অতঃপর আবার তার সামনে আসে তাহলে তাকে আবার সালাম করতেন। (রিয়াদুস সালেহীন)

হযরত তোফাইল (রাঃ) বলেছেন যে, আমি অধিকাংশ সময় হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হতাম এবং তার সাথে বাজারে যেতাম। অতঃপর আমরা উভয়ে যখন বাজারে যেতাম তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) যার নিকট দিয়েই যেতেন তাকেই সালাম করতেন, চাই সে কোন ভাঙ্গা চুড়া কম দামী জিনিস বিক্রেতা হোক বা বড় দোকানদার হোক, সে গরীব ব্যক্তি হউক বা নিঃস্ব কাঙ্গাল ব্যক্তি হোক। আসল কথা যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন তিনি তাকে অবশ্যই সালাম করতেন।

একদিন আমি তাঁর খেদমতে হাযির হলে তিনি আমাকে বললেন, চল বাজারে যাই। আমি বললাম হযরত আপনি বাজারে গিয়ে কি করবেন? আপনি না কোন সদায় ক্রয় করার জন্য দাঁড়ান, না কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, না দাম-দস্তুর করেন, না বাজারের কোন সমাবেশে বসেন, আসুন এখানে বসে কিছু কথা-বার্তা বলি। হযরত বললেন, হে পেটুক! আমি তো শুধু সালাম করার উদ্দেশ্যেই বাজারে যাই, যার সাথেই আমাদের সাক্ষাৎ হবে তাকেই সালাম করব। *(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)*

৮. সালাম মুসলমান ভাইয়ের অধিকার মনে করবে আর সে অধিকার আদায় করা অন্তরের প্রশস্ততার প্রমাণ দেবে। সালাম দেয়ায় কখনো কৃপণতা করবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, মুসলমানের উপর এই অধিকার আছে যে, সে যখনই মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখনই তাকে সালাম করবে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে সব চাইতে বড় কৃপণ হলো সে, যে সালাম করতে কার্পণ্য করে। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

৯. সর্বদা আগে সালাম করবে, সালামে অগ্রগামী হবে। আল্লাহ না করুন! কারো সাথে কোন সময় যদি মনের অমিল হয়ে যায় এজন্য সালাম করা ও আপোষ মীমাংসায় অগ্রগামী হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

"সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী যে আগে সালাম করে।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে উভয়ের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন একজন একদিকে যাবে আর অন্যজন আরেক দিকে, এদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম যে সালাম করায় অগ্রগামী হয়। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) সালাম করার এত গুরুত্ব প্রদান করতেন যে, কোন ব্যক্তিই তাকে আগে সালাম দিতে পারতো না।

১০. মুখে "আসসালামু আলাইকুম" বলে আর একটু উচ্চস্বরে সালাম করবে যেন যাকে সালাম করছ সে শুনতে পায়। অবশ্য কোথায়ও যদি মুখে "আসসালামু আলাইকুম" বলার সাথে সাথে হাত অথবা মাথায় ইশারা করার প্রয়োজন হয় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তুমি যাকে সালাম করছ সে তোমার দূরে অবস্থিত, ধারণা করছ যে, তোমার আওয়ায সে পর্যন্ত পৌছবে না অথবা কোন বধির যে তোমার আওয়ায শুনতে অক্ষম এমতাবস্থায় ইশারা করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেন যে, কাউকে যখন সালাম কর তখন তোমরা সালাম তাকে শোনাও। সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় দোআ। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেছেন যে, একদিন রাসূল (সাঃ) মসজিদে নববীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেখানে কিছু মহিলা বসা ছিল তিনি তাদেরকে হাতের ইশারায় সালাম করলেন।' *(তিরমিযি)*

১১. কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে কারো বৈঠকে অথবা বসার স্থানে পৌছলে অথবা কোন সমাবেশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অথবা কোন মজলিসে পৌছলে পৌছার সময়ও সালাম করবে এবং সেখান থেকে যখন ফিরে আসবে তখনও সালাম করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

"তোমরা যখন কোন মজলিসে পৌছ তখন সালাম কর আর যখন সেখান থেকে বিদায় নেবে তখনও সালাম করবে।

আর স্মরণ রেখো যে, প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম থেকে বেশী সওয়াবের অধিকারী । (যাবার সময় সালামের বেশী গুরুত্ব দেবে আর বিদায় হবার সময় সালাম করবে না এবং বিদায় বেলার সালামের কোন গুরুত্বই দেবে না।) *(তিরমিযি)*

১২. মজলিসে গেলে পূর্ণ মজলিসকে সালাম করবে বিশেষভাবে কারো নাম নিয়ে সালাম করবে না। একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মসজিদে ছিলেন, এক ভিক্ষুক এসে তার নাম ধরে সালাম করলো। তিনি বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, "রাসূল (সাঃ) প্রচারের হক আদায় করে দিয়েছেন" অতঃপর তিনি ঘরে চলে গেলেন। লোকেরা তার একথা বলার উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য অপেক্ষায় বসে রইল। তিনি যখন আসলেন তখন হযরত তারেক (রাঃ) জিজ্ঞেসা করলেন, জনাব আমরা আপনার কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি তখন তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে লোকেরা মজলিসে লোকদেরকে বিশেষভাবে সালাম করা আরম্ভ করবে।" *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

১৩. কোন সম্মানিত অথবা প্রিয় বন্ধুকে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা সালাম করার সুযোগ হলে অথবা কারো চিঠিতে সালাম লিখার সুবিধা হলে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে এবং সালাম পাঠাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ আয়েশা, জিবরীল (আঃ) তোমাকে সালাম করেছেন, আমি বললাম, "ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহ মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু"। *(বুখারী, মুসলিম)*

১৪. তুমি যদি এমন কোন স্থানে গিয়ে পৌছো যেখানে কিছু লোক ঘুমিয়ে আছে তা হলে এমন আওয়াযে সালাম করবে যে, লোকেরা শুনবে এবং নিদ্রিত লোকদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। হযরত মেদাদা (রাঃ) বলেন, যে, আমরা রাসূল (সাঃ) এর জন্য কিছু দুধ রেখে দিতাম তিনি যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আসতেন তখন তিনি এমনভাবে সালাম করতেন যে, নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেন না জাগে এবং জাগ্রত ব্যক্তিরা যেন শুনে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) আসলেন এবং পূর্বের নিয়মানুযায়ী সালাম করলেন। *(মুসলিম)*

১৫. সালামের জবাব অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ও হাসিমুখে দেবে, কেননা এটা মুসলমান ভাইয়ের অধিকার, এ অধিকার আদায় করায় কখনো কার্পণ্য দেখাবে না ।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে-

* সালামের জবাব দেয়া
* অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া
* কফিনের সাথে যাওয়া
* দাওয়াত কবুল করা এবং
* হাঁচির জবাব দেওয়া।

রাসূল (সাঃ) রাস্তায় বসতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের তো রাস্তায় বসা ছাড়া উপায় নেই ! তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমাদের বসা যদি খুব জরুরী হয় তাহলে বসো, তবে রাস্তার হক অবশ্যই আদায় করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ), রাস্তার আবার হক কি ? তিনি বললেন, দৃষ্টি নিচে রাখা, কাউকে দুঃখ না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজ শিক্ষা দেয়া আর খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। *(মুত্তাফিকুন আলাইহে)*

১৬. সালামের জবাবে "ওয়াআলাইকুমুস সালাম"কেই যথেষ্ট মনে করবে না বরং "ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" এ শব্দগুলোও বৃদ্ধি করবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে -

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ـ

"আর যখন তোমাদের কেউ শুভেচ্ছা জানায় তখন তোমরা তার থেকে উত্তম শুভেচ্ছা জানাবে অথবা তারই পুনরাবৃত্তি করবে।"

অর্থাৎ সালামের জবাবে কার্পণ্য করো না। সালামের শব্দে কিছু বৃদ্ধি করে তার থেকে উত্তম দোআ করো অথবা ঐ শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করো।

হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) তাশরীফ রাখলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে "আসসালামু আলাইকুম বলল, তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন দশ নেকী

পেলো। আবার এক ব্যক্তি এসে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলল, তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, বিশ নেকী পেলো। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ত্রিশ নেকী পেলো। *(তিরমিযি)*

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ একবার আমি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পেছনে সোয়ারীর উপর বসা ছিলাম। আমরা যাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আবু বকর (রাঃ) তাদেরকে বলেন, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" তখন লোকেরা জবাব দিল ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু? এরপর আবু বকর (রাঃ) বললেন, আজ তো লোকেরা ফজীলতে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেল। (আল আদাবুল মুফরাদ)

১৭. কারো সাথে যখন সাক্ষাত হবে তখন আগে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলবে, হঠাৎ আলোচনা আরম্ভ করবে না যে আলোচনাই করতে হয়, সালামের পর করবে।

১৮. যে অবস্থায় সালাম দেয়া নিষেধ।

(ক) যখন লোকেরা কোরআন ও হাদীস পড়তে- পড়াতে অথবা শুনতে ব্যস্ত থাকে।

(খ) যখন কেউ আযান অথবা তাকবীর বলতে থাকে।

(গ) যখন কোন মজলিসে কোন দীনি বিষয়ের ওপর আলোচনা চলতে থাকে অথবা কেউ কাউকে কোন দীনি আহকাম বুঝাতে থাকে।

(ঘ) যখন শিক্ষক পড়াতে ব্যস্ত থাকেন।

(ঙ) যখন কেউ পায়খানা-প্রস্রাবরত থাকে।

যে অবস্থায় সালাম দেয়া যাবে না।

(চ) যখন কোন ব্যক্তি পাপাচার এবং শরীয়ত বিরোধী খেল তামাসা ও আনন্দ- ফূর্তিতে লিপ্ত থেকে দীনের অবজ্ঞা করতে থাকে।

(ছ) যখন কেউ গাল-মন্দ, অনর্থক ঠকবাজি, সত্য-মিথ্যা খারাপ কথা ও অশ্লীল ঠাট্টা-কৌতুক করে দীনের বদনাম করতে থাকে।

(জ) যখন কেউ দীন ও শরীয়ত বিরোধী চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রচার করতে থাকে এবং লোকদেরকে দ্বীন থেকে বিদ্রোহী এবং বেদআত ও বেদীন অবলম্বন করার জন্য উত্তেজিত করতে থাকে।

(ঝ) যখন কেউ দীনি আকীদা বিশ্বাস এবং নিদর্শনের সম্মান না করে, শরীয়াতের মূলনীতি ও বিধি-বিধানের বিদ্রূপ করে এবং নিজের অভ্যন্তরীণ ভ্রষ্টতা ও দ্বিমুখী নীতির প্রমাণ দিতে থাকে।

১৯. ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে সালাম করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে না। পবিত্র কুরআন সাক্ষী, ইহুদীগণ নিজেদেরকে বেদীন, সত্যের শত্রুতা, অত্যাচার, মিথ্যাবাদিতা ও ধোকাবাজি এবং প্রবৃত্তির দুশ্চরিত্রে নিকৃষ্টতম জাতি। তাদেরকে অসংখ্য পুরস্কার বর্ষণ করেছেন কিন্তু তারা সর্বদা অকৃতজ্ঞতা, কুকর্মের প্রমাণ দিয়েছে। এরা সেই জাতি যারা আল্লাহর প্রেরিত সম্মানিত নবীগণকেও হত্যা করেছে। এ কারণে মুমিনদেরকে ঐ আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত যার মধ্যে ইহুদীদের সম্মান ও মর্যাদার সম্ভাবনা আছে। বরং তাদের সাথে এরূপ আচরণ করা উচিৎ যাতে তারা বার বার এ কথা অনুভব করতে পারে যে, সত্যের নিকৃষ্টতম বিরোধিতার প্রতিফল সর্বদা হীনতাই হয়ে থাকে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে আগে সালাম দেবে না, বরং রাস্তায় যখন তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয় তখন তাদেরকে রাস্তার এক পাশে সংকুচিত হয়ে যেতে বাধ্য কর। (আল আদাবুল মুফরাদ)

অর্থাৎ এরূপ গাম্ভীর্য ও জাঁকজমকের সাথে চল যে, তারা নিজেরা রাস্তায় একদিকে সংকুচিত হয়ে তোমাদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়।

২০. তবে কোন মজলিসে যখন মুসলমান ও মুশরিক উভয় একত্রিত হয় তখন সেখানে সালাম করবে, রাসূল (সাঃ) একবার এরূপ মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার মধ্যে মুসলমান ও মুশরিক উপস্থিত ছিল তখন তিনি তাদেরকে সালাম করেছেন।

২১. কোন অমুসলিমকে যদি সালাম করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তখন "আসসালামু আলাইকুম" না বলে বরং আদাব আরয, তাসলীমাত ইত্যাদি প্রকারের শব্দ ব্যবহার করবে। আর হাত ও মাথা দ্বারাও এরূপ কোন ইশারাও করবে না যা ইসলামী আকীদাহ ও ইসলামী স্বভাব বিরোধী হয়।

রাসূল (সাঃ) রুমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন তার ভাষা ছিল এমন ঃ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى -

অর্থাৎ যে হেদায়েতের অনুসরণ করে তার উপর সালাম।

২২. সালামের পর বন্ধুত্ব ও আনন্দ প্রকাশার্থে মুসাফাহাও করবে। রাসূল (সাঃ) নিজেও তা করতেন এবং তাঁর সাহাবীগণও পারস্পরিক সাক্ষাতে মুসাফাহা করতেন। তিনি সাহাবীগণকে মুসাফাহা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করেছেন।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? হযরত আনাস (রাঃ) জবাব দিলেন জ্বী, হ্যাঁ ছিল।

হযরত সালামাহ বিন দাবদান (রহ.) বলেছেন যে, আমি হযরত মালেক বিন আনাস (রহ.) কে দেখেছি যে, তিনি লোকদের সাথে মুসাফাহা করেছেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, বনী লাইসের গোলাম! তিনি আমার মাথায় তিনবার হাত ফিরালেন আর বলেন, আল্লাহ তোমাকে নেক ও প্রাচুর্য দান করুন।

একবার ইয়ামেনের কিছু লোক আসলো, রাসূল (সঃ) সাহাবীগণকে বললেন, "তোমদের নিকট ইয়ামেনের লোকেরা এসেছে আর আগত ব্যক্তিদের মধ্যে এরা মুসাফাহার বেশী হকদার। (আবু দাউদ)

হযরত হুযাইফাহ বিন ইয়ামনে (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দু'জন মুসলমান যখন সাক্ষাৎ করে এবং সালামের পর মুসাফাহা করার জন্য পরস্পরের হাত নিজের হাতের মধ্যে নেয় তখন উভয়ের গুনাহ এমন ঝরে যায়, যেমন গাছ থেকে শুকনা পাতা ঝরে পড়ে। (তিবরানী)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ পরিপূর্ণ সালাম এই যে মুসাফাহার জন্য হাতও মিলাবে।

২৫. বন্ধু প্রিয়জন অথবা মহান কোন ব্যক্তি সফর থেকে ফিরলে মুআনাকা করবে। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) যখন মদীনায় এসে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছে দরজা খটখট করলেন, তখন তিনি তার চাদর টানতে টানতে দরজা খুলে তার সাথে মুআনাকাহ করলেন এবং কপালে চুমু দিলেন। (তিরমিযি)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি মুসাফাহা করতেন আর কেউ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে মুআনাকাহ করতেন। *(তিবরানী)*

রুগ্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের নিয়ম

১. রোগী দেখাশুনা করবে। রোগী দেখাশুনার মর্যাদা শুধু এতটুকুই নয় যে সামাজিক জীবনের একটা আবশ্যকীয় বিষয় অথবা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিশীলতার আবেগকে গর্বিত করার একটি উপায় বরং এটা এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের দীনী অধিকার এবং আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের একটি অপরিহার্য দাবী, আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি কখনো আল্লাহর বান্দাহদের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না। রোগীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা থেকে অমনোযোগী হওয়া মূলতঃ আল্লাহ থেকে অমনোযোগী হওয়া।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পরিচর্যা করনি? বান্দাহ বলবে, প্রতিপালক! আপনি তো সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক, আমি কিভাবে আপনার পরিচর্যা করতাম? আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ অসুস্থ হয়েছিল তুমি তার পরিচর্যা করনি, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তা হলে আমাকে সেখানে পেতে! অর্থাৎ তুমি আমার সন্তুষ্টির হকদার হতে পারতে। *(মুসলিম)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি অধিকার । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি বললেনঃ

❑ তোমরা যখন অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম করবে।

❑ তোমাকে দাওয়াত করলে তার দাওয়াত গ্রহণ কর।

❑ যখন তোমার নিকট কেউ সৎ পরামর্শ চায় তখন তার শুভ কামনা কর এবং সৎ পরামর্শ দাও।

❑ যখন হাঁচি আসে এবং সে "আলহামদুলিল্লাহ" বলে তখন তুমি জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বল।

❑ যখন কোন ব্যক্তি রুগ্ন হয়ে পড়ে তখন তার পরিচর্যা করো,

❑ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার কফিনের সাথে যাও। *(মুসলিম)*

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দাহ তার কোন মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায় অথবা তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য যায় তখন একজন ফেরেস্তা আকাশ থেকে চীৎকার করে বলেন, তুমি ভাল থাক, তুমি বেহেশতে তোমার ঠিকানা করে নিয়েছো। *(তিরমিযি)*

২. রোগীর শিয়রে বসে তার মাথা অথবা শরীরে হাত বুলাবে এবং সান্ত্বনা ও সন্তোষের কথা বলবে, যেমন তার বোধশক্তি পরকালের পুরস্কার ও সওয়াবের দিকে মনোযোগী হয়। আর অধৈর্য্য, অভিযোগ ও অসন্তোষের কোন কথা যেন তার মুখে না আসে।

হযরত আয়েশা বিনতে সাআদ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা নিজের জীবনের ঘটনা শুনিয়েছেন এভাবে যে, " আমি একবার মদীনায় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। রাসূল (সাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসলেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি যথেষ্ট সম্পদ রেখে যাচ্ছি আমার মাত্র একটি মেয়ে। আমি কি আমার সম্পদ থেকে দুতৃতীয়াংশ অছিয়ত করে যাব? আর এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক মেয়ের জন্য রেখে যাবো ? তিনি বললেন, না। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তা হলে এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করে যাবো? তিনি বললেন, হাঁ। এক তৃতীয়াংশের অছিয়ত করে যাও আর এক তৃতীয়াংশই অনেক।" তারপর রাসূল (সাঃ) তাঁর হাত আমার কপালে রাখলেন এবং আমারও পেটের উপর ফিরালেন আর দোয়া করলেন।

"আয় আল্লাহ ! সাআদকে সুস্থতা দান কর এবং তার হিজরতকে পূর্ণতা দান কর !" এরপর থেকে আজ পর্যন্ত যখনই মনে পড়ে তখনই রাসূল (সাঃ)এর মুবারক হস্তের শিহরণ আমার মুখ কলিজার উপর অনুভব করি। *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

হযরত যায়েদ বিন আরকান (রাঃ) বলেছেন যে, একবার আমার চোখ উঠলো। রাসূল (সাঃ) আমাকে এসে বললেন, যায়েদ! তোমার চোখে এতো কষ্ট ! তুমি কি করছো ? আমি আরয করলাম যে, ধৈর্য্য ও সহ্য করছি, তিনি বললেন, " তুমি চোখের এ কষ্টে ধৈর্য্য ও সহ্য অবলম্বন করছো এজন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এর বিনিময়ে বেহেশত দান করবেন ।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন তখন তার মাথার কাছে বসে সাতবার বলতেন।

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ـ

আমি মহান আরশের মালিক মহান আল্লাহর নিকট তোমার আরোগ্যের জন্য শাফায়াত কামনা করছি।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "এ দোয়া সাতবার পাঠ করলে, তার মৃত্যু নির্দ্ধারিত না হয়ে থাকলে, সে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে।" (মেশকাত)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) এক বৃদ্ধা মহিলা উম্মুস সায়ের (রাঃ) কে রোগ শয্যায় দেখতে আসলেন। উম্মুস সায়ের তখন জ্বরের প্রচণ্ডতায় কাঁপছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি অবস্থা ? মহিলা বললেন, আল্লাহ এ জ্বর দিয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছেন। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ এ জ্বরকে বুঝুক। মন্দ-ভাল বলোনা। জ্বর গুনাহসমূহকে এভাবে পরিষ্কার করে দেয় আগুনের চুল্লি লোহার মরিচাকে যেমন পরিষ্কার করে দেয়।" *(আল আদাবুল মুফরাদ)*

৩. রোগীর নিকট গিয়ে তার রোগের প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞেস করবে এবং তার আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। রাসূল (সাঃ) যখন রুগীর নিকট যেতেন তখন জিজ্ঞেস করতেন, "তোমার অবস্থা কেমন? অতঃপর সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন ঃ لَابَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

ভয়ের কোন কারণ নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল হয়ে যাবে। ইহা গুনাহ মাফের একটি উপায়। আর কষ্টের স্থানে ডান হাত বুলিয়ে এ দোয়া করতেন।

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّاشِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُسَقَمًا ـ (بخارى ـ مسلم)

" আয় আল্লাহ ! এ কষ্টকে দূর করে দাও ! আয় মানুষের প্রতিপালক ! তুমি তাকে আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দাতা, তুমি ব্যতীত আর কারো কাছে আরোগ্যের আশা নেই। এমন আরোগ্য দান করো যে, রোগের নাম-নিশানাও না থাকে।"

৪. রোগীর নিকট অনেকক্ষণ বসবেনা এবং হৈ চৈ করবে না। হ্যাঁ রোগী যদি তোমার বন্ধু অথবা প্রিয়জন হয় এবং সে যদি অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে চায় তা হলে তার অনুরোধ রক্ষা করবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলছেন যে, "রোগীর নিকট অনেকক্ষণ বসে না থাকা এবং হৈ চৈ না করা সুন্নাত ।"

৫. রোগীর আত্মীয়দের নিকটও অসুখের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করবে আর সহানুভূতি প্রকাশ করবে এবং খেদমত ও সহযোগিতা করা সম্ভব হলে অবশ্যই করবে। যেমন ডাক্তার দেখানো, রোগীর অবস্থা বলা, ঔষধ ইত্যাদি আনা এবং প্রয়োজনবোধে আর্থিক সাহায্য করা।

৬. অমুসলিম রোগীকেও দেখতে যাবে এবং সুযোগ বুঝে তাকে সত্য দীনের দিকে মনোযোগী করবে, অসুস্থ অবস্থায় মানুষ তুলনামূলকভাবে আল্লাহর দিকে বেশী মনোযোগী হয়। তখন ভাল জিনিস গ্রহণের আগ্রহও সাধারণতঃ বেশী জাগ্রত হয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদীর ছেলে রাসূল (সাঃ)-এর খেদমত করতো। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখার জন্য গেলেন। তিনি শিয়রে বসে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ছেলে পাশে অবস্থিত পিতার দিকে দেখতে লাগলো, পিতা ছেলেকে বলল, বৎস! আবুল কাসেম-এর কথাই মেনে নাও, সুতরাং ছেলেটি মুসলমান হয়ে গেল। এখন রাসূল (সাঃ) সেখান থেকে এ কথা বলতে বলতে বের হলেন, 'সেই আল্লাহর শোকর যিনি এ ছেলেটিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।

(বুখারী)

৭. রোগীর বাড়ীতে তাকে দেখতে গিয়ে এদিক সেদিক তাকাবে না এবং সতর্কতার সাথে এমনভাবে বসবে যাতে ঘরের মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি না পড়ে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) একবার কোন এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। সেখানে আরো কিছু লোক বর্তমান ছিল। তার সাথীদের কেউ মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) যখন বুঝতে পারলেন, তখন বললেন, তুমি যদি তোমার চোখটি ছিদ্র করে নিতে তা হলে তোমার জন্য ভাল হতো।

৮. যে ব্যক্তি প্রকাশ্য পাপ ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত থাকে আর নির্লজ্জতার সাথে আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকে তার রুগী দেখতে যাওয়া উচিত নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেছেন ঃ মদখোর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তাকে দেখতে যেয়োনা।

৯. রোগী দেখতে গেলে রোগীর পক্ষ থেকেও নিজের জন্য দোআ করবে। ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, তুমি যখন রোগী দেখতে যাও তবে তার কাছ থেকে নিজের জন্য দোআর আবেদন কর, রোগীর দোআ ফিরিশতাদের দোআর সমতুল্য।

সাক্ষাতের নিয়ম-কানুন

১. সাক্ষাতের সময় হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাবে বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটাবে এবং সালামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, এ হচ্ছে বড় সওয়াব।

২. সালাম ও দোআর জন্য অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করবে না, রাসূল (সাঃ)-এর দেয়া শব্দ "আসসালামু আলাইকুম" ব্যবহার করবে, তারপর সুযোগ পেলে মুসাফাহা করবে, অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করবে আর উপযুক্ত মনে হলে পরিবারস্থ লোকদেরও খোঁজ খবর নেবে, রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষা দেয়া শব্দ "আসসালামু আলাইকুম" অনেক বেশী অর্থপূর্ণ। এতে দীন ও দুনিয়ার সর্বপ্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা এবং শুভ ও সুস্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত। খেয়াল রাখবে যে রাসূল (সাঃ) মুসাফাহা করার সময় নিজের হাত তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন না, অপর ব্যক্তি নিজেই হাত ছাড়িয়ে নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

৩. কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে পরিষ্কার কাপড় পরে যাবে। ময়লা কাপড় পরিধান করে যাবে না, আর মূল্যবান পোশাক দ্বারা অন্যের উপর প্রভাব খাটানোর উদ্দেশ্যেও যাবে না।

৪. কারো সাথে যখন সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করবে তখন তার সাথে আগে আলোচনাক্রমে সময় ঠিক করে নেবে, এমনিভাবে সময়-অসময়ে কারো নিকট যাওয়া ঠিক নয়, এর দ্বারা অন্যের সময়ও নষ্ট হয় এবং সাক্ষাৎকারীকেও অনেক সময় হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

৫. কেউ যখন তোমার নিকট সাক্ষাৎ করতে আসে, তখন বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দ্বারা অভ্যর্থনা করবে। সম্মানের সাথে বসাবে এবং সুযোগমত উপযুক্ত অতিথেয়তাও করবে।

৬. কারো কাছে গেলে তখন কাজের কথা বলবে। অকাজের কথা বলে অযথা সময় নষ্ট করবে না। নতুবা লোকদের নিকট যাওয়া ও বসাটা বিরক্তিবোধ হবে।

৭. কারো কাছে গেলে দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি নেবে। আর অনুমতি পাওয়া গেলে আসসালামু আলাইকুম বলে ভিতরে যাবে আর যদি তিনবার আসসালামু আলাইকুম বলার পরও জবাব না মিলে তা হলে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসবে।

৮. কারো কাছে যাবার সময়ও কখনো কখনো উপযুক্ত তোহফাও সাথে নিয়ে যাবে। তোহফা দেয়া নেয়ায় বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়।

৯. কোন অভাবী ব্যক্তি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে যথাসম্ভব তার অভাব পূরণ করে দেবে। সুপারিশের আবেদন করলে সুপারিশ কবুল করে কারো অভাব পূরণ করতে না পারলেও তাকে সৌহার্দ্য পূর্ণ পদ্ধতিতে নিষেধ করে দেবে। অনর্থক তাকে আশাবাদী করবে না।

১০. কারো নিকট নিজের প্রয়োজনে গেলে ভদ্রভাবে নিজের প্রয়োজনের কথা বলবে এবং প্রয়োজন পূর্ণ হলে শুকরিয়া আদায় করবে, না হলে তখন সালাম করে খুশী হয়ে ফিরে আসবে।

১১. লোকেরা সাক্ষাৎ করতে আসবে এ আকাঙ্খা করবে না, নিজেই অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে। পরস্পর মেলামেশা বৃদ্ধি করা এবং একে অন্যের উপকার করা বড় পসন্দনীয় কাজ, কিন্তু খেয়াল রাখবে যে, মুমিনদের মেলামেশা সর্বদা সদুদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

১২. সাক্ষাতের সময় যদি দেখা যায় সাক্ষাৎকারীর মুখমণ্ডল দাড়ি অথবা কাপড়ে খড়কুটা অথবা অন্য কোন জিনিস লেগে আছে তাহলে তা সরিয়ে দেবে, আর অন্য কেউ যদি তোমার সাথে এ সদ্ব্যবহার করে তখন শুকরিয়া আদায় করবে আর তার জন্য এ দোআ করবে-

مَسَحَ اللّٰهُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُهُ ۔

আপনার নিকট যা অপসন্দনীয় তা আল্লাহ্ দূর করে দেবেন।

১৩. রাতের বেলায় কারো নিকট যাবার প্রয়োজন হলে তার আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অনেক্ষণ বসে থাকবে না আর যাবার পর যদি অনুমান হয় যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা হলে কোন প্রকার মনোকষ্ট না নিয়ে খুশী মনে ফিরে আসবে।

১৪. কয়েকজন একত্রে কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তখন আলোচনাকারীকে আলোচনায় নিজের সাথীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা আর সম্বোধিত ব্যক্তিকে নিজের ব্যক্তিত্বের দিকে মনোযোগী করা থেকে কঠোর ভাবে বিরত থাকবে।

আলোচনার আদবসমূহ

১. সর্বদা হক কথা বলবে। যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন, কখনো হক কথা বলতে ইতঃস্তত করবে না।

২. প্রয়োজনীয় কথা বলবে আর যখনই কথা বলবে কাজের কথা বলবে। সব সময় কথা বলা এবং নিষ্প্রয়োজনে কথা বলা গাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধ বিরোধী। আল্লাহর নিকট সব কথারই জবাব দিতে হবে, মানুষ যে কথাই মুখ থেকে বের করে, আল্লাহর ফিরিশতাগণ তার সবই নোট করে রাখে।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۔

"যে কথাই মুখ থেকে বের হয় তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তার নিকট এক সতর্ক পরিদর্শক প্রস্তুত আছে।" (আল কুরআন)

৩. যখন কথা বলবে, নম্রতার সাথে মিষ্টি স্বরে বলবে। সর্বদা মধ্যম আওয়াযে কথা বলবে, এতো আস্তেও বলবে না যে, সম্বোধিত ব্যক্তি শুনতে না পারে আর এতো চীৎকার করেও বলবে না যে সম্বোধিত ব্যক্তির প্রতি প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা হতে পারে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে-

وَاِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوٰتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۔

নিশ্চয়ই ঘৃণ্যতম স্বর হলো গাধার স্বর।'

৪. কখনো খারাপ ভাষা দ্বারা মুখ অপবিত্র করবে না। অপরের সম্পর্কে খারাপ কথা এবং একজনের কথা অন্যকে বলবে না, অভিযোগ করবে না, নিজের মহাত্ম প্রকাশ করবে না, নিজের প্রশংসা করবে না, কারো উপর বিদ্রূপ করবে না, কাউকে অপমানসূচক কোন নামে ডাকবে না, কথায় কথায় কসম খাবে না।

৫. ন্যায় বিচারের কথা বলবে তাতে নিজের অথবা বন্ধু এবং আত্মীয়ের ক্ষতি হলেও।

وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ـ

"আর যখন তোমরা কিছু বলো তখন ইনসাফের কথা বলো, যদিও তারা নিকটআত্মীয়ও হয়।"

৬. নম্রতা, যুক্তিপূর্ণ এবং সান্ত্বনার স্বরে কথা বলবে, কর্কশ ও কষ্টদায়ক শক্ত কথা বলবে না।

৭. মহিলাদের যদি কোন সময় গায়ের মুহরেম পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় তখন পরিষ্কার, সরল এবং কর্কশ স্বরে কথা বলবে। স্বরে কোন নম্রতা ও কমনীয়তা সৃষ্টি করবে না যেন শ্রোতা কোন কুধারণা অন্তরে আনতে পারে।

৮. কোন মূর্খ ব্যক্তি যদি কথার প্যাচে জড়িত করতে চায় তা হলে যথাযথভাবে সালাম করে সেখান থেকে বিদায় হয়ে যাবে। অতিরিক্ত কথা বলা ব্যক্তি ও বাজে কথায় লিপ্ত ব্যক্তি উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্টতম লোক।

৯. সম্বোধিত ব্যক্তিকে কথা সুন্দর ভাবে বুঝার জন্য অথবা কোন কথার গুরুত্ব ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য সম্বোধিত ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা ধারাকে সম্মুখে রেখে যথার্থ পদ্ধতি অবলম্বন করবে আর সম্বোধিত ব্যক্তি যদি কথা বুঝতে না পারে বা শুনতে না পায় তাহলে পুনরায় বলবে এবং এতে মোটেও মনোকষ্ট নেবে না।

১০. আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপ ও উদ্দেশ্যের কথা বলবে, বিনা কারণে আলোচনা দীর্ঘ করা ঠিক নয়।

১১. দীন সম্পর্কে যদি কখনো কোন কথা বুঝতে হয় অথবা দীনের কিছু বিধিনিষেধ ও মাসায়েল বোধগম্য করাতে হয় তখন অত্যন্ত সাদা-সিধাভাবে আবেগের সাথে নিজের কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবে।

১২. কখনো খোশামোদ ও তোশামোদের কথা বলবে না। নিজের সম্মানের খেয়াল রাখবে আর কখনো নিম্নমানের কথা বলবে না।

১৩. দু'ব্যক্তি কথা বলতে থাকলে তখন তাদের অনুমতি ব্যতীত কথার মধ্যে অংশগ্রহণ করবে না, আর কখনো কারো কথা কেড়ে কথা বলার চেষ্টা করবে না, বলা যদি জরুরীই হয় তা হলে অনুমতি নিয়ে বলবে।

১৪। ধীরে ধীরে দক্ষতা ও গাম্ভীর্যের সাথে আলোচনা করবে এবং তাড়াতাড়ি ও তীব্রতা করবে না, সব সময় হাসি-ঠাট্টা করবে না। এর দ্বারা মানুষের মর্যাদা কমে যায়।

১৫. কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে প্রথমে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তা শুনবে। আর খুব চিন্তা করে জবাব দেবে। বিনা চিন্তা ও না বুঝে জবাব দেয়া বড় মুর্খতার কাজ। কেউ যদি অন্য কাউকে প্রশ্ন করে তাহলে নিজে যেচে জবাব দেবে না।

১৬. কেউ কিছু বলতে থাকলে আগেই বলবে না যে, আমি জানি। হতে পারে যে, তার বলাতে নতুন কোন কথা এসে যাবে অথবা কোন বিশেষ কথা দ্বারা অন্তরে বিশেষ কোন ক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

১৭. যার সাথে কথা বলা হোক তার মর্যাদা ও তার সাথে নিজের সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলবে। মাতা-পিতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য মুরব্বীদের সাথে আদবের সাথে কথা বলবে। অনুরূপভাবে ছোটদের সাথে কথা বলতে নিজের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্নেহ ও ভক্তিসুলভ আলোচনা করবে।

১৮. আলোচনা করার সময় কারো দিকে ইংগিত করবে না, যাতে অন্যের কুধারণা হয় এবং অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অন্যের কথা লুকিয়ে শোনা ঠিক না। অন্যের কথা বেশী করে শুনবে এবং তার চাইতে কম বলবে। গোপন কথা কারো কাছেই বর্ণনা করবে না। নিজের গোপন কথা অপরের নিকট বর্ণনা করে তার থেকে হেফাজতের আশা করাটা সরাসরি মুর্খতা।

চিঠি লেখার নিয়ম-নীতি

১। বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম দ্বারা শুরু করবে, সংক্ষেপে করতে চাইলে "বিইসমিহি তাআলা" লিখবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে কাজ "বিসমিল্লাহ" দ্বারা শুরু করা হবে না তা অসম্পূর্ণ এবং বরকতহীন। কোন কোন ব্যক্তি শব্দের পরিবর্তে (সংখ্যা) ৭৮৬ লিখে, তার থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহর শিক্ষা দেয়া শব্দে বরকত আছে।

২. নিজের ঠিকানা প্রত্যেক চিঠিতে অবশ্যই লিখবে এবং এর পূর্বে প্রেরকের ঠিকানা দেয়া আছে অথবা তার স্মরণ আছে, এ কথা জরুরী নয় যে, প্রাপকের নিকট ঠিকানা রক্ষিত হবে আর এও জরুরী নয় যে, প্রাপক ঠিকানা মুখস্ত করে রাখবে।

৩. ডান দিকে সামান্য জায়গা বাদ দিয়ে নিজের ঠিকানা লিখবে। ঠিকানা সর্বদা পরিষ্কার ও সুন্দর করে লিখবে ঠিকানার বিশুদ্ধতা ও বানানের দিক থেকে মন স্থির করে নেবে। বাংলা-ইংরেজীতে চিঠি লিখতে হলে বামদিকের প্রান্তে ঠিকানা লিখতে হবে।

৪. নিজের ঠিকানার নিচে অথবা বামদিকে লেখা শুরু করার উপরের দিকে তারিখ লিখবে।

৫. তারিখ লেখার পর সংক্ষিপ্ত উপাধি ও সম্ভাষণের মাধ্যমে প্রাপককে সম্বোধিত করবে। উপাধি ও সম্ভাষণ সর্বদা সংক্ষেপে লিখবে, যার দ্বারা আন্তরিকতা ও নৈকট্য অনুভূত হয়, এরূপ উপাধি থেকে বিরত থাকবে যার দ্বারা রং চড়ান ও অতিরঞ্জিত কোনকিছু অনুভূত হয়। উপাধি ও সম্ভাষণের সাথেই অথবা উপাধির নিচে দ্বিতীয় লাইনে "সালাম মাসনুন" অথবা "আসসালামু আলাইকুম" আদব তাসলীমাত লিখবে।

৬. অমুসলিমকে চিঠি লেখার সময় "আসসালামু আলাইকমু " অথবা "সালামুন মাসনুন" লেখার জায়গায় আদব ও তাসলীমাত ইত্যাদি শব্দ লিখবে।

৭. উপাধি ও আদাব এর পর নিজের উদ্দেশ্য ও বাসনার কথা লিখবে যে উদ্দেশ্যে চিঠি লিখিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এরপর প্রাপকের সাথে সম্পর্ক প্রকাশক শব্দের সাথে নিজের নাম লিখে চিঠি শেষ করবে।

৮. চিঠি অত্যন্ত পরিষ্কার করে লিখবে যেন সহজে পড়া ও বুঝা যায়। এবং প্রাপকের অন্তরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৯. চিঠিতে অত্যন্ত পরিষ্কার, সহজ ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করবে।

১০. চিঠি সংক্ষেপে লিখবে ও প্রতিটি কথা খুলে পরিষ্কারভাবে লিখবে, শুধু ইশারা করবে না।

১১. পূর্ণ চিঠিতে উপাধি ও সম্ভাষণ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাপকের মর্যাদার দিকেও লক্ষ্য রাখবে।

১২. নতুন প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করার সময় অন্তত এক শব্দের পরিমাণ স্থান খালি রাখবে।

১৩. চিঠিতে সংযত ভাব ঠিক রাখবে, অসামঞ্জস্য পূর্ণ কথা লিখবে না।

১৪. রাগত অবস্থায় কোন চিঠি লিখবে না, কোন গালা-গালির কথাও চিঠিতে লিখবে না। চিঠি সর্বদা নম্র ভাষায় লিখবে।

১৫. সাধারণত চিঠিতে কোন গোপন কথা লিখবে না।

১৬।.বাক্য শেষে দাঁড়ি দেবে।

১৭. বিনা অনুমতিতে কারো চিঠি পড়বে না। এটা সরাসরি আমানতের খেয়ানত। অবশ্য ঘরের মুরুব্বীদের ও পৃষ্ঠ পোষকদের দায়িত্ব যে, ছোটদের চিঠি পড়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেবে, আর যথাযথ পরামর্শ দেবে। মেয়েদের চিঠির উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে।

১৮. আত্মীয়দের ও বন্ধু বান্ধবদেরকে খবরাখবর জানিয়ে নিয়মিত চিঠি লিখতে থাকবে।

১৯. কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে, কেউ বিছানায় পতিত হলে অথবা অন্য কোন বিপদে ফেঁসে গেলে তখন তাকে সহানুভূতিসূচক পত্র লিখবে।

২০. কারো ঘরে কোন উৎসব হলে কোন প্রিয় ব্যক্তি আসলে অথবা আনন্দের অন্য কোন সুযোগ হলে ধন্যবাদ পত্র লিখবে।

২১. চিঠিপত্র সর্বদা কাল অথবা নীল কালিতে লিখবে, কাঠ পেন্সিল বা লাল কালি দ্বারা কখনো লিখবে না।

২২. কোন ব্যক্তি ডাকে ফেলার জন্য চিঠি দিলে তখন অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে সময়মত ফেলবে, কর্তব্যহীনতা ও গড়িমসি করবে না।

২৩. অনাত্মীয় লোকদেরকে জবাব চাই কথার জন্য জবাবী কার্ড, ফেরত কার্ড অথবা টিকেট পাঠিয়ে দেবে।

২৪. লিখে কাটতে চাইলে হালকা হাতে তার উপর একটি আঁক টেনে দেবে।

২৫. পত্রে শুধু নিজের চিত্ত আকর্ষণীয় এবং নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় কথাগুলোই লিখবে না বরং সম্বোধিত ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখবে, শুধু নিজ সম্পর্কিত ব্যক্তিদেরই খবর জানাবে। আর স্মরণ রাখবে পত্রে কারো থেকে বেশী দাবী দাওয়া করবে না। বেশী দাবী দাওয়া করলে মানুষের মর্যাদা নষ্ট হয়।

কারবারের আদবসমূহ

১. মনের আকর্ষণ ও পরিশ্রমের সাথে কারবার করবে, নিজের জীবিকা নিজ হাতেই কামাবে, কারো উপর বোঝা হবে না।

একবার রাসূল (সাঃ)এর দরবারে এক আনসারী সাহাবী এসে ভিক্ষে চাইল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কোন আসবাবপত্র আছে? সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! শুধু দু'টো জিনিস আছে। তার একটি চটের বিছানা, যা আমি গায়েও দিই এবং আমার বিছানাও, আর একটি পানির গ্লাস। তিনি বললেন, এ দুটি জিনিসই আমার নিকট নিয়ে এসো। সাহাবী উহা নিয়ে হাজির হলেন। তিনি উভয়টি নিলামে দু' দিরহামে বিক্রি করে এক দিরহাম তাকে দিয়ে বললেন এ দিরহাম দিয়ে পরিবারস্থ লোকদের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে দিয়ে এসো। আর এক দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে নিয়ে এসো। অতঃপর তিনি নিজ হাতে কুড়ালে হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, যাও জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আন এবং তা বাজারে নিয়ে বিক্রি কর, পনের দিন পর এসে আমার কাছে অবস্থা জানাবে। পনের দিন পর ঐ সাহাবী হাজির হলেন, তখন তিনি দশ দিরহাম তহবিল করেছিলেন। একথা শুনে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন, এ পরিশ্রমের উপার্জন তোমার জন্য কতই না উত্তম যে, তুমি মানুষের নিকট থেকে ভিক্ষা করতে আর কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষার কলংক লেগে থাকতো।

২. শক্ত হয়ে দৃঢ়তার সাথে উপার্জন করবে, বেশী বেশী উপার্জন করবে, যেন মানুষের নিকট ঋণী না থাক। রাসূল (সাঃ)কে একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সব চাইতে উত্তম উর্পাজন কোনটি ? তিনি বললেন, নিজ হাতে উপার্জন এবং যে কারবারে মিথ্যা ও

খেয়ানত না হয় ।" হযরত আবু কোলাবাহ (রাঃ) বলতেন, বাজারে ধৈর্য্যের সাথে কারবার কর। তুমি দীনের উপর শক্তভাবে স্থির থাকতে পারবে ও লোকদের থেকে মুক্ত থাকবে।

৩. ব্যবসায় উন্নতি লাভ করার জন্য সর্বদা সত্য কথা বলবে, মিথ্যা শপথ করবেনা।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে মুখ তুলে দেখবেন না, তাকে পাক পবিত্র করে বেহেশতে দাখিল করবেন না, যে মিথ্যা শপথ খেয়ে খেয়ে নিজের কারবারের উন্নতিলাভ করতে চেষ্টা করে। *(মুসলিম)*

৪. ব্যবসায়ে দীনদারী ও আমানতদারী অবলম্বন করবে, আর কাউকে কখনো খারাপ মাল দিয়ে নিজের হালাল উপার্জনকে হারাম করবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "সত্যবাদী ও আমানতদারী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী , সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গী হবে। *(তিরমিযি)*

৫. খরিদ্দারকে ভাল জিনিস সরবরাহ করতে চেষ্টা করবে, যে নিশ্চিন্ত নয় যে তা ভাল না খারাপ- তা কখনো কোন খরিদ্দারকে দেবে না আর কোন খরিদ্দার যদি পরামর্শ চায় তা হ'লে তাকে ঠিক পরামর্শ দেবে।

৬. খরিদ্দারদেরকে নিজের বিশ্বস্ততায় আনতে চেষ্টা করবে যেন সে হিতাকাঙ্খী মনে করে, তার উপর নির্ভর করে এবং তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, সে তার নিকট কখনো প্রতারিত হবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের ওপর জীবন নির্বাহ করেছে, আমার সুন্নতের উপর আমল করেছে, আমার নির্দ্দেশিত পথে চলেছে এবং লোকদেরকে নিজের দুষ্টামী থেকে নিরাপদ রেখেছে তা হলে এ ব্যক্তি জান্নাতী।" সাহাবীগণ আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ যুগে এমন লোক তো অনেক আছে। তিনি বললেন, "আমার পরেও এরূপ লোক থাকবে।" *(তিরমিযি)*

৭. সময়ের প্রতি খেয়াল রাখবে, সময়মত দোকানে পৌছে ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "জীবিকার অন্বেষণ এবং হালাল উপার্জনের জন্য ভোরে উঠে যাও। কেননা ভোরের কাজ সমূহ অধিক বরকতপূর্ণ হয়।"

৮. নিজেও প্ররিশ্রম করবে আর কর্মচারীদেরকেও পরিশ্রমে অভ্যস্থ করে তুলবে। অবশ্য কর্মচারীদের কাছ থেকে অধিকার, উদারতা ও সহনশীলতার সাথে কাজ আদায় করবে। তাদের সাথে নম্রতা ও প্রশস্ততা মূলক ব্যবহার করবে, কথায় কথায় রাগ করা ও সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআলা ঐ জাতিকে পবিত্র করবেন না, যারা প্রতিবেশী ও দুর্বলদের অধিকার প্রদান করে না।

৯. খরিদ্দারদের সাথে সর্বদা নম্র ব্যবহার করবে আর কর্জ প্রার্থীদের সাথে কটু কথা বলবে না, তাদেরকে নিরাশও করবে না এবং তাদের তাগাদায়ও কঠোরতা অবলম্বন করবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির উপর দয়া করুন। যে ব্যক্তি কেনাবেচা ও তাগাদায় নম্রতা ও সদাচার ও ভদ্রতা অবলম্বন করে "

রাসূল (সাঃ) এও বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ আকাঙ্খা রাখে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন দুঃখ ও অস্থিরতা থেকে রক্ষা করুন তাহলে তার উচিত অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্থ ঋণ গ্রহীতাকে সময় দেয়া অথবা তার উপর থেকে ঋণের বোঝা রহিত করা।

১০. মালের কোন দোষ গোপন করা যাবে না। মালের দোষের কথা খরিদ্দারকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেবে এবং খরিদ্দারকে ধোকা দেবে না। একবার রাসূল (সাঃ) এক শস্য ভান্ডারের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তিনি স্তুপের মধ্যে নিজের হাত ঢুকালেন তখন আঙ্গুলে কিছুটা ভিজা অনুভব হলো। তিনি শস্যের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? দোকানদার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্তুপের উপর বৃষ্টি হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তবে তুমি ভিজা শস্যগুলো কেন উপরে রাখনি? তাহলে লোকেরা দেখতে পেতো। যে ব্যক্তি ধোকা দেয় তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

১১. মূল্য বাড়ার প্রতীক্ষায় গুদামজাত করে রেখে আল্লাহর সৃষ্টিকে অস্থির করা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "গুদামজাতকারী পাপী"। অন্য এক স্থানে তিনি বলেছেন ঃ "গুদাম জাতকারী কত খারাপ লোক যে আল্লাহ যখন সস্তা

করে দেন তখন সে দুঃখে অস্থির হয়ে যায়। আর যখন মূল্য বেড়ে যায় তখন সে খুশী হয়ে যায়। *(মেশকাত)*

১২. খরিদ্দারকে তার অধিকার দেবে। মাপে সততার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে, লেনদেনও একইভাবে করবে।

রাসূল (সাঃ) ওজনকারী ব্যবসায়ীদের সাবধান করে বলেছেন "তোমাকে এমন দু'টি কাজে দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছে যার দরুন তোমাদের অতীত জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে।"

পবিত্র কোরআনে আছে-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ - الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَإِذَا كَالُوْا هُمْ أَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ - أَلَا يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ - لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

(المطففين)

যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য ধ্বংস ! যারা ওজন করে নেবার সময় পুরোপুরি নেয়, আর যখন তাদেরকে ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি জানেনা যে, তা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে। এক মহান দিনে, সেদিন সৃষ্টিকূলের প্রতিটি প্রাণী মহান আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবে।

(সূরায়ে মুতাফফীফীন ১৩)

পবিত্র কোরআনে আরো আছে -

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ - ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ - إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসায় শিক্ষা দেবো যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব থেকে নাজাত দেবে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে, আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান।"

(সূরায়ে ছফ ১১-১২)

দীনের দাওয়াত

দীনের প্রতি আহ্বানকারীর আচার-আচরণ

১. দায়ী হিসাবে তোমার পদের প্রকৃত জ্ঞান সৃষ্টি কর, কেননা, তুমি নবীর উত্তরাধিকারী। দীনের দাওয়াত, সত্যের সাক্ষ্য এবং তাবলীগ বা প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে যা আল্লাহর নবী করেছেন। সুতরাং দায়ীসুলভ ব্যাকুলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা কর যা রাসূল (সাঃ)-এর ছিল।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে-

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَسَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ـ

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং দীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর দীন, তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। আর রাসূল (সাঃ) তোমাদের সাক্ষী, তোমরা মানুষের সাক্ষী হও।"

অর্থাৎ মুসলিম উম্মতগণ রাসূল (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী। তাকে তাই করতে হবে যা রাসূল (সাঃ) করেছেন। যেভাবে রাসূল (সাঃ) নিজের কথা ও কাজ, দিন ও রাতের কুরবানী আল্লাহর দীন প্রচারের কাজে ব্যয় করেছেন। ঠিক অনুরূপ উম্মতকেও দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট আল্লাহর দীনকে পৌঁছে দিতে হবে এবং এ কর্তব্যের কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যেন সত্য দীনের জীবিত সাক্ষ্য হয়ে থাকা যায়।

২. নিজের মর্যাদার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবে, জীবনকে যথার্থ করে গঠন করা এবং পবিত্র রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। দুনিয়ার অন্যান্য উম্মতের মত একজন উম্মত নয় বরং আল্লাহ তোমাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছেন। তোমাকে দুনিয়ার জাতি সমূহের মধ্যে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব দিয়েছেন ।

পবিত্র কোরআনে আছে-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۔ (البقرة)

"আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা লোকদের সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন।" *(সূরায়ে বাকারাহ)*

৩. উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নয় বরং প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে হৃদয়ে ধারণ করবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে উম্মতের প্রধান উদ্দেশ্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবে যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিয়ে এসেছেন আর যে আকীদাসমূহ ও সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি তথা মানবিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত সবই আসমানী হেদায়েতের অন্তর্গত। রাসূল (সাঃ) নিজে এ দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মৌল বিশ্বাস ও চরিত্র সম্পর্কে এবং ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। জীবনকে সুশৃংখলিত করে এবং ভাল ও প্রাচুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ এক বরকতময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪. অসৎ কাজকে ধ্বংস ও সৎকাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং এটাই ঈমানের দাবী, আর এটাই জাতীয় অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের জন্যই বেঁচে থাকবে আর এ জন্যই প্রাণ বিসর্জন দেবে। এ কাজ সম্পাদনের জন্যই মহান আল্লাহ 'খায়রে উম্মত' বা 'উত্তম জাতি' নামক মহা উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

"তোমাদেরকে খায়রে উম্মত (উত্তম জাতি) বা সমগ্র মানবতার উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে মানুষদের বিরত রাখবে আর আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখবে।" *(আল কুরআন)*

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۔ (القران)

রাসূল (সঃ) বলেছেন–

"সে সত্ত্বার শপথ যার হস্তমুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে নতুবা আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তোমাদের ওপর এমন আযাব অবতীর্ণ করবেন যে, তখন তোমরা দোআ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোআ কবুল হবে না।" *(তিরমিযী)*

৫. আল্লাহর বার্তা পৌছানো এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আহ্বানকারীদের উদাহরণ পেশ করার মত যোগ্য ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি কর। রাসূল (সাঃ)-এর অনুপম ব্যাকুলতা ও অন্তরের ব্যথার কথা পবিত্র কুরআনে এই ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا - (الكهف ٦)

"সম্ভবতঃ আপনি তাদের দুঃখে আপনার জীবন ধ্বংস করে দেবেন যদি তারা কিতাবের উপর ঈমান না আনে।" *(সূরায়ে কাহাফ-৬)*

স্বয়ং রাসূল (সাঃ)ও নিজের এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে

"আমার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে আর যখন তার চারিদিকে আগুনের আলোতে ঝলমল হয়ে উঠল তখন চতুর্দিক থেকে কীটপতঙ্গগুলো আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই থাকলো। অনুরূপভাবে আমিও তোমাদের কোমর চেপে ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি অথচ তোমরা আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছো।" *(মেশকাত)*

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহুদ ময়দানের চেয়ে কঠিন অবস্থা কি কোন দিন আপনার উপর অতিক্রম করেছে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। তা ছিল ঐদিন যে দিন তিনি মক্কাবাসীদের নিকট থেকে নিরাশ হয়ে তায়েফবাসীদের নিকট আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন। সেখানের সর্দার আবদে ইয়ালীল শহরের গুণ্ডাদেরকে তার পেছনে লেলিয়ে দিলো আর তারা আল্লাহর দীনের রহমত ও বরকতময় দাওয়াতের জবাবে পাথর বর্ষণ করলো। আল্লাহর রাসূল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলেন আর বেহুঁশ হয়ে ঘুরে পড়লেন। হুঁস ফিরে আসলে তিনি অস্থির ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। সালাব নামক স্থানে পৌছার পর দুঃখ কিছুটা হাল্কা হলো। এখানে আল্লাহ আযাবের ফেরেশতাকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন আযাবের ফেরেশতা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি নির্দেশ দেন তা হলে আমি আবু কোরাইশ পাহাড়ের ও লাল

পাহাড়ের মধ্যে পরস্পর ধাক্কা লাগিয়ে দেবো? আর উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী এ সকল পাপিষ্ঠকে পিষে তাদের পরিণাম জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। রাহমাতুল্লিল আলামীন আল্লাহর রাসূল বললেন, না, না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার জাতিকে ভয় প্রদর্শন করতে থাকবো, হয়তোবা আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে হেদায়েতের জন্য খুলে দেবেন, অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে যারা হেদায়েত কবুল করবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

রাসূল (সাঃ) মক্কায় আছেন এবং মক্কার লোকদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কেউ বলছে দেশ থেকে বের করে দাও, কেউ বলছে তাকে হত্যা করে ফেলো। এমন সময় মক্কায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, কোরাইশের লোকেরা অভাবের তাড়নায় গাছের পাতা ও ছাল-বাকল খেতে বাধ্য হলো। শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতো আর বড়রা তাদের এ দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

রহ্‌মতে আলম সমাজের এ কঠিন বিপদ দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সাথীরাও তাঁর অস্থিরতা দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর এ প্রাণের শত্রুদেরকে যাদের থেকে প্রাপ্ত জখম তখনও তাজা ছিল তিনি সহানুভূতির বাণী প্রেরণ করলেন এবং আবু সুফিয়ান ও ছাফওয়ানের নিকট পাঁচশত দীনার প্রেরণ করে বলে পাঠালেন, এ দীনারগুলো দুর্ভিক্ষ পীড়িত গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক।

৬. জাতির খেদমতে নিয়োজিত অবস্থায় নিজের কোন খেদমতের প্রতিদান মানুষের কাছে চাইবে না। যা কিছু করবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করবে আর তাঁর নিকটই নিজের পুরস্কার ও সওয়াবের আশা করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি পুরস্কার ও সওয়াবের আশা এমন ক্রিয়াশীল যা মানুষের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে আর মানুষকে উৎসাহ প্রদান করে। আল্লাহ চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর ঘুমও আসেনা এবং তন্দ্রাও ধরেনা। বান্দাহর কোন আমলই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। তিনি তাঁর বান্দাদের পুরস্কার কখনো নষ্ট করেন না। তিনি পরিশ্রমের অনেক গুণ বেশী পুরস্কার দেন। আর কাউকে বঞ্চিতও করেন না।

নবীগণ তাঁদের জাতিকে বলতেন, "আমি তোমাদের নিকট কোন পুরস্কার বা প্রতিদান আশা করি না, আমার পুরস্কার তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে।"

৭ ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখা দরকার যে, আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র দীন, এ দীনকে ছেড়ে ইবাদতের যে কোন নিয়ম-পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন আল্লাহর নিকট কোন মর্যাদা ও মূল্য হবে না। আল্লাহর নিকট তার তো ঐ দীনই গ্রহণীয় যা কুরআনে আছে। যার আমলী ব্যাখ্যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের বরকতময় জিন্দেগী দ্বারা পেশ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আছে-

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

(হে রাসূল!) "আপনি বলে দিন যে, ইহা আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ দূরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আর আল্লাহ প্রত্যেক দোষ থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(সূরায়ে ইউসুফ-১০৮)

আল্লাহপাক আরো পরিষ্কার করে বলেছেন -

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ۔ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ۔ (ال عمران- ٥٨)

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দীনের অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(সূরা আলে ইমরান-৮৫)

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই মনোনীত একমাত্র দীন।"

৮. নিজের এ উদ্দেশ্যের মহত্ব আর গুরুত্বকে সর্বদা স্মরণ রাখবে এবং এও লক্ষ্য রাখবে যে, উহা মহান কাজ, যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী প্রেরিত হয়েছেন। আর বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহ দীনের যে দৌলত ব নিয়ামত দান করেছেন তা ইহকাল ও পরকালের উন্নতির মূলধন।

পবিত্র কুরআনে আছে-

"আমি আপনাকে সাতটি পুনরাবৃত্তির আয়াত এবং মহত্বের অধিকারী কুরআন দান করেছি। সুতরাং আপনি ধ্বংসশীল জাগতিক সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পূর্বেই দিয়ে রেখেছি।"

আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে -

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ (المائده)

"হে আহলে কিতাব, তোমরা কিছুই নও যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তৌরাত ইঞ্জীল আর অন্যান্য কিতাবকে প্রতিষ্ঠিত করো যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।"

৯. দীনের সঠিক বুঝ অর্জন আর দীনের রহস্যসমূহ বুঝার চেষ্টা করতে থাকবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ পাক যাকে কিছু দান করতে ইচ্ছে পোষণ করেন তাকে নিজের দীনের সঠিক বুঝ দান করেন"। *(বুখারী ,মুসলিম)*

১০. কেউ যদি দুনিয়ার সামনে কিছু পেশ করতে চায় তাহলে প্রথমে নিজেকেই করবে। অপরকে শিক্ষা দিবার আগে নিজেকেই শিক্ষা দেবে। অন্যের কাছ থেকে যা চাইবে তা আগে নিজে করে দেখাবে। সত্য দীনের আহ্বানকারীর পরিচয় হলো সে তার সঠিক আদর্শ পেশ করবে। সে যা কিছু বলে, তা নিজের আমল ও কর্মকে তার সাক্ষী করে রাখে। যে সকল সত্য গ্রহণে সে নিজেকে দুনিয়ায় সৌভাগ্যবান মনে করে সে নিজেকে উহার সর্বাধিক যোগ্য করে নেবে। নবীগণ যখনই জাতির সামনে দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তখনই ঘোষণা করেছেন, আমিই প্রথম মুসলিম।

মুখ ও কলমের সাহায্যে সাক্ষ্য দেবে যে, সত্য তাই, যা সে পেশ করেছে আর নিজের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক কাজ কারবার আর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় চেষ্টা তদবীর দ্বারাও প্রমাণ করবে যে, সত্য দীনকে গ্রহণ করেই পবিত্র চরিত্র সৃষ্টি হয়, আদর্শ পরিবার ও উত্তম সমাজ গঠিত হয়।

আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় হলো যে অন্যকে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজে আমল করে না আর এমন কথা বলে যা সে নিজেই করে না। রাসূল (সাঃ)এরূপ বে-আমলকারীদেরকে ভয়ানক আযাবের ভয় দেখিয়েছেন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আগুনে ফেলে দেয়া হবে এবং ঐ আগুনের উত্তাপে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এভাবে ঘুরবে যেমন গাধা তার চাক্কিতে ঘোরে। এসব দেখে অন্যান্য জাহান্নামী তার নিকট একত্রিত হবে আর জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার কি অবস্থা? তুমি কি দুনিয়ায় আমাদেরকে নেক কাজের শিক্ষা দিতে না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে না? এরূপ নেক কাজ করা সত্বেও তুমি কিভাবে এখানে আসলে। তখন বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের শিক্ষা দিতাম, কিন্তু নিজে কখনো সৎ কাজের নিকটেও যেতাম না। তোমাদেরকে তো অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতাম কিন্তু আমিই অসৎ কাজ করতাম। *(মুসলিম, বুখারী)*

মেরাজের রাতের যে উপদেশমূলক দৃশ্য রাসূল (সাঃ) মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তার এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে খারাপ লোকদের সতর্ক করে দেয়া এবং তারা যেন নিজেদের অবস্থার সংশোধনের চিন্তা ও চেষ্টা করে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "আমি মেরাজের রাতে কিছু লোককে দেখতে পেলাম যে, আগুনের কাঁচি দ্বারা তাদের ঠোঁট কর্তন করা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোন লোক? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তা, এরা অন্যদেরকে সৎকাজ ও পরহেজগারীর কথা শিক্ষা দিত অথচ নিজেরা তা করতো না।" *(মেশকাত)*

একদা এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-কে বলল, হযরত, আমি আশা করি যে, লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবো, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবো এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবো। তিনি বললেন, তুমি কি মুবাল্লিগ হওয়ার স্তরে পৌছাতে পেরেছো? সে বলল, হ্যাঁ, আশা আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমার যদি এ আশঙ্কা না হয় যে, পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত তোমাকে অপদস্ত করবে, তা হলে তুমি দীনের তাবলীগের কাজ করো। সে ব্যক্তি বলল, হযরত, আয়াত তিনটি কি? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ

প্রথম আয়াত এই-

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ـ (البقرة ٤٤)

"তোমরা কি লোকদের সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছ আর তোমরা নিজেদের কথা ভুলে যাচ্ছ? *(সূরায়ে আল-বাক্বারাহ-৪৪)*

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের উপর কি তোমার পূর্ণ আমল আছে? সে বলল, না।

দ্বিতীয় আয়াত এই ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ـ (الصف ٢)

তোমরা যা কর না তা বলো কেন ? *(সূরায়ে ছফ-২)*

তুমি এ আয়াতের উপর পূর্ণ আমল করেছ? সে বললো, না।

তৃতীয় আয়াত এই-

مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ ـ(هود ٨٨)

হযরত শোয়াইব (আঃ) নিজের জাতির লোকদের বললেন-

"যে সব অসৎ কাজ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তা আমি করব, সে ইচ্ছা আমি করিনা। "বরং আমি সে সব থেকে দূরে থাকবো।"
(সূরায়ে হুদ-৮৮)

বলো, তুমি কি এ আয়াতের উপর পূর্ণ আমল করতে পেরেছো? সে বলল, না। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন যাও, প্রথমে নিজেকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ।

১১. নামায তার পূর্ণ নিয়ম-পদ্ধতি এবং শর্তসমূহসহ গুরুত্বের সাথে আদায় করবে। নফল নামাযসমূহেরও গুরুত্ব প্রদান করবে। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্ভব নয়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উপায় হলো একমাত্র নামায, যা স্বয়ং আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাহদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন -

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ـ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ـ نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ـ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ـ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ـ (المزمل ١-٥)

"হে চাদর আচ্ছাদনকারী! রাতে কিয়াম করুন, কিন্তু কিছু কিছু রাত, অর্ধেক অথবা তার চেয়ে কিছু কম অথবা কিছু বেশী, কুরআনকে ধীরে ধীরে বিন্যস্তভাবে পড়ুন। আমি নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বেই আপনার উপর একটি গুরুদায়িত্বের ভারী নির্দেশ প্রেরণ করবো।" *(সূরায়ে মুযযামমিলঃ ১-৫)*

গুরুদায়িত্বের ভারী নির্দেশের দ্বারা "সত্য দীনের তাবলীগ" বুঝান হয়েছে। এ দায়িত্ব দুনিয়ার সকল দায়িত্ব থেকেও অধিক ভারী ও কঠিন। এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ঐ ব্যক্তির, যে নামাযের দ্বারা শক্তি অর্জন করবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করবে।

১২. পবিত্র কুরআনের সাথে গভীর মহব্বত সৃষ্টি করবে এবং নিয়মানুবর্তীতার সাথে তা তেলাওয়াত করবে। নামাযে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তেলাওয়াত করবে আর নামাযের বাইরেও উৎসাহের সাথে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করবে। মনোযোগের সাথে যে তেলাওয়াত করা হয় তা দ্বারা কুরআন উপলব্ধি করা সহজ হয় এবং আগ্রহ ও আকাঙ্খাও বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআন হেদায়েত ও উপদেশের একমাত্র উৎস এবং ইহা এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, তার আয়াতের গবেষণা করা হবে আর তার উপদেশ ও নছীহত দ্বারা উপকার গ্রহণ করা যাবে। ধ্যান ও চিন্তার অভ্যাস করতে হবে আর এ সংকল্পের সাথে তেলাওয়াত করতে হবে এবং এরই পথ নির্দেশনায় নিজের জীবন গঠন ও নির্দেশ মুতাবিক সমাজের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। আল্লাহর দীনকে এ লোকেরাই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে যারা নিজেদের চিন্তা গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পবিত্র কুরআনকে নির্ধারিত করবে। এর থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজেও দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয় এবং দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অংশ গ্রহণেরও কোন অবকাশ নেই।

কুরআন তেলাওয়াতকারীদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে এভাবে–

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ (ص ٢٩)

এ কিতাব, যা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি তা সম্পূর্ণই বরকতময়, যেন তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে আর যেন জ্ঞানীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।" *(সূরা সোয়াদ–২৯)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

"অন্তরে মরিচা ধরে যায় যেমন পানি পড়ার কারণে লোহায় মরিচা ধরে যায়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তরের মরিচা দূর করার উপায় কি? তিনি বললেন, অন্তরের মরিচা এভাবে দূর হয়, প্রথমতঃ মানুষ মৃত্যুকে স্মরণ করে আর দ্বিতীয়ত কুরআন তেলাওয়াত করে।" *(মেশকাত)*

১৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করবে। শোকরের আবেগ সৃষ্টির জন্য এই সকল লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখবে যারা পার্থিব পদ-মর্যাদায় এবং ধন সম্পদে তার থেকে নিম্নতম। *রাসূল (সাঃ) বলেছেন-*

"ঐ সকল লোকের দিকে দেখ যারা তোমার চেয়ে ধন-সম্পদ এবং পদমর্যদায় কম। তা হলে তোমার মধ্যে শোকরের আবেগ সৃষ্টি হবে।

কখনো এমন ব্যক্তিদের দিকে দেখনা যারা ধন-সম্পদে ও পার্থিব সাজ সরঞ্জামে তোমার চেয়ে বেশী। যেন এ সময় তুমি যেসব নেয়ামত পেয়েছ তা তোমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ না হয়।"

১৪. বাহুল্য সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবে। এমন সৈনিকরূপে নিজেকে গঠন করবে যে সব সময় ডিউটিতে রত থাকে এবং কোন সময়ই হাতিয়ার রেখে দেবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

"আমি সুখ ও সমৃদ্ধির জীবন কিভাবে যাপন করব? ইসরাফীল (আঃ) সিঙ্গা মুখে নিয়ে, কান খাড়া করে, মাথা নত করে অপেক্ষা করছেন যে, কখন সিঙ্গায় ফুঁ দেবার আদেশ হবে।"

পবিত্র কুরআনে মুমিনগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ

—16

ط اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ج وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ ـ (الانفال)

"তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াগুলোকে তাদের মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখো যেন তার দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু আর ঐ সকল শত্রুকে ভীত করে তুলতে পারে, যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান অবশ্যই তোমরা পাবে, তোমরা অত্যাচারিত হবে না, অর্থাৎ তোমাদের প্রতিদানে কোন প্রকারের হেরফের করা হবে না।" *(আল আনফাল-৬০)*

১৫. দীনের জন্য সকল রকম কুরবানী দিতে এবং প্রয়োজনবোধে নিজের মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতেও নিজেকে (মানসিকভাবে) পুরোপুরি প্রস্তুত রাখবে আর নিজেকে পরিমাপ করতে থাকবে যে, তোমার মধ্যে এ আবেগ কতটুকু শক্তিশালী হয়েছে?

পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হিজরতের ঘটনা বর্ণনাক্রমে হিজরতের উৎসাহ এবং কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে -

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ ط اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ـ يَاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ـ يَاَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ـ يَاَبَتِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ـ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يَا اِبْرَاهِيْمُ ـ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ـ قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ ـ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ـ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ـ عَسٰى اَلاَّ اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ـ (مريم ٤١-٤٨)

"এ কিতাবে ইব্রাহিম (আঃ)-এর কাহিনী থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহে তুমি একজন সত্য নবী ছিলে। লোকদেরকে ঐ সময়ের কাথাবার্তা শুনাও যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, পিতা, আপনি এই সব বস্তুর ইবাদত কেন করছেন যারা শুনেনা ও দেখে না এবং আপনার কোন কাজেও আসতে পারেনা? আমার নিকট ঐ জ্ঞান এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি, আপনি আমার কথামত চলুন আমি আপনাকে সোজা পথে চালাবো। হে পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না, শয়তান তো আল্লাহর বড় নাফরমান। আমার পিতা! আমি ভয় করি যে, আপনি যদি এভাবে চলেন তাহলে আল্লাহর আযাব আপনাকে ঘিরে ধরবে আর আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে থাকবেন।

পিতা বললো, ইব্রাহিম! তুমি কি আমাদের উপাস্যসমূহ থেকে ফিরে গিয়েছ? যদি ফিরে না আস তা হলে আমি তোমাকে পাথর মেরে মেরে শেষ করে ফেলবো। যাও, চিরকালের জন্য আমার থেকে দূর হয়ে যাও। ইব্রাহিম (আঃ) বললেন, আপনাকে আমার সালাম এবং আমি আমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করবো যে, তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক আমার উপর বড় দয়াবান। আপনাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি এবং ঐ সকল অস্তিত্ব থেকেও যাদেরকে আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকছেন, আমিতো অবশ্যই আমার প্রতিপালককেই ডাকবো। আমি আশা রাখি যে, আমি আমার প্রতিপালককে ডেকে কখনো অকৃতকার্য হবো না।" (সূরা মরিয়ম ঃ ৪১-৪৮)

১৬. আল্লাহর পথে বের হবার আশা, প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার আবেগ এবং তার পথে শহীদ হবার আকাংখা সৃষ্টি করবে। জিহাদ হলো ঈমানের পরিমাপ আর যে অন্তরে তার আকাংখা হবে না সে ঈমান ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত, এক অন্ধকারময় এবং বিরান মরুভূমি। জেহাদের ময়দানে পৌঁছার এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানীর সুযোগ পাওয়া বড়ই সৌভাগ্য কিন্তু অবস্থা যদি এমন না হয় যে, জিহাদের উপায় ও উপকরণ না থাকে এবং তুমি জেহাদের ময়দানে পৌছে ঈমানের নৈপুণ্য দেখাতে পারো তবুও তোমার গণনা হিসেবে আল্লাহর নিকট ঐ সকল মোজাহিদের সাথে হতে পারে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে অথবা গাজী হয়ে ফিরে এসেছে, কিন্তু শর্ত হলো যে তোমার অন্তরে

আল্লাহর পথে বের হবার প্রচন্ড আগ্রহ থাকতে হবে, দীনের পথে কুরবান হবার আবেগ থাকতে হবে আর শাহাদাতে.. আকাঙ্খা থাকতে হবে। কেননা আল্লাহর দৃষ্টি ঐ সকল ব্যক্তির উপরই হয় যারা মুজাহিদসুলভ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মানুষকে অস্থির করে দেয়।

রাসূল (সাঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তাঁর সাথীদেরকে বলেছিলেন-

"মদীনায় এমন কিছু লোক আছে, তোমরা যে যাত্রা করেছো এবং যে মাঠ প্রান্তর অতিক্রম করেছ তারা তোমাদের সাথে ছিল। রাসূল (সাঃ)এর সাথীগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মদীনায় থেকেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মদীনায় থেকেই, কেননা তাদেরকে থামিয়ে রেখেছিল অপরাগতা কিন্তু তারা নিজেরা থেমে থাকার লোক ছিল না।"

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ এমন লোকদের প্রশংসা করেছেন যারা আবেগ থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে এবং নিজেদের এ বঞ্চনার কারণে তাদের চক্ষু যুগল অশ্রু প্রবাহিত করতে থাকে।

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ - تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ - (التوبه ٩٢)

"ঐ সকল সরঞ্জামবিহীন লোকদের ওপর অভিযোগ আছে যারা নিজেরা আপনার নিকট এসেছে যে, আপনি তাদের জন্য সওয়ারির ব্যবস্থা করে দেন এবং আপনি যখন বলেছেন যে, আমি তোমাদের সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারবো না। তখন তারা এ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলো যে তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, এ দুঃখে যে, তাদের নিকট জিহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য খরচ করার সামর্থ নেই।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ না করে মৃত্যুবরণ করলো আর তার অন্তরে তার কোন আকাংখাও ছিল না তা হলে সে মুনাফিকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।" *(মুসলিম)*

মূলকথা এই যে আল্লাহর পথে লড়াই করা আর জান ও মালের কুরবান পেশ করার আবেগ থেকে যে অন্তর খালি তা কখনোই মুমিনের অন্তর হতে পারে না।

দাওয়াত ও তাবলীগের আদবসমূহ

(১) দাওয়াত ও তাবলীগের রীতিনীতির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখ এবং এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন কর যা প্রত্যেক দিক থেকে গাম্ভীর্যপূর্ণ, উদ্দেশ্যের সমতাপূর্ণ এবং সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে আগ্রহ ও উদ্যম সৃষ্টিকারী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ۔ (النحل)

"তোমার প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দাও হেকমতের সাথে এবং উত্তম উপদেশের সাথে আলোচনা করো এমন নীতির উপর যা অত্যন্ত ভাল।"

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকে তিনটি মৌলিক উপদেশ পাওয়া যায়

(ক) দাওয়াত হেকমতের সাথে দিতে হবে।

(খ) উপদেশ ও শিক্ষা উত্তম নিয়মে দিতে হবে।

(গ) আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক উত্তম পদ্ধতিতে করতে হবে।

❑ হেকমতের সাথে দাওয়াত পেশ করার অর্থ হলো এই যে, নিজের দাওয়াতের পবিত্রতা এবং মহত্বের পুরোপুরি অনুভূতি থাকতে হবে আর এ মূল্যবান সম্পদকে মূর্খতাবশতঃ এমনিতেই যেখানে-সেখানে ছড়াবে না বরং সুযোগ ও স্থানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখবে, আর সম্বোধিত ব্যক্তিরও প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক ব্যক্তি বা দল থেকে তার চিন্তার গভীরতা, ক্ষমতার উপযুক্ততা, মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী কথা বলবে।

❑ উত্তম উপদেশ দানের অর্থ হচ্ছে এই যে, হিতাকাংখী এবং অকৃত্রিমতার সাথে দাওয়াত পেশ করবে যেন মানুষ আগ্রহের সাথে তার দাওয়াত কবুল করে। দীনের প্রতি তার সম্পর্ক যেন শুধু মানসিক শান্তির সীমারেখা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকে বরং দীন তার অন্তরের আওয়াজ, আত্মার খোরাক হয়ে যায়।

* সমালোচনা ও আলোচনায় বা তর্ক-বিতর্কে উত্তম নীতি অবলম্বনের অর্থ–এই যে, সমালোচনা গঠনমূলক, হৃদয়োত্তাপ এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হবে, আর পদ্ধতি এরূপ চিত্তাকর্ষক সাদাসিধে হবে যে, সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে একগুঁয়েমী, ঘৃণা, হঠকারিতা, গোঁড়ামী, অজ্ঞতা এবং মর্যাদাবোধের আবেগে উদ্বেলিত না হয়ে বরং সত্যি সত্যি কিছু চিন্তা করার ও বুঝার উপর গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়, তার মধ্যে সত্য অন্বেষণের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয় এবং যেখানে এ সকল অবস্থা সৃষ্টি না হয়, সেখানে মুখ বন্ধ রাখে এবং মজলিস থেকে উঠে চলে যায়।

২. সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণ দীনের দাওয়াত দেবে ও নিজের বুদ্ধিতে এর মধ্যে কাট-ছাট করবে না। ইসলামের দাওয়াত যে দেবে তার অধিকার নেই সুবিধামত তার কিছু অংশ পেশ করবে আর কিছু অংশ গোপন রাখবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

"যখন তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয়, তখন সেই সকল লোক আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে এ কুরআনের পরিবর্তে অন্য কোন কুরআন আনুন। নতুবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করে দিন। আপনি বলুন যে, আমি আমার পক্ষ থেকে এতে কমবেশী করতে পারিনা। আমি তো ঐ অহীর অনুসরণকারী, যা আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে। আমি যদি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি তা হলে আমার জন্য এক মহান দিনের ভয়ানক আযাবের ভয় আছে। আর বলুন! আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করতেন যে, আমি তোমাদেরকে এ কুরআন শুনাব, তা হলে আমি কখনো শুনাতে পারতাম না। তোমাদেরকে উহা জ্ঞাত করাতেও পারতামনা। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের এক বিরাট অংশ কাটিয়েছি, এর পরেও কি তোমরা বুঝনা যে নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বানিয়ে আল্লাহর দিকে মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করবে অথবা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, নিশ্চিত অপরাধী ব্যক্তিরা সফলকাম হবে না।" *(সূরায়ে ইউনুস ঃ ১৫-১৭)*

অবস্থা যতই অনুপযোগী হোক না কেন দাওয়াতদাতার কাজ সর্বাবস্থায় এমনই হবে যে, সে দীনকে তার মৌলিক এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় পেশ করবে, আল্লাহর দীনে কমবেশী এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের বুদ্ধিমত এতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা বড়ই অন্যায়। এ ধরনের লোকদের দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতেই ধ্বংস অনিবার্য। ইসলাম, সে আল্লাহর

প্রেরিত দীন, যার জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ঘিরে রেখেছে, যিনি আদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত জ্ঞান রাখেন। যার দৃষ্টির কেন্দ্র ভুল থেকে নিশ্চিতরূপে পবিত্র, যিনি মানবিক জীবনের শুরু থেকে জ্ঞাত এবং পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞাত, যার ইচ্ছার অধীনেই মানবিক জ্ঞানের মধ্যে দৈনন্দিন আশ্চর্যজনক প্রশস্ততা সৃষ্টি হচ্ছে আর মানবিক জীবনে অসাধারণ উন্নতিসমূহ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। অন্য কারো জন্যে কমবেশী করার কি অবকাশ আছে? স্বয়ং প্রথম দাওয়াতকারীর [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর] অবস্থা যখন এরকম বলা হয়েছে যে তিনি একজন উদাহরণযোগ্য অনুসরণকারীর মত এ দীনের অনুসরণ করছেন আর নাফরমানীর কল্পনা থেকেও বিরত থাকেন।

৩. দীনকে হেকমতের সাথে স্বাভাবিক নিয়মে পেশ করবে যে, তা অস্বাভাবিক বোঝা অনুভব না হয়। মানুষ ভয়ে চমকে যাওয়া এবং বিষণ্ন হওয়ার স্থলে তাকে কবুল করার শান্তি এবং সুখ অনুভব করে, নম্রতা, মিষ্টি ভাষা এবং হেকমতপূর্ণ দাওয়াতের পদ্ধতি দ্বারা মানুষ দীনের মধ্যে অসাধারণ আকর্ষণ অনুভব করে।

হযরত মুআবিয়া বিন হাকাম (রাঃ) বলেছেন, একবার আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে নামাজ পড়ছিলাম, এক ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলাম। লোকেরা আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদের ভাল করবে। তোমরা আমার দিকে এতো মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছ কেন? তখন লোকেরা আমাকে চুপ থাকার ইশারা করলো। আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূল (সাঃ) যখন নামাজ থেকে অবসর হলেন–তিনি আমাকে ধমক দেননি এমনকি আক্রমণাত্মক কথা বলেননি। শুধু এ কথা বলেছেন, "দেখ! ইহা নামায! নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামায হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা করার নাম।"

৪. নিজের লেখা বক্তৃতা এবং দাওয়াতী আলোচনাসমূহে সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে এবং শ্রোতাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। শুধু ভয়ের উপর এরূপ অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করবে না যেন সে আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে নিজের সংশোধন ও মুক্তি শুধু কঠিনই নয় এমনকি অসম্ভব মনে করে। আল্লাহর রহমত এবং ক্ষমার এরূপ ধারণা প্রদান করবে না যে, সে একেবারেই নির্ভীক এবং দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত ও ক্ষমার আশায় নাফরমানী করতে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন- উত্তম আলেম সে ব্যক্তি যে লোকদেরকে আল্লাহ থেকে মানুষকে নিরাশ করে দেয় না এবং আল্লাহর নাফরমানী করার অনুমতিও দেয় না এবং আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে নির্ভীক করে দেয়না।

৫. দাওয়াতী কাজের ধারা অব্যাহত রাখবে আর যে প্রোগ্রামই তৈরী করবে তা দায়িত্বের সাথে সর্বদা চালু রাখার চেষ্টা করবে। কাজ অসমাপ্ত রেখে দেয়া আর নূতন নূতন কর্মসূচী তৈরী করা ফলদায়ক নয়। কাজ অল্প হোক কিন্তু সব সময় করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

" তা উত্তম আমল যা সব সময় করা হয়। তা যতই অল্প হোক না কেন।"

৬. দাওয়াত ও তাবলীগের পথে সৃষ্ট জটিলতা, কষ্ট ও পরীক্ষাসমূহকে হাসিমুখে বরণ করে নেবে এবং ধৈর্য্য ও সহনশীলতা দেখাবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ـ (لقمن ٧١)

"সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাক এবং এপথে যত বিপদই আসুক না কেন তা ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করে যাও।"
(সূরায়ে *লোকমান-১৭)*

সত্যের পথে বিপদ ও জটিলতা জরুরী, পরীক্ষার স্তরগুলো অতিক্রম করেই শক্তি আসে এবং চরিত্র ও কর্মে পরিপক্কতা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর ঐ সকল বান্দাহকে অবশ্যই পরীক্ষা করেন যারা ঈমানের দাবী করে এবং যে ঈমানের দিক থেকে যত পরিপক্ক তার পরীক্ষাও তত কঠিন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন -

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়-ভীতি, ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব এবং ধৈর্যশীলদেরকে সু-সংবাদ দাও, যাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়লে তারা বলে, আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। তাদেরকে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান দেয়া হবে আর তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। *(সূরায়ে বাকারা ১৫৫-১৫৭)*

হযরত সাআদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ !কোন ব্যক্তির সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষা নেওয়া হবে? তিনি বললেন, নবীগণের, আর যারা দীন ও ঈমানের মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের নিকটবর্তী। তারপর দীনের কাজে যে যত পরিপক্ক তার পরীক্ষাও তত কঠিন হবে। যে দীনের কাজে দুর্বল তার পরীক্ষাও হাল্কা ধরনের হবে। আর এ পরীক্ষাও হতেই থাকে, এমন কি সে দুনিয়াতে এমতাবস্থায় চলাফেরা করে যে, তার উপর গুনাহের কোন চিহ্নও থাকে না। *(মেশকাত)*

রাসূল (সাঃ) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- আমাকে এত বেশী নির্যাতন করা হয়েছে যে, আগে কখনো কোন ব্যক্তিকে এত বেশী নির্যাতন করা হয়নি। আর আমাকে আল্লাহর পথে এতবেশী ভয় দেখানো হয়েছে যে, আর কখনো কাউকে এত বেশী ভয় দেখানো হয়নি। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার এবং বেলালের খাবার জন্য বেলালের বগলের নিচে (পুটলীতে) যা ছিল তা ছাড়া এমন কোন বস্তু ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। *(তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণ করার তওফীকও দান করবেন।" *(বুখারী ,মুসলিম)*

মূলতঃ পরীক্ষাসমূহ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা ও অগ্রসর করার অপরিহার্য উপকরণ। পরীক্ষা অতিক্রম করা ছাড়া কখনো কোন আন্দোলন সফলকাম হতে পারেনি। বিশেষতঃ যে আন্দোলন মানসিক জগতে এক সার্বজনীন বিপ্লবের দাওয়াত এবং পূর্ণ মানবিক জীবনকে নূতন ভিত্তির উপর গঠন করার পরিকল্পনা রাখে।

যে যুগে মক্কার পাষাণ, হৃদয়হীন ব্যক্তিরা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাথীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল সে যুগের একটি ঘটনা হযরত খোবায়েব বিন আরত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-

রাসূল (সাঃ) বাইতুল্লাহর ছায়ায় মাথার নিচে চাদর রেখে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁর নিকট অভিযোগ নিয়ে পৌছলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না? আপনি কি এ অত্যাচার শেষ হওয়ার জন্য দোআ করেন না? এ ধারা কতদিন পর্যন্ত বিলম্বিত হবে আর কখন এ বিপদের পালা শেষ হবে?

শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "তোমাদের পূর্বে এমন লোক গত হয়েছে যাদের মধ্য থেকে কারো জন্যে গর্ত খনন করা হতো, তারপর ঐ গর্তে তাকে দাঁড় করানো হতো, অতঃপর করাত এনে চিরা হতো, এমনকি তার শরীরকে চিরে দু' টুকরাও করা হত। তারপরও সে নিজের দীন থেকে বিচ্যুত হতো না। তার শরীরে লোহার চিরুনী দ্বারা আচড়ানো হতো যা গোশত অতিক্রম করে হাড্ডি-মগজ পর্যন্ত গিয়েও পৌছতো, কিন্তু সে আল্লাহর সত্য দীন থেকে বিচ্যুত হতো না। আল্লাহর শপথ! এ দীন বিজয়ী হবেই এমনকি আরোহী "ইয়ামানের রাজধানী) ছানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে কিন্তু পথিমধ্যে শুধু আল্লাহর ভয় ব্যতীত আর কোন ভয় থাকবে না। অবশ্য রাখালদের ভয় থাকবে যে কোথাও বাঘে বকরী নিয়ে যায় কিনা। কিন্তু আফ্‌সোস যে তোমরা বেশি তাড়াতাড়ি করছ।" *(বুখারী)*

যরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে যারা কেবল আল্লাহর দীনের হেফাজত করতে থাকবে। যারা তাদের সহযোগিতা করবে না বরং তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদেরকে ধ্বংসও করতে পারবে না। এমনকি যে আল্লাহর ফয়সালা অর্থাৎ কিয়ামত এসে যাবে আর এ দীনের অনুসারী ঐ অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৭. অপাত্রে উদারতা, খোশামোদ-তোষামোদ বলা থেকে অবশ্যই .বিরত থাকবে। পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রশংসায় বলা হয়েছে, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ "তারা কাফিরদের উপর কঠোর।"

অর্থাৎ তারা নিজেদের দীন এবং দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিক কঠোর তারা তাদের দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে কোন অবস্থাতেই আপোষ এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। তারা সব কিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু দীন ও দীনের মূলনীতির কুরবানী দিতে পারে না।

মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে হেদায়েত করেছেন ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ـ

(الشورى ١٥)

"অতঃপর আপনি দীনের দিকে দাওয়াত দিন আর আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে স্থির থাকবেন আর তাদের কামনার অনুসারী হবেন না।" *(সূরায়ে শূরা–১৫)*

দীনের ব্যাপারে খোশামোদ-তোষামোদ, অপাত্রে উদারতা এবং বাতিলের সাথে আপোষ মারাত্মক দুর্বলতা যা দীন ও ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

"বনী ঈসরাইলীরা যখন আল্লাহর নাফরমানীর কাজ শুরু করলো তখন তাদের আলেমগণ তাদেরকে বাধা দিল কিন্তু তারা বিরত হলোনা। তখনও তাদের আলেমগণ তাদের কাছে থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করার পরিবর্তে তাদের মজলিসে বসা আরম্ভ করলো এবং তাদের সাথে খানাপিনাও করতে লাগলো। যখন এরূপ অবস্থা ধারণ করলো তখন আল্লাহ্ তাদের সকলের অন্তরকে এক করে মিলিয়ে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) ইবনে মরিয়মের ভাষায় তাদেরকে লা'নত (অভিসম্পাত) করলেন। কেননা, তারা নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে এবং তা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হচ্ছিল।"

এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, এতটুকু বলার পর সোজা হয়ে বসলেন। অতঃপর বললেন, না ঐ সত্তার শপথ! আমার প্রাণ যার হাতের মুঠোয়, তোমরা লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতে থাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাকবে। যালিমের অত্যাচারে বাধা দেবে এবং যালিমকে সত্যের সামনে নত করাবে। তোমরা যদি এরূপ না করো তা হলে তোমাদের সকলের অন্তরও ঐরূপ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেদায়েত ও রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেবেন যেমন তিনি বনী ইসরাইলকে হেদায়েত ও রহমত থেকে বঞ্চিত করেছেন।

৮. শিশুদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানোর জন্য গঠন করা হলো প্রাথমিক কর্তব্য। এ ছাড়া তাবলীগী ও সংশোধনী চেষ্টার জন্য বাইরের ক্ষেত্র খোঁজ করা শিশুদের প্রকৃতি বিরোধীপূর্ণ কাজ। উদাহরণ এরূপ যে, দুর্ভিক্ষাবস্থায় বান্দা তার পরিবারস্থ লোকদেরকে দুর্বল ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে বাইরের অভাবী লোকদেরকে তালাশ করে করে খাদ্য বন্টন করার বদান্যতার প্রদর্শনী করছে। যেমন তার ক্ষুধা-পিপাসা, নৈকট্য এবং ভালবাসার অনুভূতি নেই তেমনি তার মস্তিষ্ক-বিবেক খাদ্য শস্য বন্টনের বিজ্ঞানসম্মত নীতি-পদ্ধতি থেকে চরম অজ্ঞ।

পবিত্র কুরআনে মুমিনদেরকে হেদায়েত করা হয়েছে -

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ـ

"মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবারস্থ লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

রাসূল (সাঃ)-এর ভাষায়-

"তোমরা প্রত্যেকেই পাহারাদার ও দায়িত্বশীল, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের নিকট থেকেই ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যারা তোমাদের অধীনস্থ । যেমন শাসক একজন পাহারাদার, তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, স্বামী তার পরিবারস্থ লোকদের পাহারাদার, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও তার বাচ্চাদের পাহারাদার, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যাদেরকে তার দায়িত্বে দেয়া হয়েছিল।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৯. প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীদের সংশোধন ও শিক্ষার প্রতিও খেয়াল করবে এবং তাকেও নিজের কর্তব্য বলে মনে করবে।

একদিন রাসূল (সাঃ) কিছু মুসলমানের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন ঃ "এমন কেন হচ্ছে যে, লোকেরা তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে দীনের জ্ঞান সৃষ্টি করছেনা? তাদেরকে দীন শিক্ষা দিচ্ছেনা এবং দীনী শিক্ষা থেকে দূরের প্রতিফলের কথা কেন অবহিত করছে না? আল্লাহর শপথ! মানুষেরা অবশ্যই নিজ নিজ প্রতিবেশীদেরকে দীনের শিক্ষা দান করবে। তাদের মাঝে দীনের বুঝ ও জ্ঞান সৃষ্টি করবে, তাদেরকে উপদেশ দেবে, তাদেরকে সৎ কাজ শিক্ষা দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, অন্যদেরও নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে দীন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক, দীনের বুঝ সৃষ্টি করবে, এবং তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে নতুবা আমি তাদেরকে অতিসত্বর শাস্তি দেবো।" অতঃপর তিনি ভাষণ শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে আসলেন।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এরা কোন লোক যাদের বিরুদ্ধে রাসূল (সাঃ) ভাষণ দিয়েছেন? জনৈক ব্যক্তি বলল যে,

তাঁর কথার ইঙ্গিত ছিল আশআর গোত্রের লোকদের দিকে, এ সকল লোকেরা দীন সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ছিল আর তাদের প্রতিবেশীরা হলো ঝর্ণার উপকূলে বসবাসকারী গ্রাম্য গণ্ডমূর্খ লোক।

এ সংবাদ যখন আশআর গোত্রের লোকদের নিকট পৌছল তখন তারা রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার ভাষণে কিছু লোকের প্রশংসা করেছেন এবং আমাদের উপর রাগ করেছেন, তবে বলুন, আমাদের কি অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন, মানুষের কর্তব্য হলো যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দেবে, তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করবে, সৎ কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, অনুরূপ লোকদেরও কর্তব্য যে, তারা তাদের প্রতিবেশীর নিকট থেকে দীনী জ্ঞান অর্জন করবে এবং তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে। আর নিজেদের মধ্যে দীনের বুঝ সৃষ্টি করবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দেবো। এ কথা শুনে আশআর গোত্রের লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি অন্যদের মধ্যে দীনের বুঝ সৃষ্টির চেষ্টা করব? তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, এটা তোমাদের দায়িত্ব।" তখন তারা বললো, হুযুর! আমাদেরকে এক বছর সময় দিন! সুতরাং হুযুর (সাঃ) তাদেরকে এক বছর সময় দিলেন যার মধ্যে তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দীনী শিক্ষাদান করবে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) পবিত্র কুরআন থেকে এ আয়াত পাঠ করলেন-

"বনী ইসরাইলের উপর দাউদ (আঃ) এবং ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ)-এর ভাষায় অভিসম্পাত করা হয়েছে, তা এজন্য যে, তারা নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে আর তারা সীমালংঘন করছিল। তারা পরস্পরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতো না। সুতরাং নিঃসন্দেহে তারা অত্যন্ত খারাপ কাজ করতো।" *(সূরায়ে মায়েদাহ)*

১০. যে সকল লোকের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবে তাদের গোত্রীয় আকীদা-বিশ্বাস এবং আবেগের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবে। তাদের মহান ব্যক্তিদের এবং নেতাদেরকে খারাপ নামে ডাকবে না, তাদের আকীদা-বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করবে না আর তাদের মাযহাবী দর্শনের ঘৃণা করবে না। ইতিবাচক পদ্ধতিতে নিজের দাওয়াত পেশ করবে আর সমালোচনার ক্ষেত্রেও সম্বোধিত ব্যক্তিদেরকে উত্তেজিত করার

পরিবর্তে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের অন্তরে নিজের কথা পেশ করবে। কেননা, আবেগময় সমালোচনা ও ঘৃণ্য কথাবার্তা দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে কোন ভাল পরিবর্তনের আশা করা যায় না। অবশ্য আশংকা থাকে যে মূর্খতাজনিত একগুঁয়েমি ও গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে আল্লাহ এবং দীন সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা আরম্ভ করবে আর দীনের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দীন থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।

পবিত্র কুরআনে হেদায়েত করা হয়েছে -

"(মুমিনগণ!) এরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে, তাদেরকে গালি দিও না। এমন হতে পারে তারাও অজ্ঞতাবশতঃ শত্রুতা করে আল্লাহকে গালি দেবে।"

১১. দায়ী' ইলাল্লাহু হিসেবে তৈরী হয়ে দাওয়াতের কাজ করবে। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারীই হবে। আল্লাহর বান্দাহদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে কখনো আহবান করবে না। মাতৃভূমির দিকে, না জাতি ও গোত্রের দিকে, না কোন ভাষার দিকে, না কোন দলের দিকে, মুমিনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। মূলনীতির দিকেই শুধু আহ্বান করবে এবং এ বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে যে, বান্দার কাজ শুধু নিজের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের ইবাদাত করবে, নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাজ কারবারেও, অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের প্রতিপালক ও মালিক আল্লাহর কথামত চলতে হবে এবং অকপটভাবে তাঁর আইন মেনে চলতে হবে, তিনি ছাড়া আর এমন কোন শক্তি নেই যাকে মুসলমানরা মূল উদ্দেশ্য স্থির করবে এবং তার দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দেবে। মুমিন যখনই আল্লাহর হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কিছু নিজের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে স্থির করবে, সে উভয় জগতে হতাশ ও অসফলকাম হবে।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

ঐ ব্যক্তির কথা থেকে উত্তম কথা আর কার হবে? যে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিয়েছে, নেক আমল করেছে এবং বলেছে যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর অনুগত মুসলমান।" (আল-কুরআন)

দল গঠনের নিয়ম-নীতি

১. দাওয়াত ও তাবলীগের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মজবুত সংগঠন সৃষ্টি করবে, আর ইকামতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেতভাবে প্রচেষ্টা চালাবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হওয়া প্রয়োজন যারা ভালোর দিকে দাওয়াত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবে।"

এ ভাল দ্বারা দুনিয়াকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্য প্রয়োজন হলো, মুসলমানগণ জামাআতবদ্ধ হয়ে সংগঠিতভাবে এ কাজ করবে। আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাতিলের উপর বিজয় অর্জনের জন্য মজবুত সংগঠন কায়েম করবে এবং অত্যন্ত সু-সংগঠিত ও সমবেতভাবে প্রচেষ্টা চালাবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এই মজবুত সংগঠন ও সমবেত সর্বাত্মক প্রচেষ্টার চিত্র তুলে ধরে তাদের উদাহরণযোগ্য সংগঠনের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর বন্ধু বলেও স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

"নিশ্চয়ই সে সকল লোক আল্লাহর বন্ধু যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এমন শক্তভাবে যেন তারা সীসা ঢালা মজবুত প্রাচীর।"

রাসূল (সাঃ) সামাজিক জীবনের গুরুত্ব এবং দলবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপনের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"মাত্র তিনজন লোক কোন জঙ্গলে বসবাস করলেও তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বা নেতা নির্বাচন না করে অন্যভাবে জীবন-যাপন করা জায়েয নেই।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি জান্নাতের ঘর তৈরী করতে ইচ্ছে করে, তাকে জামায়াতের সাথে সংঘবদ্ধ থাকা উচিত। এক ব্যক্তির সাথে শয়তান থাকে, আর যখন তারা দু'জন হয় তখন শয়তান দূরে পলায়ন করে।"

২. ঐক্যের ভিত্তি শুধু দীনের উদ্দেশ্যে হবে। ইসলামী সংগঠনের ভিত্তি হবে আল্লাহর দীন। আল্লাহর দীনকে বাদ দিয়ে কোন মতেই অন্য কোন ভিত্তির উপর মুসলমানদের ঐক্য ও একতা হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

"তোমরা সকলে একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে আকঁড়িয়ে ধর আর বিচ্ছিন্ন হয়োনা, তোমাদের উপর আল্লাহর সে নেয়ামতের কথা স্মরণ রাখ যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলেন এবং তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।"

(সূরায়ে *(আলে ইমরান –১০৩)*

আল্লাহর রজ্জু অর্থ আল্লাহর দীন ইসলাম। পবিত্র কুরআনের নিকট মুসলমানদের ঐক্য ও সমবেত হওয়ার ভিত্তি হলো এই দীন । ইহা ব্যতীত আর কোন ভিত্তিই মুসলমানদেরকে একত্রিত করবে না বরং টুকরা টুকরা করে দেবে।

৩. সত্যের পথের কর্মীদের সাথে আন্তরিকভাবে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করবে আর এ সম্পর্কে সকল আত্মীয়তা থেকে বেশী গুরুত্ব দেবে এবং সম্মানোপযোগী মনে করবে।

পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রশংসা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের ভালবাসা স্থাপন করতে পারেন না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে, যদিও তারা তাদের পিতা, তাদের ছেলে, তাদের ভাই অথবা তাদের পরিবারস্থ লোকই হোক না কেন।" *(সূরায়ে মুজাদালাহ–২২)*

৪. সংগঠনাবদ্ধ বন্ধুদের উপদেশ হীতাকাংখার গুরুত্ব প্রদান করবে আর সংগঠনাবদ্ধ জীবনের শিক্ষাকে সমুন্নত রাখবে। কেননা, এটাই সফলতার প্রধান জামানত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

"কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষেরা ক্ষতিতে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, যারা পরস্পরে সত্য দীনের অছিয়ত করেছে আর পরস্পরে ধৈর্য্যের প্রতিযোগিতা করেছে।"

(সূরা আছর)

৫. সাংগঠনিক শৃংখলার পুরোপুরি নিয়মনীতি পালন করবে আর সংগঠনকে মজবুত দীনী কর্তব্য মনে করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন-

"প্রকৃত মুমিন তারাই যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যখন কোন সম্মিলিত কাজের সময় আল্লাহর রাসূলের সাথী হয় তখন তার অনুমতি ব্যতীত তারা কোথাও যায়না। নিশ্চিত যারা আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছে তারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।"

(সূরায়ে নূর-৬২)

সংগঠনের শৃংখলা, নিজের নেতার আনুগত্য ও অনুসরণ শুধু একটি আইনানুগ ব্যাপারই নয় বরং ইহা শরীয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পবিত্র কুরআন তাদের ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে।

৬। সাংগঠনিক জীবনে সকলে হৃদয় দিয়ে সহযোগিতা করবে, যতটুকু সম্ভব তাতে ত্রুটি করবে না। স্বার্থপরতা, উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং অহংকার এর মত খারাপ অভ্যাস থেকে সর্বদা চরিত্রকে পবিত্র রাখবে।

পবিত্র কুরআনে হেদায়েত করা হয়েছে ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -

"সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর।"

৭. সাথীদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখবে। কখনো কারো সাথে মতভেদ হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি আপোষ মীমাংসাও করে নেবে। আর অন্তরকে দুঃখ-বেদনা থেকে পবিত্র রাখবে।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ -

অতঃপর আল্লাহকে ভয় করো এবং পারস্পরিক সু-সম্পর্ক স্থাপন করো।

৮. খুশি মনে ইসলামী সংগঠনের নেতার আনুগত্য করবে আর তার হিতাকাংখী এবং বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানদের জন্য তার দায়িত্বশীলের কথা শুনা ও মান্য করা এবং আনুগত্য অনুসরণ করা অপরিহার্য। *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত তমীম দারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

"দীন অকৃত্রিম হিতাকাঙ্খা ও বিশ্বস্ততার নাম।"একথা তিনি তিনবার বললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার হিতাকাঙ্খা ও বিশ্বস্ততা? তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, আল্লাহর কিতাবের, মুসলমানদের দায়িত্বশীলদের এবং সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বস্ততা।" *(মুসলিম)*

৯. সাংগঠনিক **পক্ষপাতিত্ব, সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং পক্ষ সমর্থন করা** থেকে বিরত থাকবে। প্রশস্তমনা ও উত্তম চরিত্রের সাথে প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। যে ব্যক্তিই দীনের কাজ করে তাকে সম্মান করবে, তাদের সাথে হিতাকাংখা ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করবে আর তাদেরকে পথের সাথী ও কাজের সাহায্যকারী মনে করবে। দীনের কর্মীরা মূলতঃ একে অন্যের সাহায্যকারী ও সহযোগী। সকলের উদ্দেশ্যই দীন এবং সকলেই নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী দীনের খেদমতই করতে চায়। আন্তরিকতার সাথে বুঝা ও বুঝ গ্রহণের মাধ্যমে একে অন্যের ভুলক্রটি প্রকাশ এবং সঠিক চিন্তাধারা চিহ্নিতকরণ একটি অতি উত্তম কাজ আর এরূপই হওয়া উচিত। কিন্তু পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, অসন্তোষ, শত্রুতা ও একগুঁয়েমি, একে অন্যকে তুচ্ছ জানা এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করা এমন হীন কাজ যা দীনের দাওয়াত দাতার জন্য কখনোই শোভা পায়না। যারা সত্যিকার প্রত্যাশা করে যে, নিজের শক্তি সামর্থকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে আর জীবনে আল্লাহর দীনের কিছু কাজ করে যাবে, তাঁদের অন্তর এ ধরনের অবস্থা থেকে পরিষ্কার রাখা উচিত।

নেতৃত্বের নিয়ম-নীতি

১. ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য আল্লাহভীতি ও সংযমশীলতায় সর্বাধিক উন্নত ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে। দীনের মধ্যে মহাত্মা ও বৃহত্ত্বের পরিমাপ ধন-সম্পদ ও বংশের বিচেনায় নয় বরং দীনের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন -

"হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে গোষ্ঠি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের, সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক সংযমী–আল্লাহ ভীরু।" *(সূরায়ে আল হুজরাত)*

২. নেতৃত্ব নির্বাচনকে একটি খাঁটি দীনী কর্তব্য মনে করবে এবং নিজের মত প্রকাশকে আল্লাহর আমানত মনে করে শুধু ঐ ব্যক্তির পক্ষেই ব্যবহার করবে যাকে এ গুরুভার বহন করা ও তার হক আদায় করার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যোগ্য মনে করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন -

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا - (النساء ٨٥)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহ যোগ্য লোকদের নিকট অর্পণ করো।" *(সূরায়ে নিসা–৫৮)*

এটা একটি মৌলিক ও পরিপূর্ণ হেদায়েত, যা সর্বপ্রকার আমানতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণনা অনুযায়ী "আমানতসমূহ" দ্বারা ইসলামী সংগঠনের দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য নিজের রায় ও পছন্দের আমানত ঐ যোগ্যতম ব্যক্তির ওপর অর্পণ করবে যে সত্যি এ আমানতের ভার বহনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখে। এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব অথবা অপাত্রে উদারতা এবং এ জাতীয় অন্য কোন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে রায় দেয়া খেয়ানত, যা থেকে মুমিনকে অবশ্যই পবিত্র থাকা উচিত।

৩. কেউ যদি মুসলমানদের সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে তার কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান ও নজর রাখবে এবং পূর্ণ সততা, পরিশ্রম, দায়িত্ব সচেতনতা ও কঠোর সংযমের সাথে তা সম্পাদন করবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামাজিক কাজের দায়িত্বশীল হয়, আর সে তার খেয়ানত করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৪. কর্মী বা অনুগত লোকদের সাথে নম্রতা, স্নেহ, ইনসাফ ও সহনশীলতাপূর্ণ ব্যবহার করবে যেন তারা খুশী মনে তার সাথে সহযোগিতা করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলা এ সংগঠনকে তাঁর দীনের কাজ করার সুযোগ দান করেন।

পবিত্র কুরআনে রাসূল (সাঃ)-এর প্রশংসায় বলা হয়েছে–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ.
الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ

"এটা আল্লাহর রহমত যে, আপনার অন্তর তাদের জন্য নরম। আর আপনি যদি কঠোর স্বভাবের এবং শক্ত হৃদয়ের হতেন তা হলে তারা নিশ্চয় আপনার নিকট থেকে কেটে পড়তো।"

আর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে -

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الشعراء ٥١٢)

"আর আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য আপনার স্নেহের বাহু বিস্তৃত করে দিন।" *(সূরা শুআরা–২১৫)*

একবার হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"লোকসকল! তোমাদের উপর আমার অধিকার হলো যে, তোমরা আমার অবর্তমানে আমার হীতাকাংখী হবে এবং সৎ কাজে সাহায্য করবে।"

৫. নিজের সহকর্মীদের গুরুত্ব অনুভব করবে, তাদের আবেগের মর্যাদা দেবে, এবং তাদের প্রয়োজন বুঝবে। তাদের সাথে এমন ভ্রাতৃত্ব সুলভ ব্যবহার করবে যে, যেন তোমাকেই প্রধান হিতাকাংখী মনে করে।

নিজের সাথীদের সম্মান করবে, তাদেরকে নিজের মূলধন মনে করে আন্তরিকতার সাথে প্রশিক্ষণ দেবে। তাদেরকে কপর্দকহীন ও গরীব মনে করে আল্লাহ্ যাদেরকে পার্থিব মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ দিয়ে অবকাশ দিয়েছেন তাদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা রাসূল (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

আপনি তাদের সাহচর্যে ধৈর্য্যধারণ করবেন যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে, আর আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের অন্বেষায় ব্যস্ত থাকবেন না।

(আল-কাহাফ-২৮)

৭. সংগঠনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবশ্যই সাথীদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মুমিনদের গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন যে, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ "তাদের কাজ-কারবার যেন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।" রাসূল (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিশেষ কাজ-কারবারে সাথীদের পরামর্শ গ্রহণ করবে" وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ "বিশেষ কাজ-কারবারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে।

৮. সাংগঠনিক কাজ-কারবারে সর্বদা প্রসন্ন হৃদয় ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্পাদন করবে, নিজেকে এবং নিজের পরিবারস্থ কোন কম যোগ্য লোকদেরকে সাংগঠনিক কোন কাজ-কারবারে প্রাধান্য দেবে না। বরং সর্বদা আত্মত্যাগ ও বদান্যতাসুলভ ব্যবহার করবে যেন সাথীরা প্রফুল্ল হৃদয়ে সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারে অগ্রগামী থাকে।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুকালে হযরত ওমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত করার পর বলেছেন ঃ

"হে খাত্তাবের পুত্র! আমি তোমাকে মুসলমানদের উপর এজন্য অর্পণ করেছি যে, তুমি তাদের সাথে স্নেহসুলভ ব্যবহার করবে। তুমি রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছো এবং দেখতে পেয়েছো যে রাসূল (সাঃ) কিভাবে আমাদেরকে তাঁর নিজের এবং আমাদের পরিবারস্থ লোকদেরকে তাঁর নিজের পরিবারস্থ লোকদের উপর প্রাধান্য দিতেন। এমনকি আমরা রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে যাই কিছু পেতাম তা থেকে বেঁচে গেলে আমরা আবার তা রাসূল (সাঃ)-এর পরিবারস্থ লোকদের জন্য হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করতাম। *(কিতাবুল খেরাজ)*

৯. পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি থেকে বিরত থাকবে। অপাত্রে শিথিলতা ও উদারতা প্রদর্শন করবে না। হযরত ইয়াজীদ বিন সুফিয়ান (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন আমাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে সিরিয়ায় প্রেরণ করলেন তখন এ উপদেশ প্রদান করেন ঃ

"হে ইয়াযীদ! তোমার কিছু বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন আছে, হতেও পারে তুমি তাদের কিছু দায়িত্ব প্রদানে প্রাধান্য দেবে। তোমার জন্য আমার সর্বাধিক চিন্তা ও ভয়ের কারণ হলো এটিই।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামাজিক কাজের দায়িত্বশীল হলো আর সে মুসলমানদের উপর শুধু আত্মীয়তার ভিত্তিতে অথবা বন্ধুত্বের কারণে শাসক নিযুক্ত করলো তাহলে আল্লাহ তার কোন প্রকারের কুরবানী গ্রহণ করবেন না। এমনকি তাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।" *(কিতাবুল খেরাজ)*

১০. সংগঠনের শৃংখলাকে মজবুত রাখবে আর কখনো এ ব্যাপারে অপাত্রে নম্রতা ও শিথিলতা প্রদর্শন করবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

"সুতরাং তারা যখন তাদের কোন বিশেষ কাজে আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তখন আপনি তাদের যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিন, আর তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দোয়া করুন।

(সূরায়ে নূর-৬২)

অর্থাৎ সংগঠনের সাথীরা যখন কোন ভাল কাজে একত্রিত হয় আর কোন ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং অপারগতার অনুমতি প্রার্থনা করে তা হলে সংগঠনের পরিচালকের কর্তব্য হলো যে, সে সংগঠনের শৃংখলা ও গুরুত্বের প্রেক্ষিতে শুধু ঐসব লোকদেরকে অনুমতি প্রদান করবে যাদের প্রয়োজন সত্যিই এ দীনী কাজের অধিক অথবা যাদের ওযর শরয়ী এবং যাদের অপারগতা শরয়ী বলে প্রমাণিত, আর তা গ্রহণ করা জরুরী।

তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার নিয়ম-নীতি

১. তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে কখনও নিরাশ হবে না, যত বড় গুনাহই হোক না কেন, তওবা দ্বারা নিজের আত্মাকে পবিত্র করবে আর আল্লাহর নিকট দোয়া কবুলের জন্য পরিপূর্ণ আশা রাখবে। নৈরাশ্য কাফেরদের স্বভাব, মুমিনদের বিশেষ গুণ হচ্ছে তারা অত্যধিক তওবাকারী এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহ থেকে নিরাশ হয়না। অধিক গুনাহের কারণে ভীত হয়ে নৈরাশ্যতায় পতিত হওয়া এবং তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার মানসিকতা ও চিন্তা হলো ধ্বংসকারী গোমরাহী। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাহদের প্রশংসায় একথা বলেননি যে, তাদের কাছ থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পায়না এবং তিনি বলেছেন, তাদের গুনাহ হয় কিন্তু তারা গুনাহের উপর হঠকারিতা করে না, তারা তা স্বীকার করে এবং নিজে পবিত্র হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

"যারা কখনো কোন খারাপ কাজ করে ফেলে অথবা তারা তাদের নফসের উপর কোন অত্যাচার করে ফেলে এবং তাদের সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় আর তারা তাঁর নিকট তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনে শুনে গুনাহের উপর হঠকারিতা করে।" *(আলে-ইমরান-১৩৫)*

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ ـ (الاعراف ٢٠١)

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে শয়তানের কোন দল এসে স্পর্শ করলেও তারা সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তারা পরিষ্কার দেখতে পায় যে, সঠিক পথ কোনটি? *(সূরায়ে আ'রাফ-২০১)*

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তারা শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি ও তওবা এস্তেগফার করে। আর মুনিদেরকে প্রতিনিয়ত তওবা ও এস্তেগফার

করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা অন্তরে বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তাদের গুনাহের উপর ক্ষমা ও মাফের হাত প্রসারিত করে দেবেন, কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও আপন বান্দাদেরকে অত্যধিক মাত্রায় ভালবাসেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন -

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ط إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ -

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার নিকট তওবা করো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু ও বান্দাদের অধিক মুহব্বতকারী।" *(সূরায়ে হূদ-৯০)*

২. সকল সময় আল্লাহর রহমতের আশাবাদী থাকবে এবং এ দৃঢ় আশা রাখবে যে, আমার গুনাহ যত বেশীই হোক না কেন আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমাশীল। আল্লাহর দরবারে গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে আল্লাহ তার কথা শুনেন এবং তাকে নিজের রহমতের ছায়ায় স্থান দেন অর্থাৎ তার প্রতি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

"হে আমার বান্দাহ! যারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছ, তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি মহান ক্ষমাশীল ও দয়াবান। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করো আর তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর, তোমাদের উপর আযাব নাযিল হবার পূর্বে; কেননা তোমরা কোন দিক থেকেই সাহায্য পাবেনা।" *(সূরায়ে যুমার ঃ ৫৩-৫৪)*

৩. জীবনে কোন গুনাহের উপর লজ্জা ও শরমের অনুভূতি সৃষ্টি হলে তাকে আল্লাহর মেহেরবানী মনে করবে এবং তওবার দরজা খোলা আছে মনে করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহর তওবা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কবুল করেন। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হবার পর যখন সে অন্য জগতের পথিক হয়ে যায় তখন তওবার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

"আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দার তওবা কবুল করেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।" *(তিরমিযী)*

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাঁকে অন্ধ কূপে ফেলে দিলে তাদের ধারণা ইউসুফকে শেষ করে দিয়েছে। আর তার জামায় রক্ত লাগিয়ে তাদের পিতাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু এ মহাপাপ করার পর কয়েক বছর তাদের মধ্যে যখন নিজেদের পাপের অনুভূতি জাগরিত হলো এবং তারা লজ্জিত হয়ে যখন তাদের পিতার নিকট প্রার্থনা জানাল, আল্লাহর নিকট দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাদের গুনাহ মাফ করে দেন। তখন ইয়াকুব (আঃ) এ কথা বলে তাদেরকে নিরাশ করে দেননি যে, তোমাদের গুনাহ বিরাট, এ গুনাহের পর কয়েক বছর অতীত হয়ে গিয়েছে এখন আবার ক্ষমার কি প্রশ্ন? বরং তিনি তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমি অবশ্যই আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং তাদেরকে এ আশ্বাস দিয়েছেন যে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি মহান ক্ষমতাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ۔ (يوسف ٩٧)

"তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোআ করুন, সত্যিই আমরা বড় পাপী।" *(সূরায়ে ইউসুফ-৯৭)*

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۔ (يوسف ٩٨)

"তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য গুনাহ মাফের দোআ করবো। নিশ্চিত তিনি মহান ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।" *(সূরায়ে ইউসুফ-৯৮)*

রাসূল (সাঃ) উম্মতকে নৈরাশ্যতার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে আশ্চর্যজনক একটি কাহিনী শুনিয়েছেন, যা থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়। যে মুমিন তাঁর জীবনের যে কোন অংশেই তার গুনাহের উপর লজ্জিত হয়ে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর দরবারে কাঁদবে তখন তিনি সে বান্দাকে নিশ্চিত ক্ষমা করে দেবেন আর তাকে কখনো দূরে ফেলবেন না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, অতীতে এক লোক নিরান্নব্বইটি খুন করেছিল। সে মানুষের নিকট জানতে চাইল যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বড় আলেম কোন ব্যক্তি? লোকেরা তাকে এক আল্লাহওয়ালা পাদ্রীর ঠিকানা দিল। সে ঐ পাদ্রীর নিকট গিয়ে বলল, হুযুর! আমি নিরানব্বইটি খুন করেছি। আমারও কি তওবা কবুল হতে পারে? পাদ্রী বললেন, না, এখন তোমার তওবা কবুল হবার কোন সুযোগ নেই। সে একথা শুনেই ঐ পাদ্রীকেও হত্যা করলো। এখন সে পুরো একশ হত্যাকারী হলো। তখন আবার সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলো যে, পৃথিবীতে এখন সর্বাধিক বড় আলেম কে? লোকেরা আবার তাকে অন্য একজন পাদ্রীর ঠিকানা দিল। এখন সে তওবার উদ্দেশ্যে ঐ পাদ্রীর নিকট গেলো এবং তার নিকট নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললো, হুযুর! আমি একশত হত্যা করেছি। আমার তওবা কি কবুল হতে পারে? পাদ্রী বললো, কেন হবেনা? তুমি অমুক দেশে যাও। ওখানে আল্লাহর কিছু সম্মানিত বান্দা আল্লাহর ইবাদতে অবিরত মশগুল আছে, তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যাও, এবং কখনো নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে আসবে না। কেননা এ স্থান এখন তোমার জন্য ধর্মীয় দিক থেকে স্বাভাবিক নয়। এখানে তোমার জন্য তওবায় প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সংশোধনের চেষ্টা করা বেশ কঠিন। খুনি রওয়ানা দিল। অর্ধেক রাস্তা পৌছেছিল মাত্র, তার মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেলো। তখন রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে পরস্পরে তর্ক বেঁধে গেলো। রহমতের ফেরেশতা বললেন, এ ব্যক্তি গুনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়েই এ দিকে এসেছে। আযাবের ফেরেশতা বলছেন, না। সে এখনও পর্যন্ত কোন নেক কাজ করেনি। এমতাবস্থায় মানুষের রূপ ধারণ করে একজন ফেরেশতা আসলো। ঐ ফিরিশতাগণ এ ব্যক্তিকে নিজেদের বিচারক মেনে তার নিকটে এ বিষয়ে মীমাংসা কামনা করলো। আগত মানুষরূপী ফেরেশতা বললেন, উভয় দিকের জমি পরিমাপ করো আর দেখ যে, যেখান থেকে সে এসেছিল সে স্থান নিকটে না যে স্থানের দিকে সে যাচ্ছিল সেই স্থান নিকটে। ফেরেশতাগণ জমি পরিমাপ করার পর যে স্থানে সে যাচ্ছিল সে স্থানকে নিকটে পেল। সুতরাং রহমতের ফেরেশতা তার জান কবজ করলো আর আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৪. শুধু নিজের গুনাহসমূহ স্বীকার করবে এবং আল্লাহর দরবারেই কাঁদবে, তাঁর দরবারেই নিজের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব এবং পাপের কথা প্রকাশ করবে। অসহায়ত্ব ও বিনয় মানুষের এমন পুঁজি যা শুধু আল্লাহর দরবারেই পেশ করা যেতে পারে। আর যে দুর্ভাগা নিজের এ অসহায়তা ও অভাবের কথা তারই মত দুর্বল ও অসহায় মানুষের নিকট পেশ করে সুতরাং এ দেওলিয়ার কাছে আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য আর কিছুই থাকে না। সে চিরজীবন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোথাও সম্মান পায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ - (الشورى - ٢٥)

"তিনিই তো তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন তোমরা যা কিছু করো তিনি তা সব জানেন।"

(সূরায়ে শূরা-২৫)

মূলতঃ মানুষের এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, উন্নতি ও সফলতার দরজামাত্র একটিই, এ দরজা থেকে যাকে তাড়িয়ে দেয়া হলো সে চিরজীবনের জন্য লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে গেল। মুমিন হলো সেই বান্দা যে ধরনের গুনাহই করুক না কেন তার কাজ সে আল্লাহর দরবারেই কান্নাকাটি করবে। বান্দাহর জন্য আল্লাহর দরজা ব্যতীত আর কোনো দরজা নেই যেখানে সে ক্ষমা পেতে পারে। সীমা এই যে, মানুষ যদি আল্লাহকে ছেড়ে রাসূলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে তা হলে তার সে চেষ্টায় কোন ফল হবে না, বরং তাকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। রাসূল (সাঃ)ও আল্লাহর বান্দাহ এবং তিনিও এ দরজার ফকীর, অভাবী, তিনি যে মহান মর্যাদা লাভ করেছেন তা এ দরজা থেকেই লাভ করেছেন। তিনিই আল্লাহর সর্বাধিক বিনয়ী বান্দা এবং তিনি সাধারণ লোকদের তুলনায় আল্লাহর দরবারে অনেক বেশী কান্নাকাটি করেন।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

"লোকেরা! আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফের প্রার্থনা কর আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করো। আমাকে দেখ ! আমি প্রত্যহ শতবার আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফের প্রার্থনা করতে থাকি।" *(মুসলিম)*

মুনাফিকদের আলোচনায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۔ (توبه ٩٦)

"মুনাফিকরা আপনার নিকট শপথ করবে যেন আপনি তাদের নিকট থেকে সন্তুষ্ট হন, আপনি যদি তাদের নিকট থেকে সন্তুষ্টও হয়ে যান তা হলেও নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দুষ্কৃতিকারী জাতি থেকে কখনো সন্তুষ্ট হবেন না।" *(সূরা তওবা-৯৬)*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত কাআব বিন মালেক (রাঃ)-এর ঘটনা সর্বকালের জন্য শিক্ষণীয় যে, বান্দাহ সব কিছু সইতে পারে, প্রত্যেক পরীক্ষা বরদাশত করতে পারে কিন্তু আল্লাহর দরজা থেকে উঠার কল্পনাও মনে করতে পারে না। দীনের পথে মানুষের উপর যত কিছুই অতিবাহিত করা হোক আল্লাহর পক্ষ থেকে যতই পদদলিত করা হোক তার জীবনকে উজ্জ্বল করা এবং মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ মাত্র। এ অসম্মান চিরস্থায়ী সম্মানের বিশ্বস্ত পথ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর দরজা ছেড়ে অন্য কোথায়ও সম্মান অন্বেষণ করে সে কোথায়ও সম্মান পেতে পারে না। সে সর্বত্র অপমানিত হবে এবং আসমান ও জমিনের কোন একটি চক্ষুও তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।

"ঐ তিনজনকেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যাদের কাজ-কারবার পূর্বে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যখন জমিন বিস্তৃতও প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল আর তাদের প্রাণও তাদের নিকট বোঝা বোধ হতে লাগলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর উপায় ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তখন আল্লাহ তাআলা দয়া করে প্রত্যাবর্তন করান যেন তারা প্রত্যাবর্তিত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তিনিই মহান ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।"

(সূরায়ে তওবা-১১৮)

তিন ব্যক্তির দ্বারা হযরত কা'আব বিন মালেক (রাঃ), হযরত মোরারাহ বিন রবী' এবং হযরত বেলাল বিন উমাইয়্যাকে বুঝানো হয়েছে। এ তিনজনের তওবা জীবন থাকা পর্যন্ত মুমিনদের জন্য পথের দিশারী হয়ে থাকবে। হযরত কাআব বিন মালেক (রাঃ) বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ছেলের সাহায্য নিয়ে চলাচল করতেন। তিনি নিজেই নিজের তওবার শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো নিজের ছেলের নিকট বর্ণনা করেছিলেন যা হাদীসের কিতাবসমূহে আছে।

৫. তওবা করতে কক্ষণো বিলম্ব করবে না, জীবনের অবস্থা সম্পর্কে যে সময় আসছে তা জীবনের না মৃত্যুর তার কোন হদিস নেই। সর্বদা চূড়ান্ত পরিণামের কথা স্মরণ রাখবে এবং তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা আত্মা, মন ও জবানকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার করতে থাকবে।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

আল্লাহ রাতে রহমতের হাত বিস্তার করেন, যে ব্যক্তি দিনে গুনাহ করেছে সে যেন রাতে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এবং যে ব্যক্তি রাতে গুনাহের কাজ করেছে সে যেন দিনে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে । *(মুসলিম)*

আল্লাহ তাআলার হাত বিস্তার করার অর্থ হচ্ছে তিনি নিজের গুনাহগার বান্দাদের আহ্বান করেন এবং নিজের রহমত দ্বারা তাদের গুনাহগুলোকে ঢেকে দিতে চান। বান্দা যদি কোন সময় সাময়িক আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন গুনাহ করেও ফেলে তাহলে তার উচিত যে, সে যেন তার রাহীম ও গাফুর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং সামান্যতম বিলম্বও যেন না করে। কেননা গুনাহের দ্বারা গুনাহ সৃষ্টি হয় আর শয়তান সর্বদা মানুষ শিকারের চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। সে তাকে গোমরাহ করার চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত নেই।

৬. অত্যন্ত সরল অন্তরে তওবা করবে যা নিজের জীবনের ধারাই পরিবর্তন করে দেয়। আর তওবার পরে মানুষ ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন -

"হে, মুমিনগণ! আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন। আর তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ্ তার নবী ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে এমন লোকদের লজ্জিত করবেন না।" *(সূরা তাহ্‌রীম-৮)*

অর্থাৎ এমন তওবা করবে যে, অন্তর ও মস্তিষ্কের কোথাও যেন গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কোন সন্দেহও না থাকে। এমন তওবার তিন চারটি অংশ আছে। গুনাহের সম্পর্ক যদি আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তওবার ৩টি অংশ।

(ক) মানুষ তার গুনাহের কারণে আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হবে।

(খ) আগামীতে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার জন্য মজবুত সংকল্পবদ্ধ থাকবে।

(গ) নিজের জীবনকে সংশোধন করার জন্য পূর্ণ মনোযোগের চেষ্টা করবে।

অধিকন্তু সে যদি কোন বান্দার হক নষ্ট করে থাকে তাহলে তওবার অংশ আরো একটি আছে ঃ তাহলো

(ঘ) বান্দার হক আদায় করবে অথবা তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে। ঐ তওবা যার দ্বারা মানুষ গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে যায় তার একেকটি গুনাহ্ তার আত্মা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ে আর সে নেক দ্বারা সজ্জিত জীবন নিয়ে আল্লাহর দরবারে পৌছে অতঃপর আল্লাহ তাকে বেহেশ্‌ত দান করেন।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

বান্দাহ্ যখন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়, তখন সে যদি–

☆ গুনাহ্ থেকে ফিরে আসে।

☆ নিজের গুনাহর কারণে লজ্জিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

☆ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সঙ্কল্প করে তখন আল্লাহ তার অন্তরকে উজ্জ্বল করে দেন এবং যদি সে আবার গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরের দাগ বৃদ্ধি করে দেন। এমনকি তার সমগ্র অন্তরে সে দাগ ছড়িয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

"কখনো নয়, বরং তাদের অসৎ কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গিয়েছে।"

৭. নিজের তওবার উপর স্থির থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প রাখবে আর রাত দিন এ খেয়াল রাখবে যে, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তির যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। নিজের পবিত্রতা ও অবস্থার সংশোধনে দৈনিক ক্রমোন্নতির খতিয়ান দ্বারা কৃতসংকল্পের যাচাই করতে থাকবে। নিজের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি পদস্খলিত হয়ে যায় এবং পুনরায় কোন গুনাহ করে বসে তাহলেও কক্ষণো নিরাশ হবে না বরং আবারো আল্লাহর মাগফিরাতের আশ্রয় খোঁজ করবে এবং আল্লাহর দরবারে বিনীত প্রার্থনা করবে যে, হে প্রতিপালক! আমি অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করে তোমার দরজা থেকে বের করে দিওনা, কেননা, আমার জন্য তোমার দরজা ভিন্ন আর কোন দরজা নেই। যেখানে গিয়ে আমি আশ্রয় গ্রহণ করবো।

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) বলেছেন -

اِلٰهِىْ بِذِلَّتْ مُرَاں اَزْدَرَمْ - كَهْ جُزْ تُوْنَدَ اَرَمْ دَرِدِيْگَرَمْ -

"আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার দরজা থেকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করে তাড়িয়ে দিওনা, কেননা আমি তো তোমার দরজা ছাড়া আর কারো দরজায় যাবনা।"

আল্লাহ যে জিনিসের দ্বারা বেশী সন্তুষ্ট হন তাহলো বান্দার তওবা। তওবার অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা। মানুষ যখন গোমরাহীতে পতিত হয়, গুনাহের পঙ্কিলতায় পড়ে যায় তখন সে আল্লাহর নিকট থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে অনেক দূরে সরে যায়। আবার সে যখন ফিরে এসে তার কৃতকর্মের দরুণ

লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, তখন এমন মনে হয় যেন আল্লাহ তার হারিয়ে যাওয়া বান্দাকে ফিরে পেলেন, এই অবস্থাকে রাসূল (সাঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন -

"তোমাদের কারো উট যদি ঘাস-পানিবিহীন মরুভূমিতে হারিয়ে যায় এবং তার খাবার পানীয় ও মালপত্র ঐ উটের পিঠে থাকে সে ব্যক্তি তখন এ মরুময় প্রান্তরে উট খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়ে নির্ঘাত মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। ঠিক এমতাবস্থায় সে যদি তার হারানো উটকে সমস্ত মাল-পত্র বোঝাই অবস্থায় তার নিকটে দাঁড়ান দেখতে পায় তাহলে কল্পনা করতে পারা যায় যে, তখন তার কেমন আনন্দ অনুভূত হবে? অনুরূপ তোমাদের প্রতিপালকও সে ব্যক্তি থেকে আরো অধিক আনন্দিত হন যখন তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর পথহারা গোমরাহ্ বান্দা তওবা করে তাঁর দিকে আবার প্রত্যাবর্তন করে। আর গোমরাহীর পরে সে আবার আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে।" *(তিরমিযী)*

রাসূল (সাঃ) এ গুরুত্বপূর্ণ রহস্যকে অন্য এক উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

একবার এক যুদ্ধে কিছু লোক গ্রেফতার হয়ে আসলো। তাদের মধ্যে একজন মহিলা ছিল যার দুগ্ধপোষ্য শিশু হারিয়ে গিয়েছিল। সে শিশুর জন্য এমন অস্থির ও উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল যে, কোন ছোট শিশু পেলেই তাকে নিয়ে দুধ পান করাতো। এ মহিলার এমন অবস্থা দেখে রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এমন আশা পোষণ করতে পারবে, যে এই মহিলা স্বয়ং তার নিজ শিশুকে নিজ হাতে আগুনে ফেলে দেবে! সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজে ফেলা তো দূরের কথা, সে শিশুকে যদি নিজে আগুনে পড়তে দেখে তাহলে এই মা নিজের প্রাণ বাজি রেখে তাকে বাঁচাবে। এরপর রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

"এই মা তার শিশুর প্রতি যেমন দয়ার্দ্র আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর তার থেকেও বেশী দয়াবান।"

৮. তওবা ও এস্তেগফার করতে থাকবে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের অজানা কত গুনাহইনা হতে থাকে, অনেক সময় মানুষের সে সম্পর্কে অনুভূতিও থাকেনা। এ কথা মনে করবে না যে, শুধু কোন বড় গুনাহ হয়ে গেলেই তওবা করতে হবে, মানুষ সব সময়ই তওবা ও এস্তেগফারের মুখাপেক্ষী এবং কদমে কদমেই তার ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে থাকে। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) দিনের মধ্যে সত্তুর বার বা একশত বার তওবা এস্তেগফার করতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

৯. যে গুনাহগার তওবা করে নিজের জীবনকে সংশোধন করে নেয় তাকে কখনো তুচ্ছ মনে করবে না। হযরত ইমরান ইবনুল হোসাইন (রাঃ) রেসালতের যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছিলো, সে রাসূল (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনার শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত, আমার উপর শরীয়তের আইন প্রতিষ্ঠা করুন এবং আমাকে শাস্তি দিন।" রাসূল (সাঃ) ঐ মহিলার অলীকে বললেন, তোমরা এর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে থাক। যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। সন্তান প্রসবের পর সে মহিলাকে যখন আনা হলো তখন রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, তার শরীর বেঁধে দাও। যেন পাথর মারায় খুলে না যায় এবং বেপর্দা না হয় এবং তারপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে পাথর মারা হলো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) তার জানাযা পড়লেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি জানাযা পড়লেন? এতো খুবই অসৎ কাজ করেছে? এর পরে রাসূল (সাঃ) বললেন, এ এমন তওবা করেছে যে, তা মদীনার সত্তরজন পাপী লোকের উপর বন্টন করে দিলে তাদের নাজাতের জন্যে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। তুমি তার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে দেখেছ কি? সে তার জীবনকে আল্লাহর দরবারে পেশ করে দিয়েছে।

১০. সাইয়্যেদুল এস্তেগফারের গুরুত্ব প্রদান করবে। রাসূল (সাঃ) শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ)-কে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে, সাইয়্যেদুল এস্তেগফার অর্থাৎ মাগফিরাতের সর্বোত্তম দোআ এইটি—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ (بخاري ترمذى)

"আয় আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা, আমি তোমার সাথে এবাদতের যে ওয়াদা ও চুক্তি করেছি তার উপর সাধ্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত থাকবো, আমি যে গুনাহ করেছি তার কুফল থেকে তোমার আশ্রয় চাই, তুমি আমাকে যেসব নেয়ামত দান করেছ তা আমি স্বীকার করি এবং আমি আমার গুনাহ স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া গুনাহ্ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।" *(বুখারী, তিরমিযি)*

দোআর নিয়ম

১. দোআ শুধু আল্লাহর নিকট করবে। আল্লাহ ব্যতীত কক্ষণো কাউকে অভাব মোচনের জন্য ডাকবে না। দোআ হলো ইবাদতের রত্ন আর ইবাদত পাওয়ার অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে-

"আর তাঁকে ডাকাই ঠিক এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকলে তারা তাদের দোআর জবাব দিতে সক্ষম নয়, তাদেরকে ডাকাতো এমন, যেমন কোন ব্যক্তি তার উভয় হাত পানির দিকে বাড়িয়ে চায় যে, দূর থেকেই পানি তার মুখে এসে পড়ুক। বস্তুতঃ পানি এভাবে তার মুখে এসে পড়তে পারেনা। অনুরূপ কাফেরদের দোআ নিষ্ফল ও ভ্রষ্ট।" *(সূরা রাদ-১৪)*

অর্থাৎ অভাব মোচন ও কর্ম সম্পাদনের সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে। আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে কোন ক্ষমতা নেই। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই যে, বান্দার ডাক শুনবে এবং তাদের দোআর জবাব দেবে।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে -

"মানবগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহই হলেন একমাত্র অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।" *(সূরা ফাতের-১৫)*

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন -

আমার বান্দাহগণ? আমি আমার উপর যুলুমকে হারাম করেছি সুতরাং তোমরাও একে অন্যের উপর যুলুম করাকে হারাম মনে করো। আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যাকে আমি হেদায়েত করবো সে ব্যতীত বাকি সকলেই গোমরাহ। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হেদায়েত প্রার্থনা কর তাহলে আমি তোমাদেরকেও হেদায়েত দান করবো। তোমাদের মধ্য থেকে যাকে আমি খাবার দান করি সে ব্যতীত বাকি সকলেই ক্ষুধিত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাবার প্রার্থনা করো তা হলে আমি তোমাদেরকে খাবার দান করব। তোমাদের মধ্য থেকে যাকে আমি পরিধান করাব সে ব্যতীত সকলেই বস্ত্রহীন থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পোশাক প্রার্থনা কর তাহলে আমি তোমাদেরকে পোষাক দান করব। বান্দাহগণ! তোমরা রাতে আমার গুনাহ করেছ যে আমি সকল গুনাহ মাফ করে দেবো।" *(মুসলিম)*

রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, "মানুষের আবশ্যকীয় সকল জিনিসের জন্যে আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা উচিত। এমনকি যদি জুতার ফিতা নষ্ট হয়ে যায় তাও আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করবে এমনকি যদি লবণের প্রয়োজন হয় তাও আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করবে।" *(তিরমিযি)*

অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর জন্যও আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত। কেননা তিনি ব্যতীত প্রার্থনা কবুল করার জন্য আর কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া আশা পূর্ণকারীও কেউ নেই।

২. আল্লাহর নিকট হালাল ও পবিত্র বস্তুই প্রার্থনা করবে। নাজায়েয উদ্দেশ্য ও গুনাহের কাজের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তোলা অত্যন্ত ঘৃণ্যতম বেয়াদবী, নির্লজ্জতা ও অভদ্রতা। হারাম ও নাজায়েয উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা এবং মান্নত করা দীনের সাথে নিকৃষ্টতম পরিহাস। এমন দোআ করবে না যা আল্লাহ তাআলা চিরন্তনভাবে স্থির করে দিয়েছেন যার কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যেমন কোন বেঁটে ব্যক্তি লম্বা হবার জন্য দোআ করা অথবা কোন অসাধারণ লম্বা ব্যক্তি খাটো হবার জন্য দোআ করা অথবা কোন ব্যক্তির এরূপ দোআ করা যে, আমি সর্বদা যুবক থাকবো আর কখনো যেন বৃদ্ধাবস্থা স্পর্শ না করে ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে -

"প্রত্যেক ইবাদতে সেজদার স্থান-এর দিকে মুখ করবে এবং তার জন্য দীনকে খাঁটি করে তার নিকট প্রার্থনা করবে।" *(সূরা আ'রাফ-১৯)*

নাফরমানীর পথে চলার প্রয়োজনে নিজের নাজায়েয উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আল্লাহর দরবারে দোআ করবে না। সৎ কাজে প্রয়োজনে সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

৩. গভীর আবেগ ও পবিত্র নিয়তে দোআ করবে। এমন প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সাথে দোআ করবে যে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, তিনি সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। আর তিনি আপনার প্রতি অত্যন্ত দয়ালুও বটে, তিনি নিজ বান্দাদের আরাধনা শুনেন আর তাদের দোআ কবুল করেন। লোক দেখানো প্রদর্শনী, রিয়াকারী এবং শিরক থেকে নিজের দোআকে সর্বদা পবিত্র রাখবে।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে -

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ (المؤمن ١٤)

"অতঃপর তোমরা নিরংকুশ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহরই নিকট দোআ করো।" *(আল মুমিন-১৪)*

"আর হে, রাসূল! আমার বান্দাগণ যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে তখন তাদ্রেরকে বলে দিন, আমি তাদের নিকটেই আছি। প্রার্থনাকারী যখন প্রার্থনা করে তখন আমি তাদের দোআ কবুল করি। সুতরাং তাদেরও আমার দাওয়াত কবুল করা উচিত। আর আমার উপর ঈমান রাখা উচিত তাহলে তারা সত্য পথে চলতে পারবে।"

(সূরা বাকারা-৮৬)

৪. দোআ পূর্ণ মনোযোগ, একনিষ্ঠতা এবং একাগ্র চিত্তে করবে, আল্লাহর উপর ভরসা করবে, নিজের পাপরাশির পরিবর্তে আল্লাহর অশেষ ক্ষমা ও করুণা এবং অসীম দানশীলতা ও বদান্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যে ব্যক্তি অমনোযোগী, বেপরোয়া ও নির্ভীকতার সাথে আল্লাহর সাথে সুধারণা পোষণ না করে মুখে কিছু শব্দ আওড়ায় তার দোআ মূলত দোআই নয় অর্থাৎ এরূপ দোআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

"নিজের দোআ কবুল হবার আশায় একাগ্রচিত্তে দোআ-করবে, আল্লাহ অমনোযোগী ও ভয় শূন্য নির্ভীক অন্তরের দোআ কবুল করেন না।" *(তিরমিযি)*

৫. দোআ, অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়, নম্রতা ও মিনতির সাথে করবে। খুশু ও খুজু এর অর্থ এই, অন্তরে আল্লাহর ভয়, মহত্ব ও গুরুত্বের প্রভাবে কম্পমান থাকবে এবং শরীরের বাহ্যিক অবস্থায়ও এর প্রকাশ ঘটবে, মাথা ও দৃষ্টি অবনত হবে, আওয়ায নিম্নগামী হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যাবে, চক্ষু হবে অশ্রু ভেজা এবং চাল-চলনে হীনতা ও অসহায়তা প্রকাশ পেতে থাকবে।

রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়ি নাড়া-চাড়া করছে, তখন তিনি বললেন, "তার অন্তরে যদি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেতো!"

মূলতঃ দোআ করার সময় মানুষকে আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া উচিত যে, আমি একজন হতভাগা সহায় সম্পদহীন মিসকীন, আল্লাহ না করুন,

আমি যদি এ দরবার থেকে প্রত্যাখ্যাত হই তবে আমার দ্বিতীয় কোন আশ্রয়স্থল নেই, আমার নিকট আমার বলার মতো কিছু নেই, যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ, আল্লাহ যদি না দেন তাহলে দুনিয়াতে আর কেউ নেই যে, আমাকে কিছু দিতে পারে, আল্লাহই সব কিছুর অধিকারী, তাঁরই নিকট সবকিছুর কোষাগার এবং বান্দা শুধু ফকীর ও মোহতাজ।

পবিত্র কুরআনের হেদায়েত হচ্ছে -

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট অশ্রু-সিক্ত নয়নে দোআ কর।"

দাসত্বের পরিচয়ই এই যে, বান্দা তার প্রতিপালককে অত্যন্ত বিনয়-নম্রতা ও অসহায়তার সাথে ডাকবে, আর তার মন মস্তিষ্ক ও আবেগ-অনুভূতি এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর দরবারে নত হয়ে থাকবে। তার জাহের ও বাতেনের দ্বারা অভাব-অভিযোগের প্রার্থনা প্রকাশ পেতে থাকবে।

৬. দোআ চুপে চুপে মৃদু স্বরে করবে এবং আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কাঁদবে কিন্তু এ কান্নাকাটি যেন প্রদর্শনী অর্থাৎ লোক দেখানো না হয়। বান্দার মিনতি ও বিনয়তা এবং অভিযোগ পেশ শুধু আল্লাহর দরবারেই হওয়া উচিত।

নিঃসন্দেহে দোআ কোন কোন সময় উচ্চস্বরেও করা যায়, কিন্তু নির্জনে এরূপ করবে অথবা সমবেতভাবে দোআ করা হয় তখন উচ্চস্বরে দোআ করবে যেন শ্রোতাগণ আমীন বলতে পারেন। সাধারণ অবস্থায় চুপে চুপে দোআ করবে নিজের জন্যে, কখনো লোকদেরকে দেখানোর জন্য যেন না হয়। *পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে-*

"তোমার প্রতিপালককে মনে মনে ভয় ও রুনাজারীর সাথে স্মরণ করবে। আর মুখেও সকাল সন্ধ্যায় নিম্নস্বরে স্মরণ করবে এবং কখনো অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।"

হযরত যাকারিয়া (আঃ)এর ইবাদতের প্রশংসা করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে -

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ـ (مريم -٣)

"যখন সে তাঁর প্রতিপালককে চুপে চুপে ডাকলো।" (সূরা মরিয়ম–৩)

৭. দোআ করার আগে কিছু নেক আমলও করবে, যেমন ঃ কিছু ছদকা খয়রাত করবে, কোন অনাহারিকে আহার করাবে অথবা নফল নামায ও রোযা রাখবে, আর যদি আল্লাহ না করুন! কোন বিপদ এসেও পড়ে তাহলে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ইবাদত করেছো, সেই ইবাদতের অসীলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে দোআ করবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে -

"তাঁরই দিকে পবিত্র কথাগুলো উত্থিত হয় আর নেক আমল তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে।" *(সূরা আল ফাতের-১০)*

একবার রাসূল (সাঃ) এমন তিন সাথীর কাহিনী বর্ণনা করলেন যারা এক অন্ধকার রাতে পাহাড়ের গুহায় বন্দী হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা তাদের ইবাদতের দোহাই দিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিল এবং আল্লাহ তাদেরকে বিপদ মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ঘটনা এরূপ, তিন সাথী এক অন্ধকার রাতে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎ পাহাড়ের গুহামূলে পাথরের এক বিরাট খন্ড এসে পড়ল। ফলে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। পাথর ছিল বড় তা সরিয়ে গুহার মুখ পরিষ্কার করা তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। তাই তারা পরামর্শ করল যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনের উল্লেখযোগ্য ইবাদতের দোহাই দিয়ে আল্লাহর দরবারে এ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দোআ করবে, হয়তো আল্লাহ তাদেরকে এ সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারেন। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল -

আমি জঙ্গলে মেষ চরাতাম, তাতেই আমার জীবিকা নির্বাহ হতো। আমি যখন জঙ্গল থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম আমার মা-বাবাকে দুধ পান করাতাম তারপর আমার ছেলে-মেয়েদেরকে। একদিন আমার ফিরতে দেরী হলো। এদিকে আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ঘুমিয়ে পড়লেন, ছেলে-মেয়েরা জাগ্রত আর ক্ষুধিত ছিল। কিন্তু আমি ভাল মনে করলাম না যে, মাতা-পিতার আগে ছেলে-মেয়েদেরকে দুধ পান করাব এবং মাতা-পিতাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটাতে মন চাইলো না। সুতরাং আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলে-মেয়েরা আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলো কিন্তু আমি ভোর হওয়া পর্যন্ত এভাবে দাঁড়িয়েই রইলাম।

আয় আল্লাহ! আমি এ কাজ শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করে। সুতরাং তুমি আমার ত্যাগের বরকতে পাথর সরিয়ে গুহার মুখ খুলে দাও। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় গুহার মুখ কিছুটা পরিষ্কার হলো যার ফলে আকাশ দেখা গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমি কিছু মজুর দ্বারা কাজ করিয়েছিলাম এবং সকলকে তাদের মজুরী দিয়ে দিলাম, কিন্তু এক ব্যক্তি তার মজুরী না নিয়েই চলে গেল। কয়েক বছর পর সে তার মজুরী নিতে আসলে আমি তাকে বললাম, এ গরু, ছাগল এবং চাকর-নওকর যা আছে এগুলো সবই তোমার, তুমি এগুলো নিয়ে যাও। সে বলল, আল্লাহর দোহাই, বিদ্রূপ করোনা। আমি বললাম, বিদ্রূপ নয় বরং এসব কিছুই তোমার। তুমি যে মজুরীর টাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলে আমি তা ব্যবসায় খাটালাম, ব্যবসায় আল্লাহ্ তাআলা যথেষ্ট বরকত দিলেন আর তুমি এসব যা কিছু দেখছ তা সবই ঐ ব্যবসার ফল। এগুলো তুমি সন্তুষ্টচিত্তে নিয়ে যাও। এরপর সে সব নিয়ে চলে গেল।

আয় আল্লাহ! এসব কিছু আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। আয় আল্লাহ্! তুমি এর বরকতে গুহার মুখের পাথর সরিয়ে দাও। আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রস্তর খণ্ড আরো সরে গেলো।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমার এক চাচাত বোন ছিল, তার সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব ছিল, সে কিছু টাকা চাইল এবং আমি তাকে টাকা যোগাড় করে দিলাম। কিন্তু আমি যখন আমার প্রয়োজন মিটানোর জন্য তার পাশে বসলাম তখন সে বলল, "আল্লাহকে ভয় করো এবং এ কাজ থেকে বিরত থাক।" আমি তখনই উঠে চলে গেলাম, আর আমি তাকে যে টাকা দিয়েছিলাম তাও তাকে দান করলাম।

আয় আল্লাহ! তুমি ভাল করেই জান যে, আমি এসব কিছু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। আয় আল্লাহ! তুমি এর বরকতে গুহার মুখ খুলে দাও। অতঃপর আল্লাহ্ গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দিলেন এবং এ তিন ব্যক্তিকেই আল্লাহ্ বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন।

৮. সদুদ্দেশ্যে দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নিজের জীবনকে সুসজ্জিত ও সংশোধন করার চেষ্টাও করবে। গুনাহের

কাজ ও হারাম বস্তু থেকে পুরোপুরিভাবে বিরত থাকবে। প্রত্যেক কাজে আল্লাহর নির্দেশের মর্যাদা ও সম্মান করবে এবং পরহেজগারীর ন্যায় জীবন-যাপন করবে। হারাম খেয়ে, হারাম পান করে, হারাম পরিধান করে এবং হারাম মাল দ্বারা নিজের শরীরকে পালন করে দোআকারী ব্যক্তি এ আশা পোষণ করবেনা যে, আমার এ দোআ কবুল হবে। এমন করলে তা হবে অত্যন্ত মূর্খতা ও নির্লজ্জতা। দোআকে কবুলের যোগ্য করার জন্য প্রয়োজন হলো মানুষের কথা, কাজ ও দীনের নির্দেশ মোতাবেক চলা।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

"আল্লাহ পবিত্র আর তিনি শুধু পবিত্র মালকেই গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ মুমিনদেরকে তাই নির্দেশ দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক বলেন-

"হে রাসূলগণ! পবিত্র খাদ্য খাও এবং নেক আমল কর।" মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ

"হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব হালাল ও পবিত্র বস্তু দান করেছি তোমরা তা খাও।"

অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করেছেন, যে সফরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়েছে, তার শরীরে ধূলি মিশ্রিত, আর সে আকাশের দিকে হাত বিস্তৃত করে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে, আমার প্রতিপালক!! বস্তুতঃ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম আর হারামের দ্বারাই তার শরীর লালিত পালিত হয়েছে। এমন ব্যক্তির দোআ' কিভাবে কেমন করে কবুল হতে পারে? *(সহীহ্ মুসলিম)*

৯. সব সময় দোআ করতে থাকবে। আল্লাহর দরবারে নিজের অক্ষমতা, অভাব এবং দাসত্বের প্রকাশ করাও একটি ইবাদত। মহান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজেই দোআ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "বান্দা যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাক শুনি।" দোআ করা থেকে কখনও বিরত হবে না। আর এ দোআ দ্বারা তাক্দীর বা ভাগ্য পরিবর্তন হবে কি হবে না, দোআ কবুল করা বা না করা আল্লাহর কাজ, যিনি মহান জ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানী। বান্দার কাজ সর্বাবস্থায় এই যে, সে

একজন অসহায় ভিক্ষুক ও অভাবগ্রস্তের মত নিয়মিত দোআ করতে থাকবে এবং নিজেকে মুহূর্তের জন্যেও অমুখাপেক্ষী মনে করবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

"সর্বাধিক অসমর্থ সে ব্যক্তি যে দোআ করায় অসমর্থ।" *(তিবরানী)*

রাসূল (সাঃ) ইহাও বলেছেন যে, "আল্লাহর নিকট দোআ করা থেকে অধিক সম্মান ও মর্যাদার বস্তু এই জগতে আর কিছুই নেই।" *(তিরমিযি)*

বান্দাহর কাজ হলো, দুঃখ ও সুখ, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা, বিপদ ও আনন্দ, আরাম সর্বাবস্থায় আল্লাহকেই ডাকা, তাঁরই দরবারে অভাব অভিযোগ পেশ কর এবং নিয়মিত তাঁরই নিকট ভালোর জন্য দোআ করতে থাক।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোআ করে না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।" *(তিরমিযী)*

১০. দোআ' কবুল হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। দোআ কবুল হবার লক্ষণ যদি তাড়াতাড়ি পরিলক্ষিত নাও হয় তবে নিরাশ হয়ে দোআ করা ছেড়ে দেবে না। দোআ কবুল হওয়ার চিন্তায় অস্থির হওয়ার পরিবর্তে দোআ ঠিক মতো করার চিন্তা করবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন -

"আমার দোআ কবুল হওয়ার চিন্তা নেই, বরং আমার শুধু দোআ করার চিন্তা আছে। আমার যখন দোআ করায় সৌভাগ্য লাভ হয়েছে তখন কবুলও তার সাথে হয়ে যাবে।"

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

"কোন মুসলমান যখন আল্লাহর নিকট কিছু চায় এবং আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায় তখন আল্লাহ তার আবেদন পূরণ করে দেন। হয়তো তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় অথবা আল্লাহ তার প্রার্থিত বস্তুকে আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রেখে দেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার এক মুমিন বান্দাকে তাঁর দরবারে হাযির করবেন এবং তাকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি আমার প্রতি দোআ করবে আর আমি তা কবুল করব। তুমি কি দোআ

করেছিলে? সে বলবে, প্রতিপালক! দোআ করেছিলাম। 'অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি আমার নিকট যে দোআই করেছিলে আমি তা কবুল করেছিলাম।' তুমি কি অমুক দিন এ দোআ করোনি যে, আমি তোমাকে সেই দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম? বান্দাহ বলবে, হ্যাঁ সত্য, হে প্রতিপালক! অতঃপর আল্লাহ বলবেন, সে দোআ তো আমি কবুল করে দুনিয়াতেই তোমার আকাঙ্খা পূরণ করে দিয়েছিলাম। অমুক দিন তুমি অন্য এক দুঃখে পতিত হয়ে দোআ করেছিলে যে, আয় আল্লাহ! এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। কিন্তু তুমি সে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত পাওনি। অনবরত সে দুঃখ ভোগ করেছিলে। সে বলবে, নিঃসন্দেহে হে প্রতিপালক! তখন আল্লাহ বলবেন, আমি সে দোআর পরিবর্তে বেহেশতে তোমার জন্য বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত গচ্ছিত করে রেখেছি। অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করেও এরূপ বলবেন।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বলেন -

মুমিন বান্দার কোন দোআ এরূপ হবে না যার সম্পর্কে আল্লাহ এ বর্ণনা দেবেন না যে, তা আমি দুনিয়ায় কবুল করেছি এবং তোমার জন্য পরকালে সঞ্চয় করে রেখেছি। এ সময় মুমিন বান্দা চিন্তা করবে আমার কোন দোআই যদি দুনিয়ার জন্য কবুল না হতো তাহলে কতই না ভাল হতো। সুতরাং বান্দার সর্বাবস্থায় দোআ করতে থাকা উচিত।" *(হাকেম)*

১১. দোআ করার সময় দোআর আদবসমূহ এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আর অন্তরকেও পবিত্র রাখবে।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে -

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা, যারা বেশী বেশী করে তওবা করে আর যারা অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে।"

সূরায়ে মুদ্দাস্‌সেরে বলা হয়েছে ঃ

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ

"আর আপনার প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা করুন এবং আপনার কাপড় (আত্মা)-কে পবিত্র রাখুন।"

১২. অন্যের জন্যও দোআ করবে। তবে সর্বদা নিজের জন্যেই আরম্ভ করবে অতঃপর অন্যান্যের জন্য। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর দু'টি দোআ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে তুমি কবুল কর, আর আমার সন্তানদের থেকেও (এমন মানুষ সৃষ্টি কর যারা একাজ করবে)। আমার দোআ কবুল করো। হে আমাদের প্রতিপালক! যে দিন হিসাব-নিকাশ হবে সেদিন আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা কর।" *(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪০-৪১)*

নূহ (আঃ)-এর দোআ -

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ـ (نوح ٢٨)

" আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করো এবং যারা আমার ঘরে মুমিন হিসেবে এসেছে তাদেরকেও ক্ষমা করো এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে ক্ষমা করো।" *(সূরা নূহ-২৮)*

হযরত উবাই বিন কা'আব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) যখন কারো সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন তার জন্য দোআ করতেন, আর সে দোআ প্রথমে নিজের তরফ থেকেই আরম্ভ করতেন। *(তিরমিযি)*

১৩. আপনি যদি ইমামতি করেন তাহলে সর্বদা সকলকে জড়িয়ে দোআ করবেন এবং বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করবেন। পবিত্র কুরআনে যে সকল দোআ বর্ণনা করা হয়েছে, ঐগুলোতে সাধারণতঃ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম মূলতঃ মুক্তাদিদের প্রতিনিধি । ইমাম যখন বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে দোআ করে তখন মুক্তাদিগণেরও সাথে সাথে 'আমীন' বলা উচিত।

১৪. দোআ সংকীর্ণমনা এবং স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হবে আল্লাহর বিস্তৃত দয়াকে সীমিত মনে করে ভুল করে তার দয়া ও দানকে নিজের জন্য নির্ধারিত করে দোআ করবে না।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, মসজিদে নববীতে এক বেদুঈন এসে নামায আদায় করলো, তারপর দোআ করল এবং বললো যে, আয় আল্লাহ! আমার এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দয়া করো। আর আমাদের সাথে কারো উপর দয়া করো না তখন রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ـ

"তুমি আল্লাহর বিস্তৃত দয়াকে সংকীর্ণ করে দিয়েছো।" *(বুখারী)*

১৫. দোআয় ছন্দ মিল করার চেষ্টা করা থেকেও বিরত থাকবে এবং সাদাসিধে ও বিনীতভাবে দোআ করবে। গীত এবং সুর মিলান ভাল নয়। তবে বিনা চেষ্টায় যদি কখনো মুখ থেকে মিল মত শব্দ বের হয়ে যায় অথবা ছন্দ মিল হয়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। রাসূল (সাঃ)এর এরূপ কোন কোন দোআ বর্ণিত আছে যে, যার মধ্যে বিনা চিন্তায় ছন্দ মিল ও সমতাপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যেমন হযরত যায়েদ বিন আরকামএর এরূপ একটি অর্থপূর্ণ দোআ বর্ণিত আছে -

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই এমন অন্তর থেকে যার মধ্যে বিনয় নেই, তৃপ্তি নেই, এমন বিদ্যা যার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই আর এমন দোআ যা কবুলও হয় না।"

১৬. আল্লাহর দরবারে নিজের প্রয়োজনের কথা পেশ করার পূর্বে তাঁর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করবে। অতঃপর দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নেবে এবং দোআর প্রথম ও শেষে রাসূল (সাঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার চেষ্টা করবে।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

"যখন কেউ আল্লাহর নিকট অথবা কোন মানুষের নিকট কোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে উপস্থিত হয় তখন তার উচিত সে যেন প্রথমে অযু করে দু' রাকাত নফল নামায পড়ে। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং রাসূল (সাঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করবে এবং তারপর আল্লাহর দরবারে নিজের প্রয়োজনের কথা বলবে।" *(তিরমিযি)*

রাসূল (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, বান্দার যে দোআ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান এবং রাসূল (সাঃ)-এর দরূদ ও সালামের সাথে পেশ করা হয় তা কবুল হয়। হযরত ফোযালা (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল (সাঃ) মসজিদে ছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল, নামাযের পর সে বললো

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ـ

"আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।"

তিনি শুনে তাকে বললেন, "তুমি আবেদন করতে গিয়ে তাড়াতাড়ি করেছো যখন নামায পড়ে বসবে তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, অতঃপর দোআ করবে। তিনি যখন একথা বলছিলেন এমতাবস্থায় দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসলো, সে নামায পড়ে আল্লাহর প্রশংসা করল, দরূদ শরীফ পাঠ করলো। রাসূল (সাঃ) বললেন, এখন দোআ করো, দোআ কবুল হবে।" *(তিরমিযি)*

১৭. আল্লাহর নিকট দোআ করতে থাক। কেননা তিনি তাঁর বান্দাদের ফরিয়াদ শুনতে কখনো বিরক্ত হননা, বরং হাদীস থেকে জানা যায় যে, এমন কিছু বিশেষ সময় ও অবস্থা আছে যার মাধ্যমে দোআ তাড়াতাড়ি কবুল হয়। সুতরাং এ সকল বিশেষ সময় ও অবস্থায় দোআর বিশেষ ব্যবস্থা করবে।

(ক) রাতের শেষাংশে মানুষ নিদ্রায় বিভোর থাকে–এ সময় যে বান্দা উঠে তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে, আর অসহায় মিসকীন হয়ে নিজের অভাব-অভিযোগের কথা তাঁর দরবারে পেশ করে তখন তিনি দয়া করেন।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

"আল্লাহ প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এমন কি যখন রাতের শেষাংশ বাকী থেকে যায় তখন বলেন, কে আমার নিকট দোআ করবে। আমি তার দোআ কবুল করব, কে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে দান করব, কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।" *(তিরমিযি)*

(খ) লাইলাতুল ক্বাদরে বেশী দোআ করবে, কেননা, এ রাত আল্লাহর নিকট হাজার মাস থেকেও উত্তম। আর বিশেষ করে এ দোআ করবে যে,

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

"আয় আল্লাহ! তুমি অধিক ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করাকে ভালোবাস, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। *(তিরমিযি)*

(গ) আরাফাতের মাঠে যিলহজ্বের ৯ তারিখে আল্লাহর মেহমানগণ যখন একত্রিত হয়। *(তিরমিযি)*

(ঘ) জুমার দিন বিশেষ সময়ে অর্থাৎ খোৎবা আরম্ভ থেকে নামায শেষ পর্যন্ত অথবা আছরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত।

(ঙ) আযানের সময় আর জিহাদের ময়দানে যখন মুজাহিদদের কাতার বন্দী করা হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

"দু'টি জিনিস আল্লাহর দরবার থেকে ফেরত দেয়া হয় না, প্রথমটি হলো আযানের দোয়া আর দ্বিতীয়টি হলো জিহাদে কাতার বন্দীর সময়ের দোয়া।" *(আবু দাউদ)*

(চ) আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোআ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। এ মধ্যবর্তী সময়ে আমরা কি দোআ করব? তিনি বললেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ক্ষমা, সুস্থতা ও শান্তি কামনা করি।"

(ছ) রমযান মুবারকএর দিনসমূহে বিশেষতঃ ইফতারের সময়। *(তিরমিযি)*

(জ) ফরয নামাযের পর মাসনূন দোয়া। (তিরমিযি) একাকী বা ইমামের সাথে।

(ঝ) সেজদা রত অবস্থায়।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন -

"সেজদাবনত অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালকের অনেক নৈকট্য লাভ করে। সুতরাং এ সময় তোমরা বেশী বেশী দোয়া করবে।"

(ঞ) যখন কঠিন বিপদ অথবা অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। *(হাকেম)*

(ট) যখন যিকির ও ফিকির (আলোচনা গবেষণা) এর কোন মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এবং *(বুখারী, মুসলিম)*

(ঠ) পবিত্র কুরআন খতমের সময়। *(তিবরানী)*

১৮. এ সকল স্থানেও দোআর বিশেষ ব্যবস্থা করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) মক্কা থেকে মদীনায় যাবার প্রাক্কালে মক্কাবাসীদের নামে

একটি চিঠি লিখলেন, যাতে মক্কায় অবস্থানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এবং তাতে এও উল্লেখ করেছেন যে, মক্কায় এই এগারটি স্থানে বিশেষভাবে দোআ কবুল হয়।

(১) মুলতাযামের নিকট। (২) মীযাবের নীচে। (৩) কা'বা ঘরের ভিতর। (৪) যমযম কূপের নিকট। (৫) ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর। (৬) ছাফা মারওয়ার নিকটবর্তী স্থান যেখানে সায়ী' করা হয়। (৭) মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে। (৮) আরাফাতে। (৯) মুযদালিফায়। (১০) মিনায় এবং (১১) তিন জামরার নিকট।

১৯. সব সময় চেষ্টা করবে যে, দোআর ঐ সকল শব্দসমূহ মুখস্থ হয়ে যায় যা পবিত্র কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী-রাসূল ও নেক বান্দাদেরকে যে পদ্ধতি ও শব্দসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম শব্দ ও পদ্ধতি আর মিলবে কোথায়? তদুপরি আল্লাহর শিক্ষা দেয়া ও রাসূলের পছন্দনীয় শব্দসমূহে যে প্রভাব ও বরকত এবং কবুল হবার যে মর্যাদা বিদ্যমান তা অন্য বাক্যে কিভাবে সম্ভব? অনুরূপভাবে রাসূল (সাঃ) দিন রাত যে সব দোআ করেছেন তাতেও হৃদয়স্পর্শী মধুরতা এবং পূর্ণ দাসত্বের মাহাত্ম্য পাওয়া যায়, তার চেয়ে উত্তম দোআ, আবেদন ও আকাঙ্খার কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

দোআর জন্য কোন ভাষা, পদ্ধতি অথবা বাক্যের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বান্দা আল্লাহর নিকট যে কোন ভাষায় এবং যে কোন বাক্যে যা ইচ্ছে তাই প্রার্থনা করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত মাহাত্ম্য ও দয়া যে, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন "আমার নিকট প্রার্থনা করো।" বান্দাকে দোআর শব্দসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নিকট কুরআন ও হাদীসের দেয়া শব্দের মাধ্যমে দোআ করবে। আর এ সকল দোআ সব সময় করবে যা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে অথবা স্বয়ং রাসূল (সাঃ) যেভাবে প্রার্থনা করেছেন।

অবশ্য যে পর্যন্ত কুরআন হাদীসের এ দোআগুলো মুখস্থ না করতে পারবে সে পর্যন্ত দোআ সমূহের সারমর্ম মনে রাখবে।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত দোআসমূহের কয়েকটি

রহমত ও মাগফিরাতের জন্যে দোআ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ (الاعراف)

"আয় আমাদের রব! আমরা আমাদের নফসের উপর যুলম করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা এবং দয়া না করেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" *(আল আ'রাফ)*

দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য দোআ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

"আয় আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে পুণ্যতা দান করো। আর পরকালের কামীয়াবী দান করো এবং দোযখের ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা করো।"

ধৈর্য্য ও দৃঢ় থাকার দোআ

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ (البقرة)

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ধৈর্য্যধারণের তৌফিক দান কর এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় করে দাও আর আমাদেরকে কাফিরদের উপর বিজয়ী হবার জন্য সাহায্য কর।" *(আল-বাক্বারাহ)*

শয়তানের কু-প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার দোআ

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ـ (المؤمنون ٩٧ -٩٨)

"হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের প্ররোচণা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি আর হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার নিকটে উপস্থিত হওয়া থেকেও আমি তোমার আশ্রয় চাই।" *(সূরা মুমিন ঃ ৯৭-৯৮)*

জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোআ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا -

"হে আমাদের প্রতিপালক! জাহান্নামের আযাবকে আমাদের উপর থেকে ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই তার আযাব প্রাণ বিধ্বংসী এবং তা অনেক খারাপ ঠিকানা ও খারাপ স্থান *(সূরা ফোরক্বান)*

অন্তর সংশোধনের দোআ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَ يْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ - (ال عمران)

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের অন্তরে হেদায়াত বর্ষণ করার পর আর বক্রপথে পরিচালিত করোনা আর আমাদের প্রতি তোমার করুণা বর্ষণ করো। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা *(সূরা আলে-ইমরান)*

ক্বলব পরিষ্কারের দোআ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (الحشر)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য কোন হিংসা-দ্বেষ রেখোনা হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও দয়াবান *(সূরা হাশর-১০)*

অবস্থা সংশোধনের দোআ

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِن اَمْرِنَا رَشَدًا - (كهف)

"হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার তরফ থেকে আমাদের ওপর রহমত নাযিল কর এবং আমাদের ব্যাপারে সংশোধন নসীব কর।" *(সূরা কাহাফ-১০)*

পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে শান্তি লাভের দোআ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ـ (الفرقان)

"আয় রব! আমাদের জন্য আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের চোখের শান্তি দান কর (এমন কর যেন তাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হয়ে যায়) আর আমাদের মুত্তাকীদের অগ্রবর্তী হিসেবে কবুল কর।" *(সূরা ফোরক্বান-৭৪)*

মাতা পিতার জন্য দোআ

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ (ابراهيم)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে আমার মাতা-পিতাকে আর সকল মু'মিনকে সেইদিন ক্ষমা কর যেদিন ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।"

পরীক্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোআ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْاَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যে সকল ভুল-ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ বোঝা আরোপ করেছেন আমার উপরও সেরূপ বোঝা আরোপ করবেন না। প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন বোঝা আরোপ করবেন না যা আমরা বহন করতে পারব না। আমাদের সাথে সদয় ব্যবহার করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে দয়া করুন। আপনি আমাদের মনিব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করুন।" *(বাক্বারাহ-২৮৫)*

উত্তম মৃত্যুর জন্য দোআ

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ

"হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার ওলী (বন্ধু) আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং নেক্কারদের সাথে সংযুক্ত কর।" *(সূরা ইউসুফ-১০১)*

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ (ال عمران)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি এলান করতেন এবং বলতেন যে, তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আন। অতএব আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং মন্দসমূহ দূর করে দিন। আমাদেরকে নেক্কারদের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূরণ করে দিন, আর আমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অপমানিত করবেন না। নিঃসন্দেহে আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না।" (আলে ইমরান ১৯৩-১৯৪)

সকাল ও সন্ধ্যার দোআ সমূহ

হযরত ওসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

আল্লাহর যে বান্দা সকাল ও সন্ধ্যায় এ দোআ করবে, তাকে কিছুতেই কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ।

রাসূল (সঃ)-এর পছন্দনীয় দোআ।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"আল্লাহর নামের সাথে আরম্ভ—যার নামের সাথে যমিন ও আসমানের কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" *(মুসনাদে আহমদ)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) নিয়মিত সকাল ও সন্ধ্যায় এ দোআ করতেন, কখনো বাদ দিতেন না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِيْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ ، وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ -

"আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি চাই। আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের জন্য তোমার ক্ষমা, শান্তি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আয় আল্লাহ! আমার লজ্জা নিবারণ এবং আমার অশান্তিকে শান্তিতে রূপান্তরিত করে দাও। আয় আল্লাহ্! আমার সামনে ও পিছন থেকে, ডান ও বাম থেকে এবং উপর থেকে আমাকে রক্ষা করো। আর আমি তোমার নিকট আমার নীচতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" (তিরমিযি)

অলসতা ও কাপুরুষতা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোআ

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতের কাজে নিয়োজিত থাকতাম, রাসূল (সাঃ)-কে অধিকাংশ সময় এই দোআ পাঠ করতে শুনতাম-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

"আয় আল্লাহ্ আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি দুঃখ-কষ্ট, অসহায়ত্ব অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা থেকে এবং লোকদের চাপ থেকে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তাকওয়া ও সংযমী হওয়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

"আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, সংযমশীলতা ও অমুখাপেক্ষীতার প্রার্থনা করি।"

দুনিয়া ও আখেরাতে অসম্মান হওয়া থেকে রক্ষার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِكُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

"আয় আল্লাহ! আমাদের সকল কাজের শেষ কর্মফল ভাল করে দাও এবং দুনিয়ার অসম্মান ও আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা করো।" *(তিবরানী)*

নামাযের পরের দোআ

হযরত মাআয বলেন, একদিন রাসূল (সাঃ) আমার হাত ধরে বললেন ঃ "হে মাআয! আমি তোমাকে ভালবাসি। তিনি আবার বললেন, হে মাআয! আমি তোমাকে অছিয়ত করছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো তরক করোনা। প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো পাঠ করবে।"

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

"আয় আল্লাহ! তুমি তোমাকে স্মরণের জন্যে, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্যে এবং তোমার উত্তম ইবাদতের জন্যে আমাকে সাহায্য করো।"

রাসূল (সাঃ)-এর অছিয়ত

হযরত শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) বলেন যে, আমাকে রাসূল (সাঃ) এ অছিয়ত করেছেন ঃ "শাদ্দাদ! তুমি যখন দেখতে পাবে যে, দুনিয়ার ব্যক্তিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করেছে তখন তুমি এগুলো সঞ্চয় করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثُّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ

(مسند احمد)

"আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সৎ কাজে স্থির থাকার এবং হেদায়াতের উপর দৃঢ় থাকার প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নেয়ামতের শোকর আদায় করার এবং উত্তম ইবাদত করার তাওফিক প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট প্রশান্ত অন্তর, সত্যবাদী মুখ (যবান) প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞাত সকল খারাপ কাজ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার জ্ঞাত আমার কৃত সকল পাপ থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি সকল অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। (মুসনাদে আহমদ)

সৃষ্টি জগতের দৃষ্টিতে সম্মান লাভের দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا۔

আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল করে দাও এবং অত্যন্ত শোকর গুযার করে দাও। আমার দৃষ্টিতে আমাকে ক্ষুদ্র ও লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দাও।

সার্বিক বা সকল কাজের দোয়া

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সঃ) একবার আমার হুজরায় পদার্পণ করলেন, ঐ সময় আমি নামাযে রত ছিলাম, নবী করীম (সঃ)-এর আমার সাথে কিছু কথার প্রয়োজন ছিল আর এদিকে নামাযে আমার দেরী হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আয়েশা, সংক্ষিপ্ত ও সার্বিক দোয়া করবে। অতঃপর আমি যখন নবী করীম (সঃ)-এর নিকট আসলাম তখন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সঃ) সংক্ষিপ্ত ও সার্বিক দোয়া কি? তখন তিনি বললেন, ইহা পড়বে।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرُبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرُبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِمَّا سَاَلَكَ بِهٖ مُحَمَّدٌ وَاَعُوْذُبِكَ مِمَّا تَعَوَّذَمِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا ۔ (حاكم)

আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সর্ব প্রকার শুভ কামনা করি। যা তাড়াতাড়ি হবার এবং যা দেরীতে হবে, জানা-অজানা সবই। এবং আমি সর্ব প্রকার অনিষ্ট থেকে যা তাড়াতাড়ি হবার ও যা দেরীতে হবার এবং আমার জানা-অজানা সমস্ত কিছু থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তোমার নিকট বেহেশত এমন কি যে কথা ও কাজের দ্বারা তার নিকটবর্তী হওয়া যাবে তার প্রার্থনা করি। আর আমি তোমার নিকট জাহান্নাম থেকে এমন কি যে কথা ও কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয়, তা থেকে

তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর আমি তোমার নিকট সেই সব শুভ কামনা করি যে সব শুভ কামনা মোহাম্মদ (সাঃ) তোমার নিকট করেছেন। আর আমি তোমার নিকট সেই সব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যেসব থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এ প্রার্থনা করি যে তুমি আমার জন্য যে সিদ্ধান্ত নাও তার পরিণাম উত্তম করো।

ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোআ

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالسَّلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِىْ بِالسَّلَامِ قَاعِدًا وَاَحْفَظْنِىْ بِالسَّلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا حَاسِدًا ۔

"আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে উঠা, বসা, শোয়া এবং সর্বাবস্থায় হেফাযত কর। আর আমার ব্যাপারে কোন শত্রু ও হিংসুককে হিংসা করার সুযোগ দিও না।

দ্বিমুখী নীতি থেকে পরিত্রাণের দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ ۔

আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চরিত্রহীনতা, অসৎ কাজ ও অসৎ প্রবৃত্তির কামনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঝগড়া, বিবাদ, দ্বিমুখী নীতি এবং দুশ্চরিত্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ঋণ পরিশোধের দোআ

হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) এর এক চুক্তিবদ্ধ গোলাম এসে বললো, হযরত! আমাকে সাহায্য করুন। আমি চুক্তির বিনিময় আদায় করতে পারছিনা। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে সেই দোআ শিক্ষা দেব যা রাসূল (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন? উহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণও যদি তোমার থাকে তাও আল্লাহ তাআলা এ দোয়ার ওছিলায় পরিশোধ করে দেবেন। স্বাধীনতার চুক্তি বদ্ধ গোলামটি আরয করলো, শিক্ষা দিন। সুতরাং তিনি এ দোআ শিক্ষা দিলেন।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۔

আয় আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দান করে হারাম জীবিকা থেকে নির্ভীক করে দাও। আর তোমার মাহাত্ম্য ও এহসানের দ্বারা তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

সমাপ্ত